বাংলা কারাসাহিত্য

আদিত্য চৌধুরী

—: প্রাপ্তিস্থান :—
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
ক'লকাতা-৭৩

বাংলা কারাসাহিত্য

ডঃ আদিত্য চৌধুরী, এম. এ, পি এইচ, ডি.,
রীডার এবং বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, ক লকাতা-৩

Bangla Karasahitya

Dr. Aditya Chaudhuri, M A., Ph D.,
Reader and Head, Deptt. of Bengali
Maharaja Manindra Ch College, Calcutta-3

প্রকাশিকা—শ্রীমতী কল্পা চৌধুরী
১৪০ লেকটাউন, ব্লক বি, কলকাতা-৮৯
গ্রন্থস্বত্ব—শ্রীমতী কল্পা চৌধুরী ও অন্তরা চৌধুরী

প্রচ্ছদ শিল্পী—যোগেন চৌধুরী
অধ্যাপক কলাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

মুদ্রাকর—
শ্রী দেবেশ চক্রবর্তী
প্রিন্ট ইণ্ডিয়া
২১/২এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
ক'লকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ৫ই সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবস, ১৯৯১

লাথি মার্, ভাঙ্ রে তালা!
যত সব বন্দী-শালায়—
আগুন জ্বালা,

....

উৎসর্গ : ডঃ নেলসন ম্যাণ্ডেলা

Compliments and
best wishes.

NRMandela.

18. 10. 90

Date 11.3.89.

To
Dr. Nelson Mandela

Dear Sir,

This is 1989. You are still behind the prison bar. Your dedi-
cation and uncompromising struggle are always a source of
inspiration to the people living under the bestial colonial
rule. I was born in India when my motherland was under the
yoke of British domination. As a student I always felt the
pangs of bondage. My head bends down in respect and gratitude
when you as a tireless freedom fighter reminds me of millions
of unseen but unforgetable freedom fighters of my country.

To-day, as a teacher of Bengali language and literature, I
have written a book (which is my doctoral thesis) in commemo-
ration of those freedom fighters in my country, who were
behind the prison bars for years together and died with the
anguish of bondage in their hearts. My book entitled 'Bangla
Kara Sahitya' (Bengali prison literature) is now ready for
its first publication. I am fervidly desirous of dedicating
my book to you. On this occasion, I ardently crave for your
best wishes as they deem to be the best wishes of a man who
shall never be forgotten by generations to come. Hope, you
will fulfill this earnest desire of mine.

I pray to God for your magnificent success. I request you to
send your message of best wishes at the earliest opportunity.

With regards,

Yours sincerely,
Aditya Chaudhuri
(Aditya Chaudhuri)

Dr Aditya Chaudhuri
Head of the Modern Indian Languages
(Bengali) Department
Maharaja Manindra Chandra College
20 Ramkanto Bose Street
CALCUTTA 700-003
INDIA

02 June 1989

Dear Dr Chaudhuri

LETTER TO MR NELSON MANDELA

Your letter adressed to my colleague, the Minister of Foreign Affairs,
has been handed to me for attention.
We have no difficulty in submitting your letter to Mr Mandela, since
he finds himself in unique and positive circumstances, as will appear from
an article written by professor Fatima Meer, a copy of which is enclosed
for your attention.

Yours faithfully

H J COETSEE MP
MINISTER OF JUSTICE
(Signed by Private Secretary by direction
of the Minister)

সূচীপত্র

নিবেদন

বাংলা কারাসাহিত্যের বিবরণে যে বিপুল গ্রন্থতালিকা আমরা সংকলন করেছি 'সাহিত্য' শব্দটির সতর্ক সংজ্ঞায় তার অনেক উপকরণই হয়তো অগ্রাহ্য হবে। বস্তুতপক্ষে, কারাসাহিত্য বলতে যে সাহিত্যের কথা আমরা বলতে চাইছি তা সর্বাংশে হয়তো সৃজনশীল সাহিত্য নয়, কিন্তু এই গ্রন্থগুলির দুটি গুরুত্ব আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। একটি হল, বাংলা আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যের খণ্ডিত উপকরণ হিসাবে এগুলির মূল্য এবং আরেকটি পরাধীন দেশে বিদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবহৃত কারাব্যবস্থা সম্পর্কে পরাধীন শাসিত জাতির অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়ার বিবরণ। ফলে এই ধরণের গ্রন্থে সাহিত্যিক মূল্য সর্বদা সমাজবিজ্ঞানগত মূল্যের সঙ্গেই সহাবস্থান করে। কারা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা গ্রন্থ লিখেছেন তাঁদের অধিকাংশই কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিক নন। তাঁরা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তৎকালীন সরকারের চোখে অপরাধী এবং অধিকাংশই রাজনীতিজ্ঞ বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত। এঁরা কেউ সাহিত্যিক হতে চান নি, কিন্তু দণ্ডিত জীবনের নিষ্ঠুর করুণ অভিজ্ঞতাই সাময়িকভাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশ উন্মুখ সাহিত্যকার করে তুলেছিল। কারাজীবনের অভিনব অভিজ্ঞতায় তাঁরা নির্বাক থাকেন নি, মূক হতে পারেন নি। তাঁরা যা দেখেছেন, শুনেছেন, ভোগ করেছেন তা সকলকে জানাতে চেয়েছেন। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সর্ব-সমক্ষে পেশ করবার ক্ষমতায় তাঁরা সকলেই পটু ছিলেন না। অনুশীলন তাঁদের রচনাশক্তিকে পরিমার্জিত করেনি, সহজাত প্রতিভা তাঁদের প্রকাশ ক্ষমতাকে স্বতঃস্ফূর্ত করেনি। কিন্তু তবু তাঁরা লিখেছেন। সে রচনা প্রকাশিত হয়েছে, বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে গেছে। সে পাঠক রসসাহিত্যের বোদ্ধা না হতে পারেন। কিন্তু 'সাহিত্য যদি জীবন-সমালোচনা' হয় তবে তাঁদের সেই জীবন-সমালোচনা সার্থক সাহিত্য না হলেও সাহিত্যের উপাদান তো বটে। সেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অপরিমার্জিত অপরিশীলিত উপাদানই আমাদের আলোচনার উপকরণ। ফলে এই উপকরণের সর্বত্র আমরা পরিণত রসবোধের পরিচয় পাব

না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই রচনাগুলির ভিতর দিয়ে অনেকেরই জীবন্ত হৃদয়ের উষ্ণতা ও অনুভববেদ্যতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না'। বিশুদ্ধ সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণ না হলেও'এগুলি সামাজিক জীবনের তথ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত সেদিক থেকেও এইগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আমাদের অন্যতম 'সামাজিক দায়িত্ব। প্রসঙ্গত 'রাজবন্দী'[১] নামে একটি কবিতার প্রথম পংক্তি উল্লেখ করছি। স্বভাবে এবং সংজ্ঞায় এটি কবিতা হয়েছে কি না, তা স্বতন্ত্র কথা; তবে কারাজীবনের অমানুষিক নির্যাতন ও বেদনাভোগের অভিজ্ঞতায় এটি যেন বন্দীজীবনের রক্তে লেখা মর্মলিপি—

'পাথর ভাঙ; ঘানি টান; সুরকি কোট; বাগান সাজাও,
ছোবড়া পেঁজ; দড়ি পাকাও, সরকারকে সেলাম বাজাও:
আধ-জাঙিয়া তকৃতি গলে পশুর মত সদল বলে
ওঠ বস 'হুকুম শোন'—মানুষ তুমি ভুলে যাও:—
শিক্ষা আচার স্বভাব ব্যাভার এ সব চিরবিদায় দাও:'

কারাসাহিত্যের অন্যতম শর্ত কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে বিবৃত করা। এদেশের কারাব্যবস্থার কিছু সর্বজনীন প্রকৃতি আছে। অন্তত ইংরেজ শাসনে দেশের প্রায় সর্বত্রই কারাব্যবস্থা একই চেহারা নিয়েছিল তার মনুষ্যত্ববিরোধী নৃশংস নির্দয় পীড়াদায়ক ক্লেশকর হিংসাত্মক ব্যবস্থাপনার মধ্যে। ইতর বিশেষ থাকলেও চরিত্রে তা আগাগোড়া সমরূপ। কিন্তু সেই কারাব্যবস্থার বিবরণ ব্যক্তিগত। সে বিবরণে একজনের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গীর। অভিজ্ঞতার নিজস্ব মানদণ্ডে এক একজন দণ্ডিত মানুষ এক এক ভাবে কারাব্যবস্থাকে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত চিত্তে মন্তব্য করেছেন—

"আজ ভারতে কত সহস্রলোক কারাগারে বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্যশাসন-তন্ত্রকে অপমানিত করচে, তাকে গুরুভারে দুরূহ করচে। ·····

১। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'মাসিক বসুমতী'—১৩৩৪, চৈত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, পৃ ১৫৮।

মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাইত বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই·····"[২]

যে অপ্রত্যাশিত আত্মাবমাননা, যে অবাঞ্ছিত অসৌজন্য তাঁদের বন্দীজীবনকে পদে পদে বিড়ম্বিত করেছে তাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না করে কারুরই মুক্তি ছিল না। কারণ, "জেলগুলি মানুষের সৃষ্ট বাস্তব নরক, কল্পিত নরক নহে"[৩]। অথচ সেই ঘৃণা, বিরূপতা ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মধ্যে সংযম, দায়িত্ববোধ, শালীনতা, সহিষ্ণুতা এক একজন মানুষের ক্ষেত্রে এক এক ভাবে দেখা দিয়েছে। কারা সাহিত্যের মূল্যায়নে এই ব্যক্তিগত মানদণ্ডের কথা সব সময় মনে রাখতে হবে।

কারাজীবনের বিবরণ দিতে গিয়ে কতকগুলি অনিবার্য প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে। এসেছে কয়েদখানার ভৌগোলিক রূপ, প্রহরার ব্যবস্থা, প্রহরীদের চরিত্র এবং স্বাভাবিকভাবে জেলজীবনের তথাকথিত অন্তঃসারশূন্য নীতিবোধের দিকটি। নির্জন কারাবাসের সঙ্গে পটভূমিকা রূপ জেল কম্পাউণ্ড প্রসঙ্গ এসেছে এবং দণ্ডপ্রাপ্তদের চরিত্র শোধনের পবিত্র সংবিধানসম্মত দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত সেই পদস্থ রাজকর্মচারীদের আচার ব্যবহারের বিচিত্র নিদর্শনও এই অভিজ্ঞতার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সহবন্দীদের প্রসঙ্গ এবং দৈনন্দিন জীবনের বহু খুঁটিনাটি বিষয় তথা শারীরিক নির্যাতন, কায়িক শ্রম, দণ্ডব্যবস্থা, কয়েদীদের আহার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য, রোগভোগ ও চিকিৎসার প্রণালী, কারাজীবনের অন্ধকারে প্রকাশ্য গোপন বহু দুর্নীতির ফিরিস্তি, নানা ধরণের আইন ও সংস্কার-পদ্ধতি, রীতিনীতির উল্লেখ এবং সর্বোপরি কয়েদীজীবনের দুঃসহ মানসিক অবস্থা। রস সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে নয়, কিন্তু আত্মপ্রকাশের সততায় ও অমানবিক পরিবেশে নিক্ষিপ্ত মনুষ্যত্বের করুণ অভিজ্ঞতার উপকরণ এইগুলির মূল্য সামাজিক মূল্যেরই স্বীকৃতিতে।

বর্তমান আলোচনায় এক বিশেষ কালপর্বের মধ্যে যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন বা ঐ সময় সীমার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদেরই লিখিত গ্রন্থগুলিকে আমরা

২। "৪ঠা আশ্বিন"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নবশক্তি'—৪র্থ বর্ষ, শুক্রবার ১৭ই আশ্বিন, ১৩৩০, ২২ সংখ্যা।

৩। 'জেল সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিজ্ঞতা'—'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর অন্তর্গত; 'প্রবাসী'—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১; পৃ ২৮৯।

গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। কোনো কোনো বিরল ক্ষেত্রে আমরা বিশিষ্ট কারাবন্দীর নিজস্ব কোনো রচনা হয়ত পাইনি, কিন্তু তাঁদের তৎকালীন কারাজীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ সম্বলিত জীবনীগ্রন্থের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছি।

আলোচ্য সময়সীমা ১৮৭০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই কালপর্বে ইংরেজ কারাগারে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে। অনেক সময় অন্য ভারতীয় ভাষায় রচিত দু একটি গ্রন্থও অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে দীর্ঘকাল পরিচিত জনপ্রিয় ও বহু পঠিত বলে এবং কারাবাসের মূল অভিজ্ঞতার পরিপূরক বলে আলোচনা-ভুক্ত হয়েছে। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই কালসীমার মধ্যেই আলোচিত যাবতীয় গ্রন্থ হয়ত প্রকাশিত হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্তরদশকেও স্বাধীনতা পূর্ব ইংরেজ কারাগারে তাঁদের বন্দীশালার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এ সব গ্রন্থগুলিও ঐ কালসীমার প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে বিশ শতকের স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত প্রাপ্ত বাংলা কারা সাহিত্যের আলোচনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডে স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল থেকে বর্তমান দশক পর্যন্ত প্রকাশিত ও প্রাপ্ত বাংলা কারা-সাহিত্যের মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে—এই আশা রাখছি।

কারাসাহিত্য অর্থাৎ কারাগার-বিষয়ক সাহিত্য অর্থে শব্দটি শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ব্যবহার করেন বলে মনে হয়। বাংলা উপন্যাসে কারা-জীবন কাহিনীর পর্যালোচনা সূত্রে চারটি গ্রন্থ (পাষাণপুরী, জাগরী, বি-কেলাস এবং লৌহকপাট) কেন্দ্র করে এ বিষয়ে তিনিই বিস্তারিত এবং মনোজ্ঞ একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, যেটি তাঁর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু তার আলোচনা ছিল ছিল একান্তই উপন্যাস-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ কারাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বিত বিষয় ছিল কারাজীবন অবলম্বনে লিখিত কাল্পনিক কাহিনী। তবু সেই কাল্পনিক কাহিনীর ভিত্তি তো বাস্তব অভিজ্ঞতাই। ব্রিটিশ আমলে অসংখ্য কারাবন্দী তাঁদের জীবন-অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। সেগুলি কোন সূত্রে পাঠ করতে করতে কারাসাহিত্য নিয়ে একটি বিস্তারিত তথ্যসমীক্ষার ইচ্ছা জাগে। তখনই সন্ধান নিয়ে দেখা গেল অসংখ্য চিঠিপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, 'আত্মজীবনী,' কবিতা এবং উপন্যাসে তথ্য

অভিহিত কারাসাহিত্যের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। এই সমস্ত উপকরণের অনেক কিছুই আজও বাংলা সাহিত্যের বাইরে থেকে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত সাহিত্য ধারার উপর যে ধরণের গবেষণা এ যাবৎ হয়ে থাকে, কারাসাহিত্য সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সেই ধরণের গবেষণার মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায় না। বস্তুতপক্ষে কারাকেন্দ্রিক কারা-অভিজ্ঞতামূলক রচনা আদৌ সাহিত্য কিনা বা কতখানি সাহিত্যগুণান্বিত, সে বিষয়ে সাহিত্য বিচারকের প্রারম্ভিক জিজ্ঞাসা বিষয়টিকে কুণ্ঠিত করতে বাধ্য। কিন্তু একালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক গবেষণার স্বরূপ ক্রমশ বদলে যাচ্ছে—নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনার বদলে সমাজবিজ্ঞাননির্ভর সমালোচনা, আন্তঃ শৃঙ্খলামূলক সমালোচনা, অবয়ব গঠনগত বিশ্লেষণ প্রাধান্য পাচ্ছে। সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে সংখ্যাতত্ত্ব, গণিত বা জ্যামিতিক সূত্রের প্রয়োগ ঘটছে। বাংলা চরিতসাহিত্য নিয়ে আজ কোন বিস্তারিত গবেষণা ও তথ্য সমীক্ষা করা সম্ভব হয় তবে চরিত সাহিত্য রূপে যত তথ্য সংগৃহীত হবে, সবই কি 'সাহিত্য'? বাংলায় ইতিহাসচর্চা বা বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস সংকলন করলে তা কি সবই বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের উদাহরণ হবে? সংবাদসাহিত্য বা সাংবাদিকতার উপর গবেষণাও সাহিত্যের এলাকাতেই সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু তার মানদণ্ড অবশ্যই নন্দনতত্ত্ব নয়।

সুতরাং কারাবিষয়ক রচনার আলোচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নও অনুরূপভাবে সমাজবিজ্ঞান ঘেঁষা হবে—এই বিষয়ে আমার গবেষণা কর্মের পরিচালক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলবিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার বসুই আমাকে সঠিক নির্দেশনা দান করেন এবং আমার সংশয়ের নিরসন করে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত করেন। তিনিই আমাকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন, বহু গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন এবং প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত কারাকেন্দ্রিক রচনার প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ডঃ বসু যে ভাবে সঠিক পথনির্দেশ, উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা দিয়েছেন, সে জন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্ভব ছিল না।

তবু আমাদের আলোচনার বাইরে এ জাতীয় অনেক রচনা থেকে গেছে যা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। আশা করি ভবিষ্যৎ গবেষক আমাদের এই অসম্পূর্ণতাকে সংশোধন করতে পারবেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কারা কেন্দ্রিক সাহিত্য বিষয়ে ইংরাজিতে বহু গবেষণা হয়েছে, সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত

গ্রন্থপঞ্জী পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের সাহিত্যে এই অধ্যায়টি অবহেলিত। বর্তমান গবেষক তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় এই সম্পর্কে একটি প্রাথমিক প্রয়াস রচনা করেছেন মাত্র।

আবার বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির পর এমন অনেক কারাকেন্দ্রিক গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি, যে গুলির আলোচনা আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করা যায় নি। সংগ্রহের তালিকায় অনালোচিত এরকম গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য নয়। গবেষণার বিষয় 'বাংলা কথাসাহিত্য ও গদ্য সাহিত্যের একটি ধারা : বাংলা কারাসাহিত্য' হওয়ার জন্যে এই আলোচনার পরিসর থেকে নাটক কবিতা বাদ রাখা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গবেষণা কর্মের জন্য পি এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করি। পরবর্তী সংস্করণে আলোচনার পরিধি বাড়বে এই আশা রাখছি। যদিও আমার লক্ষ্য বাংলা কারাসাহিত্যের বিস্তারিত ইতিহাস রচনা নয় আমার লক্ষ্য বাংলাকারাসাহিত্যের উপত্যকার মানচিত্র অঙ্কন। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ধরণের বিষয়ের আলোচনায় কেউ কখনো সম্পূর্ণতা দাবী করতে পারবেন না।

গবেষণা কর্মের অপর দুই পরীক্ষক শ্রদ্ধেয় ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় ও শ্রদ্ধেয় ডঃ গোপিকানাথ রায় চৌধুরীকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। পরবর্তীকালে ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের অকাল তিরোধানের অসহনীয় দুঃসংবাদ এসেছে। এই মর্মান্তিক বেদনাঘাত বক্ষে নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে।

আমার ছাত্র শ্রী সনৎ মুখোপাধ্যায় যিনি বর্তমানে সারদাচরণ এরিয়ান ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষকতায় রত, নানাবিধভাবে দিনের পর দিন অকৃপণভাবে সাহায্য করে আমাকে ঋণী করেছেন, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। একইভাবে আমাকে নিরন্তর সাহায্য করে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রেখেছেন শ্রীমতী মঞ্জু মিত্র (দত্ত) ও শ্রী অসিত দত্ত।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী অশোক চৌধুরী বর্তমান বিষয়ের আলোচনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন ও মতামত জ্ঞাপন করেছেন এবং প্রাক্তন বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও মতামত দিয়ে উভয়েই আমাকে ঋণী করেছেন। পূর্বতন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পাঁচুগোপাল দত্তের অকাল প্রয়াণ ব্যথাহত চিত্তে স্মরণ করে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। বাংলা বিভাগের রিডার ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, রিডার ডঃ শঙ্কর ঘোষ এবং অধ্যাপিকা সুব্রতা নন্দী নানা ভাবে সাহায্য করেছেন।

তাঁদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতিহাস বিভাগের রিডার ডঃ কল্যাণ চৌধুরী বিভিন্ন গ্রন্থ ও মতামত জ্ঞাপন করে সঠিক পথনির্দেশ করেছেন। এছাড়া ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক চন্দ্রনাথ রায়, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিনয় ভট্টাচার্য, রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দীননাথ সামন্ত, ডঃ শ্যামলকান্তি পাণ্ডা, ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুব্রতগোপাল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অসীম গুপ্ত, অধ্যাপক প্রবাল দত্ত, অর্থনীতিবিভাগের অধ্যাপক শংকর দাসগুপ্ত, অধ্যাপক অমিত চট্টোপাধ্যায়, গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়, ডঃ রবীন ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত, বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুনীল চ্যাটার্জী, অধ্যাপক মণি রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুকুমার ঘোষ, পদার্থ বিভাগের ডঃ প্রদীপ ঘোষ, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক সত্যব্রত দাসগুপ্ত, প্রধান অধ্যাপক সুবোধ ঘোষ, হিন্দী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শিউকুমারশর্মা ও মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক অমর ঘোষ, অধ্যাপক সুধাংশুশেখর যশ, অধ্যাপক অসীম ঘোষ, মহারানী কাশীশ্বরী কলেজের অধ্যাপিকা দীপালি রায় ও অধ্যাপিকা শান্তি মুখার্জী, মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রী ভবরঞ্জন চাকলাদার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীঅরুণ চাঁদ দত্ত, শঙ্কর লাল ভট্টাচার্য এবং বন্ধুবর শ্রী অশোক উপাধ্যায় নানা সময়ে সাহায্য করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অমূল্য সময়ের অনেকটাই আমাকে দেওয়ার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। গ্রন্থের প্রকাশনার ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায় নানা সময়ে খোঁজখবর করেছেন এবং আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের কলেজের বাংলা সাম্মানিক বিভাগের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র ও বর্তমানে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রেখেছেন। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য কখনো পত্রে, কখনোও বা মুখোমুখি আলোচনায় আমাকে সাহায্য করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের সতীর্থ শ্রী সমরেশ মজুমদার বর্তমানে স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। বরাবরই এঁর সঙ্গে

আমার সম্পর্ক মধুর। বন্ধু হিসেবে তিনি যে পরামর্শ ও চিন্তা-ভাবনা ব্যক্ত করেছেন তা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। ছাত্রতুল্য শ্রীমান ভাস্কর ভট্টাচার্য স্বল্পদিনের পরিচয়ে যে সাহায্য করেছেন তা বিস্মৃত হবার নয়। আনন্দবাজার পত্রিকার খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীসুদেব রায়চৌধুরী কেবলমাত্র গবেষণার বিষয় নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেননি, দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে আমাকে স্নেহপাশে বদ্ধ রেখেছেন। এঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের প্রতি আমার মা ও বাবা শ্রীমতী উমারানী চৌধুরী ও শ্রী কালিদাস চৌধুরীর অপরিসীম শ্রদ্ধা আমাকে বাল্যকালে মুগ্ধ করত। তাঁদের কাছ থেকেই বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মায়। তাঁরা কেউ-ই আজ পৃথিবীতে নেই, তবু তাঁদের আশীর্বাদই আমার জীবনের একমাত্র মূলধন। তাঁদেরকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি।

আমার নিকট ও পরম আত্মীয় শ্বশ্রূঠাকুর শ্রীঅমিয় কুমার দে ও শ্বশ্রূঠাকুরানী শ্রীমতী স্বস্তি দে নানা তথ্য, সংবাদ ও ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, শ্রীমতী স্বস্তি দে বিপ্লবী উল্লাসকরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আমাকে দিয়েছেন তাতে উল্লাসকর সম্পর্কে যে স্বল্পধারণা আমার ছিল, তা বহুগুণে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। শ্রীমতী দে (চৌধুরী) কৈশোরকালে মেদিনীপুরে অবস্থানের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলির যে পুংখানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তা রোমাঞ্চকর।

আমার অগ্রজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা শ্রী চণ্ডীদাস চৌধুরী, শ্রী অমরদাস চৌধুরী, শ্রী শচীদুলাল চৌধুরী ও বিশেষ করে বড় বৌদি শ্রীমতী শিবানী চৌধুরী এবং পরম আত্মীয় শ্রীঅরুণাংশু বসু রায়, শ্রী সৌরভ কর, শ্রীমতী শুভ্রা কর, শ্রী শরৎ চন্দ্র বসু এঁরা সকলেই কাজের ব্যাপারে সর্বসময় আগ্রহ প্রকাশ করে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদেরকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। অধ্যাপক রাজজ্যোতিষ ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দিল্লী প্রেসের কলকাতা অফিসের ম্যানেজার শ্রী সৌমেন ঘোষ গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য নানাভাবে সাহায্য করায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বন্ধুবর শ্রীঘোষের সক্রিয় ছাড়া এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব ছিল না। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

কলকাতা পুলিশ বিভাগের এমন কয়েকজনের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘকাল বজায় আছে যাঁদের মধ্যে বর্তমানে কমপিউটার সেলের ও. সি. শ্রীসুজিৎ মিত্র বাংলাদেশের বিপ্লবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে নতুন তথ্য পরিবেশন করে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দেরও বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়েছেন, ইংরেজ আমলের পাঠ নিষিদ্ধ পত্র পত্রিকার তালিকা প্রনয়ণেও সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋনী।

ব্যবহারজীবী রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। তাঁর ছোট ভাই বিখ্যাত শিল্পী শ্রী যোগেন চৌধুরী বর্তমানে বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যাপক, যিনি প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন, ছোট ভাই হিসাবে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্নেহাশীর্বাদ জানাই। গ্রন্থটি পরিবেশনার জন্য মডার্ন বুক এজেন্সীর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য যে অকৃপণ সাহায্য করেছেন তা কোনদিনই ভোলবার নয়। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানির শ্রী হিতেন্দু ভট্টাচার্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে নানা ভাবে সাহায্য করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির উৎসর্গের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা বহুদিনের। কারাসাহিত্য উৎসর্গ করার জন্য এমন একজন মানুষ দীর্ঘদিন আমার মনের মধ্যে আঁকা ছিলেন যাঁকে জীবিত অবস্থায় চাক্ষুষ দর্শন পাব এমন প্রত্যাশা ছিল না। তবু এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। তিনি হলেন বর্তমান দুনিয়ার মুক্তিসংগ্রামের নেতা রোলিহলাহলা নেলসন ম্যাণ্ডেলা। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার নন, স্বাধীনতা ও শান্তির লক্ষ্যে সারা দুনিয়ার অভিযাত্রী মানবাত্মার মূর্ত প্রতীক হলেন নেলসন ম্যাণ্ডেলা। সুদীর্ঘ সাতাশ বছরের নির্যাতন ও কারাবাস যাঁর মনোবল ভাঙতে পারেনি এমন একজন মহান মানুষকে গ্রন্থ উৎসর্গ করা তো নিতান্তই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি নি। ১৯৮৯ সালে গোড়া থেকে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এসেছি ডঃ ম্যাণ্ডেলার সঙ্গে। বিভিন্ন সূত্র ধরে, বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের দ্বারস্থ হয়ে, বিদেশী দূতাবাসের মাধ্যমে এবং অবশেষে সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে চিঠি লিখে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৯ সালের জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আমাকে চিঠি লিখে জানালেন যে আমার চিঠি মিঃ ম্যাণ্ডেলাকে দিতে তাঁদের কোন অসুবিধা নেই। খানিকটা আনন্দে মন নেচে উঠলো, মিঃ ম্যাণ্ডেলার কাছ থেকে শুভেচ্ছা বাণী পাব বলে। আশার আলো দেখতে পেলাম। চিঠির উত্তরের প্রত্যাশায় দিন কাটতে লাগলো। ১৯৯০ সালের ১২ ই ফেব্রুয়ারী মিঃ ম্যাণ্ডেলা মুক্তি পেলেন, বন্দীজীবনের বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টি

হলো। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে ভারত ভ্রমণে এসে ১৮ই অক্টোবর কলকাতার গণ সম্বর্দ্ধনায় বললেন—"কলকাতায় আসা আমার কাছে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। আই ফিল মাই ব্যাটারী রি-চার্জড।" মি. ম্যাণ্ডেলার কলকাতায় আসার এই সুযোগ আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে চাইলাম। যেমন করেই হোক তাঁর সঙ্গে আমায় সাক্ষাৎ করতে হবে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে—ডঃ ম্যাণ্ডেলাকে লেখা আমার চিঠিপত্র, দ.ক্ষণ আফ্রিকা সরকারের লেখা আমার নামে চিঠিপত্র, এই গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অনুদান আমাকে দিয়েছেন সেই অনুদান পত্র ইত্যাদি নিয়ে কলকাতা পুলিসের কাছে সাহায্যের জন্য শরণাপন্ন হলাম। ঐ সময়ে রাজভবনের ও. সি. শ্রীগোপালকৃষ্ণ তরফদার, অন্যতম অফিসার শ্রীশিশির ব্যানার্জী এবং ডি সি শ্রী কিরীটিরঞ্জন সেনগুপ্ত কলকাতা পুলিশের এই তিন মহোদয়ের অকৃপণ সহায়তায় মি. ম্যাণ্ডেলার সাক্ষাৎ পাই ও গ্রন্থ বিষয়বস্তু শোনার পর মি. ম্যাণ্ডেলা শুভেচ্ছাবাণী নিজে হাতে লিখেছেন এবং বলেন, 'গ্রন্থ প্রকাশের পর আমাকে একটা বই পাঠিও।'

মি. ম্যাণ্ডেলাকে লেখা আমার চিঠি, আমাকে লেখা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের চিঠি, রাজভবনে মি ম্যাণ্ডেলা লিখিত শুভেচ্ছাবাণীর অনুলিপি এই গ্রন্থের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। কলকাতা পুলিশের ঐ তিন মহোদয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমার স্ত্রী শ্রীমতী কল্প চৌধুরী ও আমার কন্যা অন্তরা চৌধুরীকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। নানা অসুবিধার মধ্যে এঁরা যে ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তা ভোলবার নয়। ধন্যবাদ দেবার সম্পর্ক না হলেও এঁদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল।

পরিশিষ্টাংশে জেলখানায় বিবাহ ঘটিত একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ, বিপ্লবী গণেশ ঘোষের একটি কবিতা, বিপ্লবীদের ব্যবহৃত শীলমোহরের একটি ছবি এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কারা বিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধ ইত্যাদির তালিকা সংকলিত হয়েছে।

বাহুল্যবোধে (১) অনেক বিদেশী প্রসঙ্গ-যেমন নিউইয়র্কের বার্নেস এণ্ড নোবেল বুক স্টোর প্রেরিত এই বিষয় সংক্রান্ত পুস্তকের তালিকা (২) বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও বৈপ্লবিক গ্রন্থাদি (৩) কমবেশি চল্লিশটি কারাগ্রন্থে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার তালিকা (৪) ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের তালিকা আলোচনার বাইরে থেকে

গেছে। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করে শ্রদ্ধেয় ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় ডঃ অজিত ঘোষ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রী সমরেশ মজুমদার যে মতামত জ্ঞাপন করেছেন তার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, বালি সাধারণ পাঠাগার এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ লাইব্রেরীর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

বহু চেষ্টা করেও মুদ্রণ প্রমাদ রয়েই গেল, এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই গ্রন্থের যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার দায়দায়িত্ব বিনীতচিত্তে বহন করছি।

আদিত্য চৌধুরী

১৭০ লেকটাউন, ব্লক-বি
কলকাতা-৭০০ ০৮৯
শিক্ষক দিবস, ১৯ ভাদ্র, ১৩৯৮

বাংলা কারাসাহিত্য

ভূমিকা

বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রিক চেতনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে গত দুশো বছরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে দুটি শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করেছে—প্রথম শ্রেণী সরকারী কাজে সুযোগবঞ্চিত পিছিয়ে থাকা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এসেছেন। অন্য একটি অংশ যাঁরা আদর্শবাদী, সৎ এবং আত্মত্যাগী। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ব্রিটিশ উচ্ছেদ অবশ্য কর্তব্য মনে করেছিলেন। তত্ত্বগত দিক থেকে এঁদের ভাবাদর্শ নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম। প্রকৃতপক্ষে বাংলা কারা-সাহিত্যের সূচনাপর্বের প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় শাখাটির স্বাদেশিক মূল্যবোধ ও হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক বেদান্ত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ভারতসভা' ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন সুরু করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশার্থী ভারতীয়দের বয়স ২১ থেকে ১৯ বছরে কমিয়ে আনা হলে সুরেন্দ্রনাথ সরকারী সুযোগ-বঞ্চিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রশংসা অর্জন করলেও প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট এবং অস্ত্র আইনের (অর্থাৎ ভারতবাসীকে নিরস্ত্র রাখার প্রচেষ্টা) প্রতিক্রিয়া থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আকার নেয়। এর আগে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'জমিদার সভা' (১৮৩৮), ১৮৬১ সালে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা, ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা, ১৮৬৮ সালে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রকাশ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে তত্ত্বগতভাবে সুনির্দিষ্ট করে। কিছুদিন পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা, শ্রী অরবিন্দের 'নিউ ল্যাম্পস্ ফর ওল্ড' প্রবন্ধাবলী, মহারাষ্ট্রের তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়ের সন্ত্রাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সোচ্চার করে তোলে।[১] এরপর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সুরু হয় প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকারের নীতি ও কাজের সমালোচনা ও সংস্কার দাবী করছে যখন ঠিক সেই সময়ই লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ জাতীয় চেতনার উপর সরাসরি আঘাত সৃষ্টি করে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্যাপক জনগণ অংশ গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বক্তৃতা, কবিতা ও গান এই সময় বাংলাদেশে স্বাধীনতার স্পৃহাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। এরই সঙ্গে কলকাতা, চন্দননগর, ঢাকা,

বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে গুপ্ত সমিতির ক্রিয়াকলাপ সুরু হয়ে যায়। সমিতিগুলি বিচ্ছিন্ন ও গুপ্ত হলেও তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। একদিকে স্বদেশী আন্দোলন অপরদিকে গুপ্ত সমিতিগুলির সশস্ত্র বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন ও অত্যাচারকে আরও জোরদার করে। পত্র পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়, সম্পাদক ও প্রকাশক'রা কারারুদ্ধ হন, বিভিন্ন স্তরের নেতাদেরও অবরুদ্ধ করা হয়। ঐ অস্থির সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছেন—

"বিপ্লববাদ বঙ্গে ধর্মে'র আকার গ্রহণ করে। নৈষ্ঠিক লোক যে প্রকার ধর্মে'র মতবাদ হইতে নড়চড় হয় না ও তাহার জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত, বিপ্লববাদও বঙ্গে সেই প্রকা'র আকার ধারণ করে।"

ফলে স্বদেশী আন্দোলনের মূল স্রোতটি ব্যারিস্টার জমিদার উকীল এবং উচ্চবিত্তের হাত থেকে ছাত্র ও যুব সমা'জের হাতে চলে আসে। কিন্তু তারা ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বৈপ্লবিক দল ও উপদলগুলির কোনো ফ্রন্ট তৈরীর চেষ্টা করেনি। জীবনতারা হালদারের 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে ত্রিশ বছর' গ্রন্থে দেখা যায় অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নীতি, লক্ষ্য, কর্মপন্থার তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত দিকটির কোনো বৈজ্ঞা'নিক ব্যাখ্যা করা হয় নি। বরং 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলনদলে'র নির্ভীক ও বৈপ্ল'বিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিশ্লেষণই বেশি যুক্তিপূর্ণ—

"বঙ্গে রাজনীতিক ডাকাইতির ইতিহাস এক 'মেলোড্রামার' অভিনয়। ইহা বঙ্গেই সংঘটিত হইতে পারে বাঙ্গালা আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর দেশ। সেই অভিনয়ই বঙ্গে পুনঃ পুনঃ হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, বাঙ্গালায় যে শেষ রাজনীতিক ডাকাইতি ১৯০৭ খৃঃ ঘটিয়াছিল তাহা ত্রিশ জন ১৬।১৭ বৎসরের বালকদের দ্বারাই স ঘটিত হইয়াছিল।'[৩]

স্বদেশীচেতনার যে বৈপ্লবিক আয়োজন বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তাকে ধরে রাখার মত সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অভাবই গুপ্ত সমিতিগুলির ক্রিয়াকলাপকে ক্রমাগত জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমরা সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের 'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা', প্রতুল চন্দ্র

গাঙ্গুলীর 'বিপ্লবীর জীবনদর্শন', নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবের সন্ধানে' গ্রন্থগুলি থেকে জেনেছি এই সব বিপ্লবীরা সর্বভারতীয় পর্যায়ে ব্যাপক জনগণের মধ্যে ফ্রন্ট গঠন করতে পারেননি যার মধ্যে থেকে একটি রাজনৈতিক রণনীতি ও কৌশল সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য একথা সত্য ক্রমাগত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ, তা যত বিচ্ছিন্নই হোক, ব্রিটিশ সরকারকে রীতিমত সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল করে। মুরারিপুকুর ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯০৮) দেখা যায় ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কলকাতা, চন্দননগর, তমলুক, যশোহর, খুলনা, এই সব অঞ্চলের কর্মীরা ছিলেন। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার কারাগারে এবং ফাঁসীদণ্ডে মোট ১৫ জনকে হত্যা করে।[৪] কারাগারে মৃত্যুর তালিকার বাইরে আরো অনেক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল। এভাবে ক্রমাগত কারারুদ্ধ হওয়া, কারাগারে মৃত্যুবরণ করা—কারাগারকে মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষার বিষয় করে তোলে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের পূর্বে মোঘলযুগেও কারাগার ছিল। কিন্তু সে কারাগারের খবর সাহিত্য হয়ে ওঠে নি। কেন না যে কোনো যুগে, যে কোনো রাষ্ট্রে কারাগার আপাতভাবে রাষ্ট্রের মঙ্গল ও প্রতিরক্ষার অস্ত্র হিসাবে কাজ করে। সেজন্য কারাগারকে কোমলতার মোড়কে আবৃত করে বলা হয় 'সংশোধনাগার'-মানবমনের কুপ্রবৃত্তি, হিংসাশক্তি এবং ব্যভিচারের প্রতিষেধক যেন কারাগার। এজন্য যাঁরাই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতেন জনমানুষের কাছে তাঁরা সমাজবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হতেন। সমাজবিরোধী মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করবেন কেমন করে? এ কারণেই মধ্যযুগের ইতিহাসে কারাগার সাহিত্যের অঙ্গনকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করেনি।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে কারাগারকে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত করে।

বাংলা ১৩১৫ সনের 'বঙ্গদর্শন' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছেন 'পথ ও পাথেয়'—

"আজ ঐ যে বন্দীশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে—দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়" ১৩২৩ সনে 'প্রবাসী'

পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হলো একটি বিশেষ ঐতিহাসিক রচনা 'কারাগারে বিধবা'। অপরাধিনী নারী সমাজকে কেন্দ্র করে তথ্যপূর্ণ রচনায় ব্রিটিশ কারায় মহিলাদের অবস্থায় প্রকৃত রূপটি প্রকাশিত হলো। ১৩২৭ সনের ১২ই চৈত্র সংখ্যায় সাপ্তাহিক পত্র 'বিজলী'তে 'আন্দামান ফেরতের চিঠি' নামক নিবন্ধে সেলুলার জেল এবং পোর্টব্লেয়ারে সাধারণ বন্দীদের নির্যাতনের কথা প্রকাশিত হয়—

"যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর যাবজ্জীবন জেল এই ডবল সাজার ব্যাপারটা যে বে-আইনি হচ্ছিল তা কর্তাদেরও চোখে পড়েছে; তাই তারা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে" The Indian Penal Code should be amended by the substitution of rigorous imprisonment for transportation." অর্থাৎ আইনের কেতাবে দ্বীপান্তর কথাটা তুলে দিয়ে তার যায়গায় সশ্রম 'কারাদণ্ড' বসিয়ে দেওয়া হোক। কেমন দুঃখ ঘুচলো ত? ব্যাপারটাকে ত আর বে-আইনি বলতে পারবে না। যাদের কলমের ডগায় আইনের জন্ম, তাদের সঙ্গে আইন নিয়ে লড়ালড়ি যে কি ঝকমারি তা যে মানুষ বোঝে না।" ঐ একই প্রবন্ধ থেকে আমরা আরও জানতে পারছি—

"রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্যে সেই কালাপানি, সেই ঘানি, সেই ছোবড়া পেটবার ব্যবস্থাই বজায় রইল। মেজর মারে আর কর্ণেল ফার্ণসাইড পোর্টব্লেয়ার উঠিয়ে দেবার জন্য যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সে সমস্ত অরণ্যে রোদন হয়ে গেল।"

এভাবেই কারাগারে স্বদেশী আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের ঢেউ প্রবেশ করায় কারাগার সম্পর্কে মানুষের কৌতুহল এবং শ্রদ্ধা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ঐ সময় থেকে আন্দামানের সেলুলার জেল সম্পর্কে কারাস্মৃতি-মূলক গ্রন্থরচনার সূত্রপাত। এর আগে কারাকেন্দ্রিক গ্রন্থ অবশ্যই রচিত হয়েছে কিন্তু কারাগার তখন মানুষের কাছে সামাজিক মর্যাদা পায়নি। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত-ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক কারণে কারাবরণই কারাগারকে সামাজিক করে তোলে এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সাধারণ মানুষের কাছে কারা-জীবনকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে 'বিজলী', 'ভাণ্ডার', 'বাঙ্গালার কথা', 'এডুকেশন গেজেট, 'সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'প্রবাসী' 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নানা সময় কারাকেন্দ্রিক রচনা প্রকাশিত হ'তে থাকে। অর্থাৎ ঐ পত্রিকাগুলি

কারাস্মৃতিমূলক রচনা প্রকাশে এবং কারাগারকে মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

মহাত্মাগান্ধী জেলকে জীবনের পরাধীন কারারুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেন এবং তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষকেই 'এক বৃহৎ কারাগার' রূপে বর্ণনা করলেন। সুতরাং কারাগারের গোত্র ও মর্যাদা রক্ষণশীল মানুষের কাছেও বৃদ্ধি পেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'বাঙ্গালার কথা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯২১ সালে ২৫ শে নভেম্বর 'জেলভর্ত্তি' নামক প্রবন্ধ লিখলেন। ১৯২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঐ একই পত্রিকায় হেমন্তকুমার সরকার লিখলেন 'জেলের ভয়'—তিনি লিখলেন—

"স্বরাজ লাভের তাই প্রথম পরীক্ষা জেলযাত্রা। জুজুর ভয় একবার ভাংলেই, এ পরীক্ষায় পাস করলেই—আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন আমরা যা চাইব তাই মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।"

ভারত এবং বাংলার কারাগার সম্পর্কে নানা ধরনের প্রবন্ধ 'ভাণ্ডার', 'বিজলী', 'এডুকেশন গেজেট', 'সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ', 'মাসিক বসুমতী' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩১২ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতের প্রতি নিবেদন', ১৩২৮ সালের ৩০ শে বৈশাখ সংখ্যায় 'বিজলী' পত্রিকায় সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের 'কালাপাণির কয়েদী', ১৩২৬ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের একটি ক্ষুদ্র রচনা 'খাঁচার মধ্যে কয়েদী', ১৩২৯ সালের ২০ শে বৈশাখ' 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'অসহযোগী বন্দিগণের প্রতি ব্যবহার' ; ১৩২৯ সালের ১১ ই অগ্রহায়ণ ঐ একই পত্রিকায় 'ভারতের কারাগার', ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিবিধ-প্রসঙ্গের' অন্তর্গত একটি রচনা 'ভারতীয় জেলখানা', ১৩৪০ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'মাসিক বসুমতী'তে সাময়িক প্রসঙ্গের অন্তর্গত 'বাঙ্গালার জেলখানা' এবং ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ঐ একই পত্রিকায় সাময়িক প্রসঙ্গের অন্তর্গত 'আন্দামানে অনশন' ইত্যাদি রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের মধ্যপর্ব থেকে ভারতবর্ষের কারাগারগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৮০৪ সালের রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৮১৮ সালের দি বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স এ্যাক্ট, ১৮৬০ সালের ইণ্ডিয়ান কোডের XLV ধারা,

১৮৬৭ সালের প্রেস এ্যাক্ট, ১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পারফরমেন্স্ এ্যাক্ট, ১৮৭৮ সালের ভারতীয় অস্ত্র আইন, ১৮৯৮ সালের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর এ্যাক্ট-এর ৫ ধারা ইত্যাদি ছোট বড় দমনমূলক আইনের মধ্য দিয়ে ১৯০৮ সালে এক নতুন সংবাদপত্র-নিরোধ বিল পাশ হয়। এরপর ভারতীয় প্রেস এ্যাক্ট চালু হয় ১৯১০ সালে। এই ধারাগুলি বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ও গণ-চেতনাকে দমন করার জন্য কার্যকর হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ একের পর এক ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক দিকগুলি লক্ষ্য করছিলেন। ১৯০৫ সালের কার্লাইল সারকুলারের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ নির্যাতন সম্পর্কে প্রতিবাদ করতে থাকেন। এবং এইসময় তিনি প্রবন্ধ ও গান রচনার মধ্য দিয়ে স্বদেশীচেতনাকে গৌরবময় উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১৫ সালে ভারতরক্ষা আইন পাশ হাবার পর এ্যানি বেসান্ত গ্রেপ্তার হন। সেই গ্রেপ্তারে রবান্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বেঙ্গলী পত্রিকায় একটি খোলা চিঠি লেখেন।[৫] এরপর ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রাওলাট এ্যাক্ট পাস হবার পর মহাত্মাগান্ধী যে বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলন স্বরু করেন তার কিছুদিনের মধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালের ২রা আগষ্ট কলকাতার টাউন হলে আন্দামান বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং অনশনরত বন্দীর মৃত্যু সম্পর্কে শোক প্রকাশের যে সভা ডাকা হয়েছিল সেখানে রবীন্দ্রনাথ সভাপাতর ভাষণে বলেছিলেন—

"রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই দাবী ন্যায্য এবং সামান্য। এই দেশে গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন; সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে সহস্র মাইল দূরবর্তী এক দ্বীপে নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত যে ব্যবহার করা হয়, সেই সম্পর্কে দেশবাসীর মনে স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে এবং তাহারা রাজনৈতিক বন্দীদের ভারতবর্ষে রাখিবার দাবী করিতে পারে।—তাঁহারা দেশে থাকিলে জন্মগত ভারতীয় কারাজীবনের তীব্র ক্লেশ অন্ততঃ কিয়দংশে হ্রাস করিতে পারে। প্রকাশ, বন্দীদিগকে আন্দামান হইতে দেশে ফিরাইয়া আনা হইবে কিনা, তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব ভারত গবর্ণমেন্ট নিজ স্কন্ধ হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। অধিকন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট বন্দীদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া কারণ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা সমস্ত বন্দীর যুক্ত আবেদন বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। শাসনযন্ত্রের হৃদয়হীন অনমনীয়তার নিকট উহার ন্যায়বোধ ও কারুণ্যধর্ম আর একবার পরাজয় মানিল।"[৬]

এবং রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত একটি টেলিগ্রাম আন্দামান বন্দীদের উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছিল—"Bengal anxious to know state of health of her exiled sons who are on hunger strike. The Country is solidly behind you.[৭]

একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অর্ধশতাধিক দমন ও পীড়নমূলক আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের মুক্তিচিন্তা ও গণআন্দোলনকে শুরু করতে চেয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই ভারতবর্ষের কারাগারগুলিতে একই সঙ্গে চালিয়েছিল অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি রাজবন্দীদের প্রতি এ জাতীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে কেবলমাত্র বিভিন্ন সভা সমিতিতেই অংশগ্রহণ করেননি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদির মাধ্যমে ঐ দমন পীড়নের বিরোধিতাও করেছেন। কারাগারের বাইরে থেকে রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় প্রগতিশীল ভূমিকায় বিপ্লবীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী জীবনের প্রতি কবিগুরুর ওই শ্রদ্ধাবোধ পরবর্তী জীবনে অনেক বিপ্লবী স্বীকার করেছেন এবং সাহিত্য-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ফলে কারামুক্তির পর তাঁরা অনেকেই কারাগারের প্রকৃত অবস্থা এবং কারাজীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করার দায়িত্ব অনুভব করেন। সেই অনুভবেরই যথার্থ ফল বাংলা কারাসাহিত্য।

সুতরাং কারাজীবন, কারাজগৎ আর মানুষের কাছে অজ্ঞাত বা ব্রাত্য থাকল না। তার শূদ্রত্ব ঘুচল এবং বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দরজা উন্মুক্ত হল। কারাজীবন ও জগৎকে কেন্দ্র করে কখনো রাজবন্দীর স্মৃতিকথা, কখনো কল্প-উপন্যাস গল্প, কখনো বা চিঠিপত্র প্রকাশের মধ্যদিয়ে বাংলার নাগরিক সাহিত্যের সমান্তরালে উপনগরীর মতো এই 'কারাসাহিত্য' শিষ্ট সাহিত্যের এলিট জগতকে ঘিরে ফেললো। এই গ্রন্থে কারাসাহিত্যের যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাবে বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক যুগ তার রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাহিত্যিক বিষয়গুলি কেমনভাবে কারাসাহিত্যের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেছে। বর্তমান সাহিত্যধারায় অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা যেমন কারাসাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন তেমনি এমন অনেক লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য জগতের অংশীদার নন। কিন্তু তাঁদের রচনাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। এই বিরাট সাহিত্যধারার মধ্যে একদিকে যেমন একটি যুগের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া, মত ও পথের

পার্থক্য সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ উন্মোচিত হয়েছে অন্যদিকে এমন অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে যাঁরা অত্যাচারে এবং নির্মমতায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছেন। কারাজীবনের অবরুদ্ধ কান্না, কয়েদী জীবনের সুখদুঃখের রকমফের, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নৈতিক স্তরের কয়েদীচরিত্রের কথা আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে যে ঐতিহাসিক সাহিত্যধারার সূত্রপাত তা অনেকটা নদীর মতো নানা দিক নির্দেশের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছিল। বিভিন্ন বৈপ্লবিক আদর্শের মানুষ, মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ এমন কি তাঁদের অনেকের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল আলাদা। একই কারাজীবনকে নানাভাবে দেখেছেন তাঁরা। তবে তাঁদের পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং পরিবেশন ক্ষমতা কতখানি—তার বিচার আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের গতানুগতিক পথের বাইরে আরো কত ধরনের ধারা উপধারা মূল সাহিত্য স্রোতকে পরিপুষ্ট করে তার ঐতিহাসিক যাথার্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে কারাসাহিত্য স্বতন্ত্র মূল্যমানেরই বাংলা সাহিত্য। বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিকের দিক থেকে এর রসবৈচিত্র্য সম্পূর্ণভাবে আধুনিক। বাংলা কথাসাহিত্য ও গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশে এমন একটি মূল্যবান ধারার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে কেবল সমৃদ্ধ করবে না, সাহিত্যের মর্যাদাও বৃদ্ধি করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

'এ যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।'

কারাসাহিত্য : মূল্যায়ন

প্রখ্যাত নাট্যকার সামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' বিদগ্ধ দর্শক রুচির সমর্থন লাভে বঞ্চিত হওয়ার পর যখন সমাজ থেকে দূরবর্তী কিছু কারাবাসীর সামনে অভিনীত হয়েছিল তখন সেইসব সুযোগবঞ্চিত মানুষগুলি 'গোডো ইজ সোসাইটি' বলে এই নাটকের একটি তাৎপর্য সন্ধানে সাফল্য লাভ করেছিল শোনা যায়।[৮] এতেই প্রমাণ হয়, সৎ সাহিত্যের আবেদন কারাপ্রাচীরের তমসাচ্ছন্ন অঞ্চলেও উপস্থিত হতে পারে। হওয়ার কারণও স্পষ্ট। বিভিন্ন কারণে কয়েদী জীবনে বিভিন্নতা ঘটে থাকে। বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীরা কারাগার ভরিয়ে তোলায় সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে এঁদের যেমন পার্থক্য ঘটেছে, তেমনি সাধারণ অপরাধীদেরও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। আর্থার কোয়েস্টলারের 'ডার্কনেস এ্যাট নুন' উপন্যাসের 'রুবাসোব', সল্‌ঝেনিৎসিনের 'আইভান ডেনিসোভিচ', গলস্‌ওয়ার্দির 'জাস্টিস' নাটকের কারান্তরালে নির্বাসিত প্রেমিক ফলডার, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'র নীলু অবশ্যই জরাসন্ধের 'লৌহকপাটে'র সমাজবিরোধী বন্দীদের থেকে পৃথক। বিভিন্ন কারণে বন্দী মানুষগুলির ছাঁদে বাধা দিনগুলি এক এক ধরনের উপলব্ধি নিয়ে আসে। ক্যামুর 'আউটসাইডার'-এর মিউরসল্টের মতো এমন প্রত্যয়ও জন্মাতে পারে—কী আসে যায় যদি তার প্রেয়সী মেরী তার অনুপস্থিতিতে বরণ করে অন্য কোন পুরুষকে? সুখবঞ্চিত কারাবাসীদের যেমন মিউরসল্টের মতো নিরাসক্তি আসতে পারে, তেমনি প্রাচীরের অন্যপ্রান্তে চলমান জীবনের সঙ্গ কামনায় নিবিড় ঔৎসুক্যও জাগতে পারে।

অথবা চে গুয়েভারার সঙ্গী হওয়ার অপরাধে অপরাধী রেজি দেব্রের মতো এমন বিশ্বাসও সৃষ্টি হতে পারে কোন কিছু পিছনে না রেখে যাওয়া হবে বড়োই অন্যায়। ছাব্বিশ বছর বয়সটা আত্মজীবনী রচনার উপযুক্ত না হলেও স্মৃতিভার-পীড়িত বন্দীদিনগুলিকে অতীতচারণায় ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মনে ভেসে আসে মার্কস ও লেনিনের রচনাগুলি কিভাবে সঞ্জীবিত করেছিল বৃহৎ জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার পরম আগ্রহকে। সুতরাং কারাগার সুস্থ মানুষের সবল দেহে নৈরাশ্যের ব্যাধি প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে, জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্নাতুর করে তুলতে পারে, আবার একের পাশে অন্যকে এনে জীবন সম্পর্কে আগ্রহী

করতে পারে। বন্দী রেজি দেব্রে পিছনে কিছু রেখে দিতে চেয়েছিলেন আর সমরেশ বসুর 'কুহিতন কুর্মী' এক সময়ের সংগ্রামের সাথীদের মধ্যে দেখেছিল সন্দেহ ও ঘৃণার বিষ। বিপ্লবী দেব্রে অতীতচারণার মধ্য দিয়ে নিজেকে যেন আরও গড়ে নিতে সুযোগ পেয়েছিলেন, আর কুহিতন কুর্মীর লেখক দেখালেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর শিক্ষাশালা কারাগার কত নিষ্ঠুর শিক্ষা দেয়। আসলে সংগ্রামী বন্ধুরা যে চিরকালের সাথী নয় এমন একটি নঞর্থক ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে সমরেশের এই প্রয়াস। সংগ্রামী দেব্রের জীবনলব্ধ প্রত্যয় অবশ্যই তা ছিল না। সুতরাং বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনায় ভরা কারাগার বাইরের সভ্য সমাজের পরম কৌতূহলের ক্ষেত্র। কোথাও চলেছে নিষ্ঠুর শাসনের তাণ্ডব, কোথাও মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা, কোথাও মাসলোভার মতো নারী তৈরি হচ্ছে অন্য বন্দীকে বিবাহ করে নির্বাসনের দিনগুলি বদল করে নিতে অথবা পাভেল কোরচাগিন [হাউ দি স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড] বন্দিনী যুবতীর তৃষাতুর ওষ্ঠাধরের স্পর্শে পেয়ে যাচ্ছে নবজীবনের স্পর্শ। স্বল্পায়তন প্রকোষ্ঠে কখনো নামছে নিবিড় আঁধার, কখনো ঝলসে উঠছে জীবনের বিদ্যুৎ। সূর্যালোকিত জীবন-রঙ্গমঞ্চের অনতিদূরে জানা-অজানায় ঘেরা আর এক জীবননাট্যের যে অভিনয় চলছে তার রহস্য অবশ্যই আকৃষ্ট করে দরদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে বিশেষ একটি সাহিত্যশাখা, বাঙলায় যাকে আমরা বলেছি 'কারাসাহিত্য'।

সাহিত্যের ক্ষেত্র, পরিধি এবং সামগ্রী সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সীমায়ন সম্ভব নয়। জীবন ও জগতের যে কোনো মূর্ত বা বিমূর্ত বিষয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। মানুষের কল্পনা-প্রতিভা, হৃদয়চারিতা, মননক্রিয়া ও মনস্বিতা জীবনের যেকোনো অভিজ্ঞতা উপলব্ধি এবং অনুভবকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করে। সভ্যতার সুরু থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানব সমাজের যে ধারাবাহিকতা তারই অন্যতম অনিবার্য ফল সাহিত্য। শিল্পীর প্রজ্ঞা ও অন্তরদর্শন, বিচারশীল মূল্যবোধ ও অন্যান্য সামাজিক রাজনৈতিক এবং নান্দনিক চেতনাপ্রবাহ আধুনিক মানব-সমাজকে অত্যন্ত জটিল করেছে। জীবজগতের মতো মানবজগতকে কোনো সরল জীবনবিজ্ঞানের নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায় না। যেক্ষেত্রে মানুষ তার ইতিহাস ও কৃতকর্মের বিচারক ও নিয়ন্ত্রক সেখানে তার ভূমিকা কখনো ভোক্তার, কখনো দ্রষ্টার। মানুষের ভাব ও ভাষা, মন ও হৃদয়, ইন্দ্রিয়চেতনা ও ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব এমন একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে যার পরিণাম ক্রমাগত কল্পনা, চেতনা

এবং অনুভবের রসায়ন ক্রিয়াকে ভাবের বিষয়ে পরিণত করেছে। সেক্ষেত্রে সাহিত্য সর্বদাই মানুষের ভাবরাজ্যের কথাকে তার সামগ্রিক চৈতনার বিষয় করে তোলে।

'সাহিত্যের সামগ্রী' সম্পর্কিত আলোচনায় আপাতভাবে যা নান্দনিক তা কেবলই শিল্পীর আত্মগত উচ্ছ্বাস এমন ভ্রমাত্মক ঝোঁকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সচেতন করে বলেছেন –

"একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখি যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত, পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন।

পাখির গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।"[৯]

জীবজগতের আত্মরক্ষার জন্য যে জীবনসংগ্রাম নিত্য ক্রিয়াশীল তারই সমান্তরালে মানবসমাজে বিকাশলাভ করেছে আত্মসংরক্ষণের চাহিদা। এই সংরক্ষণ চাহিদা দীর্ঘদিনের যৌথ সমাজজীবনের উদ্বৃত্ত পুঁজি যা মানুষের কল্পনা, মূল্যবোধ এবং চেতনার স্তরগুলিকে নিয়ত বিকশিত, বিবর্তিত এবং রূপান্তরিত করে। এজন্যে ললিতকলা, শিল্পকলা এবং নন্দনতত্ত্ব যতখানি বিমূর্ত, বিকীর্ণ, মানসিক এবং বর্ণহীন ততখানিই তা উত্তপ্ত, প্রগাঢ় এবং ব্যক্তি ও সমাজসাপেক্ষ। অর্থাৎ সাহিত্য সমাজ-জীবন এবং নান্দনিক অনুভবেরই যোগফল।

কারাসাহিত্য উপন্যাস, ছোটগল্প বা কবিতার মতো সাহিত্যের কোনো বিশেষ শাখা নয়। লেখক বা শিল্পীর বিষয় নির্বাচনে যে স্বাধীনতার কথা উপরে আলোচিত হয়েছে তার নিরিখেই বলা যায়, যে কথাসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্য কারাজগৎকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে, তাকেই 'কারাসাহিত্য' বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সচেতন শিল্পী প্রচেষ্টা এবং শিল্পগুণবর্জিত সংবাদধর্মী জ্ঞাতব্য বিষয় এর কোনটি গ্রহনীয়—এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি জটিল নয়। সাহিত্যনির্মিতির প্রকরণগত ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থেকেই 'সাহিত্য' কতখানি 'সাহিত্য' হয়ে উঠেছে এ প্রশ্ন উঠে আসে। কারাসাহিত্যের কাঁচা উপাদান জেলজগৎ, জেলের শাসকবর্গ, কয়েদীজগৎ এবং কয়েদীমন। উপাদানগুলি কীভাবে সাহিত্যে পরিবেশিত হবে তা লেখকের শিল্পদক্ষতার ওপর ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যেমন বাংলা কারাসাহিত্যে

প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো স্থায়ী ধারা নেই যা থেকে বর্তমান লেখক সম্প্রদায় শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ হয়ে উঠবেন। শিল্প ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা কালান্তরে ও যুগান্তরে যে নবতর শিল্প সংযোজনা করে সেই সংযোজনা কারাসাহিত্যে দুর্লভ।

বিষয় যেখানে নির্দিষ্ট সেখানে যদি লেখকমন নির্দিষ্ট হয় তাহলে কারাসাহিত্য হয়ে উঠবে বৈচিত্র্যহীন, একঘেঁয়ে ও গতানুগতিক। অবশ্য বাংলা কারাসাহিত্যে এ দুর্ঘটনা ঘটেনি। কেননা এখানে লেখকমন অনির্দিষ্ট, তাঁদেব কাবা-অভিজ্ঞতা নানাদিক থেকে পল্লবিত হয়েছে, তা লেখকেব মনে যে স্থায়ী রসচেতনা আছে তার দিক থেকে, সামাজিক ও বাজনৈতিক অবস্থানেব দিক থেকে। এমনকি পরাধীন ভাবতে দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মানসিক অবস্থারও স্থানান্তর হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভাবতবর্ষের বিভিন্ন জেলের রূপরেখার বিভিন্নতা অবরুদ্ধ বন্দীসমাজকে একই অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন করেনি। ফলে জেলব্যবস্থার দিক থেকে কাবাসাহিত্য নতুনতব হয়ে উঠেছে।

ভাবতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন, মোঘলযুগের অবসান এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া সন্ত্রাসবাদ। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের যে বাজনৈতিক সচেতনতা দানা বেঁধে উঠে তাকে এক কথায় বলা যায় দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ। জাতির স্বাধীন আত্মস্বাতন্ত্র্য, আত্মসম্মানবোধ জাতিব অন্তর্গূঢ় জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপিত কবে। সন্ত্রাসবাদ এই উদ্দীপনাব বাজনৈতিক ফল।

বাংলা কারাসাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি ব্রিটিশবিবোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। আমাদের আলোচ্য সময়সীমা স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত, যাব সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক। এজন্য এই সময়কালে কাবাসাহিত্যের মুখ্যধারাটি রাজনৈতিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন ক্রিয়া ভাবতবাসীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে চরম হিংসামূলক কর্মপদ্ধতি, বিভিন্ন সময়েব দমনমূলক আইন শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষে আদর্শবাদী স্বদেশ প্রেমিক একদল দেশব্রতী যোদ্ধাকে ব্রিটিশ কারায় নিক্ষিপ্ত করেছিল। এই সমস্ত স্বদেশপ্রেমিকের কারাজগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সাহিত্যরচনাব পথে আত্মনিক্রমনে প্রলুব্ধ কবেছে। এরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া বাংলা সাহিত্যে 'কারাসাহিত্য' নামক একটি ঐতিহাসিক ধাবার সংযোজন। অর্থাৎ বিশেষ একটি রাজনৈতিক কারণে যারা কাবারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতার ফসল বর্তমান কারাসাহিত্য। ইংরেজ কারাব্যবস্থার নানা উৎকেন্দ্রিক দিক, অবরুদ্ধ বন্দীমন, ব্যক্তির অসামাজিক মনোবৃত্তি, কারাগৃহের

নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব বন্দীমনে একটি বিকল্প আত্মপ্রকাশের সদাতাড়িত চাহিদা সৃষ্টি করেছে। এক কথায় বলা যায় ইংরেজ কারাব্যবস্থার স্থায়ী ফল বর্তমান কারাসাহিত্য।

এখানে মনে রাখা দরকার কারাগারে রচিত সমস্ত রচনাই কারাসাহিত্য নয়।[১০] কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন সেগুলিই কারাসাহিত্য বলে বিবেচিত। আবার এমনও ঘটেছে কারাভিজ্ঞতার বাইরে অন্যান্য উপাদান যেমন সন্ত্রাসবাদ, বিপ্লববাদ, রাজনৈতিক আবহাওয়ায় নিষ্পেষিত অনিশ্চিত ও কণ্টকিত গুপ্তজীবন কারা অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এগুলিকেও পূর্ণাঙ্গ কারাসাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। এ জাতীয় গ্রন্থগুলিতে বিপ্লবীজীবনের উদ্‌ভ্রান্ত উৎক্ষিপ্ত দুঃস্বপ্ন-তাড়িত নানা মুহূর্তের ছবি চিত্রিত। ফলে কারাসাহিত্যের সঙ্গে বিপ্লবীজীবন এবং সন্ত্রাসবাদী জীবন-যাত্রার নানা উপকরণ যুক্ত হয়ে এক বিমিশ্র চরিত্রের কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। অবশ্য কারাসাহিত্যের আলোচনায় উক্ত গ্রন্থগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কারাসাহিত্যের রাজনৈতিক ধারাটিকে বাদ দিলে যে ধারাটি অবশিষ্ট থাকে তা হল অরাজনৈতিক ধারা। এখানে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জেলজগতের সাধারণ উপাদান স্থান পেয়েছে। এই ধারার অধিকাংশ গ্রন্থই অর্ধ-কাল্পনিক। সুতরাং তথাকথিত কারাসাহিত্যে কল্পকথা এবং বাস্তব জীবনকথা দুইই উপজীব্য।

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে' (১৩৬৯) নামক সমালোচনা গ্রন্থে সর্বপ্রথম কারা-সাহিত্যের একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার সূত্রপাত করেন। কারাসাহিত্যের বর্তমান আলোচনার প্রেরণা উক্ত আলোচনাই, তাতে সন্দেহ নেই। তিনিই এই নতুন ধারার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এরপর বাংলাসাহিত্যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত সমালোচক কারাসাহিত্যের মূল্যায়ন করেননি। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য কারাসাহিত্য বলতে কারাকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিকেই গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর মতে কারাসাহিত্যের প্রথম আধুনিক নিদর্শন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী' (১ম প্রকাশ ১৪ই জুলাই, ১৯৩৩)। অবশ্য এর পূর্বেও কয়েকটি অসামান্য কারাগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে (বাংলায় অনূদিত কারাকাহিনীগুলি বাদ দিয়েও)। যেমন বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের কথা' (৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০); শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের 'কারাকাহিনী' (২৫শে জুন, ১৯২১); উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (২রা জুলাই,

১৯২১); উল্লাসকর দত্তের 'আমার কারাজীবনী' (১৯২৩); মদনমোহন ভৌমিকের 'আন্দামানে দশ বৎসর' (২২শে মে, ১৯৩০); এবং সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'শৃঙ্খল' (১৪ই মার্চ, ১৯৩৩) ইত্যাদি। অথচ কারাউপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"আমি কারাসাহিত্য অর্থে কারাগারে রচিত সমস্ত সাহিত্যকে নির্দেশ করিতেছি না—কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করিয়া যে সাহিত্য রচিত তাহাকেই উক্ত নামে অভিহিত করিতেছি।"[১১]

সে কারণে গ্রন্থালোচনায় তিনি কেবলমাত্র চারটি উপন্যাস (পাষাণপুরী', 'জাগরী', 'বি-কেলাস' ও 'লৌহকপাট') গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান আলোচনায় সেই বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আগেই বলেছি, সাহিত্যিক মূল্যায়নে গ্রন্থগুলিকে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দুভাগে ভাগ করা যায়। দুটি ক্ষেত্রেই বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কাল্পনিক কাহিনী স্থান পেয়েছে। যেহেতু আমাদের আলোচ্যকাল ১৮৭০—১৯৪৭ সাল অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত, এজন্য রাজনৈতিক ঘটনার ক্রমানুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রতি বিভাগে গ্রন্থ প্রকাশের কালানুক্রম রক্ষিত। কালানুক্রমিক আলোচনার ধারাবাহিকতা এই রকম :

ক. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯০৫ পর্যন্ত)

খ. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯০৫—১৯২২)

গ অসহযোগ আন্দোলন থেকে আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯২২—১৯৩০)

ঘ. আইন অমান্য আন্দোলন থেকে ৪২' এর আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯৩০—১৯৪২)

ঙ. আগস্ট আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পূর্বকাল পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯৪২—১৯৪৭)

চ. স্বাধীনতা উত্তরকালীন প্রকাশিত গ্রন্থ: (গ্রন্থগুলির রাজনৈতিক ঘটনাকাল স্বাধীনতাপূর্ববলেই বর্তমান আলোচনায় গৃহীত হলো)।

২

সাহিত্যিক মূল্যায়নের কোনো প্রথাসিদ্ধ ধারা নেই। সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তববাদী, অতিবাস্তববাদী, ভাববাদী বা রসবাদী এরকম নানা শ্রেণীভেদ

থাকলেও সমালোচনার মূল্যমানের এমন কোনো ধ্রুববিন্দু নেই যার সাপেক্ষে যথার্থ সাহিত্যিক মূল্য নিরুপিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যিক মূল্যায়নে গ্রন্থের সামাজিক ও রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক মূল্যায়নও এসে পড়ে। গদ্য-সাহিত্যে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যাসে কোনো সচেতন শিল্প কাঠামোর প্রয়োজন হয় না, যেমন প্রয়োজন হয় উপন্যাস, ছোটগল্প বা কবিতায়। এজন্য বর্তমান গদ্য গ্রন্থগুলিতে বিষয় নির্বাচন, চরিত্রসৃষ্টি এবং উপস্থাপনায় কল্পনার শিথিলতা, মন্থরতা এবং অসংবদ্ধতা লক্ষণীয়। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের লেখায় পরিচ্ছন্ন শিল্প-কাঠামো নেই। এর কারণ অধিকাংশ গ্রন্থে সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপনায়, বিষয় নির্বাচনে, চরিত্র চিত্রণে পটভূমির অনুষঙ্গ হিসাবে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা যুক্ত হয়েছে। বস্তুত আমাদের আলোচ্য গদ্য গ্রন্থগুলির শতকরা আশি ভাগই স্মৃতিকথা। লেখক সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্মী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। সাহিত্য তাঁদের পেশা নয়, নেশাও ছিল না। তাঁরা সাহিত্যিক হবার জন্য কারাকক্ষে প্রবেশ করেননি। কারা-ব্যবস্থার উৎকেন্দ্রিক অমানবিক পরিবেশ, নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা এক ধরনের শিল্পসম্ভাবনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যার সঙ্গে লেখক সম্প্রদায়ের কোন সচেতন সম্পর্কও তৈরি হয়নি—এজন্য বর্তমান স্মৃতি গ্রন্থগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অসচেতন শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। লোকসাহিত্যে যেমন সাধারণ গণমনের শিল্পবোধ ও সাহিত্যরসের প্রতিফলন ঘটে, বর্তমান কারাস্মৃতিগুলিতেও এক শ্রেণীর আদর্শবাদী বাঙালি মধ্যবিত্তের শিল্প-মন অবচেতনে ক্রিয়াশীল হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পরম্পরার দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণীয় হতে পারে না।

ফলে কারাসাহিত্যের আলোচিতব্য গ্রন্থগুলিতে সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনার কেলাসন অত্যন্ত সক্রিয়। রাজবন্দীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বদেশচিন্তা, বন্দীমনের একান্ত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া, জেল প্রতিবেশ, বিভিন্ন স্তরের কয়েদী চরিত্র, জেলকর্মচারী ও কয়েদীর পারস্পরিক সম্পর্ক, জেলজীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, ব্যক্তি জীবনের সাধারণ জৈব চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়) ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ কখনো সাহিত্যিকের, কখনো সমাজতাত্ত্বিকের, কখনো বা সাধারণ বন্দীর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষিত হয়েছে। কারাজগৎ আধুনিক সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করার ও নিরাপদ রাখার তাগিদে সৃষ্ট এমন এক জগৎ, সে জগতের কথা যখন সাহিত্যের অঙ্গনে এসে আঘাত করে তখন সেই সাহিত্যে রূপান্তরিত কারাজগতের

কথা কেমনভাবে এবং কোন গভীরতার স্তরে প্রকাশিত হলো সাহিত্যিক মূল্যায়নে সেইটুকুই হবে শেষ কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর স্বাধীনতা প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমাদের আলোচ্য কাব্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই দেশ ও কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থানান্তর ঘটেছে। পটভূমির ক্রতপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসনযন্ত্র, কারাব্যবস্থা, জেল প্রতিবেশ এবং রাজনৈতিক বন্দীর গুণগত পরিবর্তন স্বাভাবিক। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে কাল প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির মৃত্যু ঘটতে পারে কি না; এখানে মনে রাখা দরকার কাব্যসাহিত্য কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সাহিত্য নির্মিতি নয়। কোন আশু ফল প্রাপ্তির আশায় শ্লোগান সৃষ্টি করা বা প্রচার কাজ চালানোর চেষ্টা আলোচ্য গ্রন্থগুলির লেখকগণ করেননি। যে বিশেষ কারণে তাঁরা জেলে গিয়েছিলেন তার পিছনে রয়েছে পরাধীন জাতির মুক্তির স্বপ্ন। যে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধকে তাঁরা তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং কারাবরণ করেছেন এক এবং একাধিকবার। কারা নির্যাতন তাঁদের অন্তর্গূঢ় সাহিত্য ও শিল্পচেতনাকে অনেকক্ষেত্রেই বিপ্লবী রোমান্টিকতায় পরিণত করেছে। অর্থাৎ আত্মত্যাগ এবং আত্মপীড়নের মধ্যে দিয়ে তাঁরা এক ধরনের আত্মশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধির স্তরে এসে পৌঁছেছেন এবং সেই সাত্ত্বিক স্তর থেকে তাঁরা জাতির আত্মা, তার সামাজিক মেরুদণ্ড ও কান্নাকে মুক্তায় পরিণত করেছেন। গ্রন্থগুলি একদিকে যেমন ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যবদ্ধ অপর দিকে শুদ্ধমনের প্রতিফলনে সৃষ্টি হয়েছে এব সাহিত্যিক মূল্য। সমাজের নিচুতলার মানুষ যেমন কারাজগতের জীবন্ত অংশ তেমনি তাদের অপরাধকার্যের সুযোগ নিয়ে জন্ম নিয়েছে দুর্নীতি-পরায়ণ ও অত্যাচারী আমলাসমাজ; যারা জেল প্রশাসনের স্থায়ী অঙ্গ। প্রতিটি গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে এমন কিছু আদর্শবাদী ব্যক্তির আত্মকাহিনী যাঁরা প্রবল ইংরাজ শাসনের সময়ে তৎকালীন বাংলাদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম লাভ করে নানান সংগ্রাম ও ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছেন। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে সব মানুষ সেদিন চরিত্র ও কর্মগুণে প্রোজ্জ্বল হয়ে ইতিহাসকে অলংকৃত করেছেন এমন বহু জন এই সব গ্রন্থের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আসন গ্রহণ করেছেন। তাঁদের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপের সহজ পরিচয় পাওয়া যাবে গ্রন্থগুলির মধ্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র দে'র

'নিঃসঙ্গ' গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন—"সে হিসাবে বইখানি ইতিহাসগন্ধী। এই আত্মকাহিনী সত্য বলেই এবং এই আত্মকাহিনীর সঙ্গে একের অতিরিক্ত বহুর যোগ আছে বলেই, একটি বিশেষ কালের বৃহৎ ও প্রবল প্রাণাবেগের সঙ্গে সে কাহিনী যুক্ত বলেই এতে ইতিহাসের অস্পষ্ট আভাস এসেছে। সেই কারণেই, এ কাহিনী একের কাহিনী হয়েও বহুর কাহিনী হয়ে উঠেছে।"

এই উক্তি আমাদের আলোচিত অধিকাংশ গ্রন্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। একটি যুগের ক্রমবিকাশে ও পরিণতির মূল্য নির্ধারণে সাহিত্য মূল্যের অতিরিক্ত ডকুমেণ্টারি ভ্যালু বা ঐতিহাসিক তথ্যের মূল্য নিরুপণেও গ্রন্থগুলি সমর্থ। এখানকার লেখকসম্প্রদায় যে জটিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে দিয়ে বিকাশলাভ করেছিলেন আজ তা ইতিহাসে পরিণত হলেও তাঁদের সত্তা ও সচেতনতার ইতিহাস চিরন্তন। দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তখন আমি জেলে' থেকে আমরা জেনেছি তাঁরা কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে কারাবরণ করেছেন—

"প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে ফাঁসির দড়ির ঝুঁকি নিয়ে যখন বিপ্লবীদলে যোগদান করেছিলাম, তখন থেকেই দুঃখ দিয়েছি অনেককে। আত্মীয়, বন্ধু, পড়শি, শুভানুধ্যায়ী এবং সবার উপর বাবা ও মাকে। সে দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই, বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথ তাঁদের অশ্রুজলে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে, তাঁদের মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছে বৈশাখী ঝড়, তাঁদের বুক ভাঙ্গা ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে বজ্রনির্ঘোষ।"...

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মূল্যায়ন করে বলেছেন—

"তোমরা মহাশক্তির দামাল ছেলে, তোমরা ত সহজে শান্ত হয়ে শক্তি সাধনায় বসবে না, তাই তোমাদের হাতকড়া বেড়ি দিয়ে বেঁধে কারাগারে অন্তরীণে আটকে রেখে এই 'নিঃসঙ্গের' তপস্যা করিয়ে নিয়েছে যুগদেবতা।

মানুষের গভীরের দেবসত্তা জাগে না যতক্ষণ ক্ষুৎপিপাসা বাসনায় অশান্ত মানুষ শান্ত হয়ে নির্জনে বসে নিজের গভীরের কূটস্থ মানুষটির সঙ্গে মুখোমুখি হয় অন্তরঙ্গ পরিচয়ে। সেই শ্মশানের শবসাধনা তোমাদের মত সহস্রটি প্রাণ দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল সেই অগ্নিযুগের দেশলক্ষ্মী।"

শুধু অন্তরঙ্গ তপস্যা নয়; তপস্যার প্রসাদ ও পরিণতিও আলোচ্য কারাসাহিত্য। স্বাধীনতা অর্জন করাই যে পুরুষার্থ; সেই বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে কারাবরণ তারই গৌরবময় ছবি পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থগুলিতে।

উল্লেখযোগ্য যে বাংলা কারাসাহিত্যের অন্যতম অনিবার্য প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাস নাটক ও চিঠিপত্রে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের নিন্দা থাকায় অনেকেই মনে করেন তিনি বিপ্লবীদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান এক প্রবল সঞ্জীবশক্তির মতো বিপ্লবীদের প্রেরণা দান করেছে। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থগুলিতে অসংখ্য রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন এবং বার বার স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে এবং কারাবাসের দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি ছিল রণসঙ্গীতের তুল্য। একথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ ১৩৯) উল্লেখ করেছেন।

এ প্রেরণার অন্যতম কারণ তাঁর সাহিত্যে আদর্শগত বিতর্ক, মতভেদ বা বিরোধাভাস প্রতিফলিত হলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সর্বদাই বিপ্লবীদের পাশে ছিলেন। স্বদেশবাসীর উপর কৃত অত্যাচারে, মনুষ্যত্বের অবমাননায় বারবার গভীর বেদনা বোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর তারই সঙ্গে মানবতার সার্বিক মুক্তির ডাক দিয়েছেন তিনি। এই দুয়ের প্রতিফলন আমরা কারাগ্রন্থগুলিতেও পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ কারাব্যবস্থা ও কারানির্যাতন সম্পর্কিত আলোচনায় ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের কতোখানি বিরোধী ছিলেন তার বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে দিলীপ মজুমদারের 'বন্দীহত্যা, বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন—"আজকালকার বিধিবিশারদদের মত অনুসারে যে সব দেশবাসীকে বিনা বিচারে শাস্তি দেওয়া হইতেছে, তাহারা কোন অপরাধে অপরাধী ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। আইনের পথ সংক্ষেপ করা হইল—আহারের জন্য মাংস ঝলসাইবার প্রয়োজনে সারা বাড়িতে আগুন লাগাইবার মতো—ইহা যথেচ্ছাচারের আদিমরূপ।[২]"

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে বন্দী নির্যাতন, দৈহিক ও মানসিক পীড়ন এবং কারাগার জীবন সম্পর্কে জানতে গেলে বর্তমান গ্রন্থগুলিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দলিল। কারাগারের বাইরের জীবনের সঙ্গে কারান্তরালের জীবনের কতখানি তফাৎ তা ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্রে পাওয়া যাবে না, তা জানতে হলে আমাদের ফিরে আসতে হবে আকর কারাগ্রন্থগুলির মধ্যে—যেখানে দেখা যাবে কিভাবে কারাগারের নির্মম লৌহকপাট নতুন নতুন রাজবন্দীকে নিয়ত গ্রাস করে, মনুষ্যত্বের ন্যূনতম দাবিটুকুকেও ধূলিস্যাৎ করে। ইংরেজ আমলের কারাগারের স্বরূপ জানতে গেলে প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভুক্তভোগীর বিবরণ শোনা প্রয়োজন। সেই বিবরণের মূল উৎস বিপ্লবীদের কারাস্মৃতি। লেখক দিলীপ মজুমদার তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বিপ্লবী

পুলিন দাসের উপর নির্যাতনের যে চিত্র সংকলন করেছেন সেখানে দেখা গেছে সশস্ত্র গুর্খা সিপাই প্রতিনিয়ত রাজবন্দীদের চরমতম অত্যাচারের জালবিস্তার করত। উলঙ্গ করে রাখা, ডাণ্ডাবেড়ী পরানো, তালাবদ্ধ করে রাখা, বিচারাধীন বন্দীদের বেত্রাঘাত করা, (৩০ থেকে ১০০ বার পর্যন্ত), নখে সূচ বিঁধিয়ে রাখা, এবং স্নানাহার ব্যতীত দিনরাত নির্জন কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা এগুলি ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। কোন কোন দিন আহারের সঙ্গে পরিবেশিত হত বন্য কচুর ডগা, পাতা, মূল, দূর্বাঘাস ও অখাদ্য লতাপাতা। এ সম্পর্কে ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ পাকড়াশী, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন ভৌমিক, অনন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ বিপ্লবী কারাস্মৃতিগুলিতে যে অমানবিক নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যায় তা ব্রিটিশ শাসকের নগ্নমূর্তিকেই তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ নির্মমতা সম্পর্কে বলেছেন—

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

কবির বেদনামথিত এই অনুভবের প্রামাণ্য দলিল কারাসাহিত্যের অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্রগুলি।

আর্ট যখন জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, মানুষের সুখ-দুঃখ হাসিকান্না আলো-অন্ধকারের শিল্পিত ভাষ্য, তখন অবশ্যই কারাকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলি সাহিত্যের এলাকাতেই পড়ে। এখানে একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চিত্র প্রতিফলিত অন্যদিকে সেই অভিজ্ঞতা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। উপেন্দ্রনাথ 'নির্বাসিতের আত্মকথা' গ্রন্থে লিখেছেন—'প্রাচীরের উপর দিয়া খানিকটা আকাশ ও একটা অশ্বত্থ গাছের মাথা দেখিতে পাওয়া যাইত। জেলখানার কবিত্ব কেবল এইটুকু লইয়াই, বাকি সবটাই একেবারে নিরেট গদ্য। আর সবচেয়ে কটমটে গদ্য আহারের ব্যবস্থাটা।' লেখক অবশ্যই জেলখানা সম্পর্কে কবিত্ব করেননি, কিন্তু বন্দীমনের উপর আকাশ ও অশ্বত্থ গাছ মুক্তির যে দ্যোতনা সৃষ্টি করে, তাকে কবিতা ছাড়া কী বলা যায়?

'বিপ্লবের পদচিহ্ন' গ্রন্থে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত যে নির্যাতনের কথা তুলে ধরেছেন তা কেবল বিবরণ নয়, বিবরণের অতিরিক্ত এক শিল্পবস্তু যা উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের পৌঁছুতে হয় শাসনতন্ত্রের গোপন হিংসার জগতে যেখানে কেবল বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে। আর তরুণ বিপ্লবী, স্বদেশ প্রেমিক যন্ত্রণায় নিষ্ফল মাথা কুটে মরে পাষাণপুরীর মধ্যে—

"আরও কত বন্ধুর মুখে শুনেছি - গ্রামে, জঙ্গলে, সমুদ্রের চরে, সাপে, বিছায় ভরা ঘরে একা একা নির্জন জীবনযাপন করেছেন—গ্রামের লোক একটা সহানুভূতির কথা পর্যন্ত তাঁদের বলতে পারে না, অসুখে-বিসুখে একবার কাছে পর্যন্ত আসতে পারবে না। অশিক্ষিত কনস্টেবলরা আঠারো-বিশ বছরের ছেলেদের অসৎ জীবনযাপন করতে প্ররোচিত করছে—তাদের ইচ্ছায় সায় বা সাড়া না দিলে সত্য মিথ্যা রিপোর্টে, আরও নানাভাবে জীবন দুর্বহ করে তুলছে। এর উপর আছে দু-চারদিনব্যাপী আই বি অফিসারদের বহুরূপী মোলাকাত—প্রলোভন শাসানি, ধমকানি, পরিবার-পরিজনকে নিঃস্ব-নিঃশেষ করে দেবার হুমকি···আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা। ফলে কতজনের আত্মহত্যার খবর তখন কানে আসছে—বন্ধু সুরেন কর আগেই মারা গেছেন, শচীন দাশগুপ্তের করুণ কাহিনী তখনই শুনলাম। বসে বসে ভাবি সহ্য করি কেন?"

তাই আলোচ্য কারাগ্রন্থগুলিতে এক বিশেষ ধরনের 'লিটারারি টোন' তৈরি হয়েছে। বেদনাসিক্ত স্মৃতি এমন এক শ্রেণীর লেখক সম্প্রদায়কে ঘিরে আলোড়িত যাঁরা আত্মত্যাগে, আত্মনিগ্রহে কেবল মহান নন, মৃত্যু নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। এঁরা সকলেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৌলিনাথ। দেশকে তাঁরা মনে প্রাণে 'মা' বলে জানতেন। আত্মসুদ্ধির তলদেশ থেকে এঁরা কারাজীবনী লিখেছেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, স্বচ্ছলতা-জীবনের এই জরুরী দিকগুলি তাঁদের কাছে মূল্যহীন। এজন্য যে কোনো দেশে এবং কালে বিপ্লব আন্দোলনে এবং বিপ্লবী প্রেরণার ক্ষেত্রে গ্রন্থগুলি স্থায়ী উপাদান হিসেবে ভাস্বর হয়ে থাকবে। পৃথিবীতে যতদিন কারাগার এবং দণ্ডব্যবস্থা বর্তমান থাকবে ততদিনই কারাগারের অসামাজিক মানুষগুলিকে কেন্দ্র করে তাদের নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, ইন্দ্রিয় পীড়ন এবং বিভীষিকাময় মানসিক অবস্থা সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠবে ; বর্তমান লেখকেরা সেই উপাদানকে কেবল গ্রহণ করেননি, আত্মসাৎ করেছেন। পৈশাচিক পীড়ন ও অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তারা সৃষ্টি করেছেন রক্তকাব্য। যে কাব্যের ভাষা অবশ্যই নিরেট গদ্যের। গদ্য ভাষার কাঠিন্যমুক্তি ঘটলে দেখা

যাবে এমন কিছু ইস্পাত কঠিন নির্ভীক প্রত্যয় যা মৃত্যুহীন,—"বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥"

৩

কারাসাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্যায়নে আমরা যে কালানুক্রমিক বিভাগ করেছি সেখানে প্রতিটি বিভাগে প্রতিনিধিত্বকারী কিছু গ্রন্থের আলোচনা করা হয়েছে। বাহুল্যবোধে অন্য গ্রন্থগুলিকে আলোচনার বহির্ভূত রাখা হয়েছে। গ্রন্থনির্বাচনে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সাহিত্যগত অভিনবত্ব এবং বাক্‌রীতির উপর নজর দেওয়া হয়েছে। আলোচনার বাইরে যে গ্রন্থগুলি অবশিষ্ট রইল সেগুলি গুরুত্বহীন বা লঘু নয়, নির্বাচিত গ্রন্থগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীন।

ক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ

'সচিত্র গুলজার নগর' নক্‌শাধর্মী রচনা।[১৩] এ জাতীয় রচনার প্রবর্তক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবু কলকাতার সমাজচিত্র এই গ্রন্থের মূল স্বর। বর্তমান নক্‌শার নায়ক হেমাঙ্গ নিরাশ্রয় হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে এক বিত্তবান বাবু নীরদচন্দ্রের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করে। শেষে নীরদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গোপন প্রেম এবং চৌর্যবৃত্তির মিথ্যা অপরাধে হেমাঙ্গের কারাবাস ঘটে। কারামুক্তির পর নীরদবাবু সমস্ত ঘটনা বুঝতে পারেন এবং হেমাঙ্গ আবার নীরদবাবুর স্নেহধন্য হয়ে ওঠে। দেখা যায় গ্রন্থের কাহিনী বিন্যাস কাল্পনিক এবং অরাজনৈতিক। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কারাব্যবস্থা, দেশী ও গোরা কয়েদীর অবস্থা এবং কয়েদখানা থেকে এক কয়েদীর পলায়ন চিত্রিত হয়েছে। রচনাটি স্কেচধর্মী হওয়ায় দেশীয় এবং ইংরেজ কয়েদীর সামগ্রিক অবস্থার কথা লেখক কেদারনাথ উল্লেখ করেছেন মাত্র। বিশেষ কোনো চরিত্রের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা চিত্রিত করেননি।

কারাগারে হেমাঙ্গ যেখানে রয়েছে সেখান থেকে সামান্য দূরে এক উন্মত্ত সেলারের চিত্র সংক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন—

"একজন জেলার উন্মত্তের মতন বিকট মূর্তিতে—পাতর হাতে কোরে বসিয়া আছে। চাপরাসী ও শান্ত্রির দল, মায় খোদ কর্তা পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়ে আর মিষ্ট কথায় লোভ দেখিয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করচে, কয়েদীর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে এক একবার ঝোঁকে ২ ওঠাতে শান্ত্রিঠাকুর, মায় খোদ হুজুর, ছুটে

পালাচ্চেন, সে ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌লে তাঁরা আবার সুড়সুড় কোরে তাঁর কাচে এগুচ্চেন।”[১৪]

সম্ভবতঃ কয়েদী উন্মাদ কিম্বা স্বাধীন। তার সাহসিকতার পরিচয়ে মনে হতে পারে চরিত্রচিত্রণে অতিনাটকীয়তা বা অবাস্তবতার মিশ্রণ ঘটেছে। আসলে ঐ উন্মত্ত সেলার একজন গোরা কয়েদী—

“প্রহরীরা তাকে আঁটতে না পেরে খোদ সাহেবকে খবর দেয়, খোদ সাহেব চোরের অধমভাবে হাজির হয়ে ইংরেজ বাচ্চাকে থামাবার চেষ্টা করেন। পরে অনেক কার্‌খানায় স্বাধীন গোরাকে এই করারে থামান হয় যে, ভবিষ্যতে তার প্রতি আর কেউ জুলুম্‌ করবে না। তখন বাঙ্গালীরা লঘুদোষে কাজী হাউসে যেত, গুলজার নগরের এই অপূর্ব্ব বিচার।”[১]

সূচনায় জেলজগৎ সম্পর্কে লেখকের ঘৃণা ও প্রতিবাদের ভাষা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তাঁর কাছে জেল রাজধানীর কলঙ্ক। জেলযন্ত্রণা জীবন্ত নরকভোগ, জেলে জাতিরক্ষা দুরূহ। ‘পবাধানত্ব যে কি ভয়ংকর তাব চমৎকার উপমা’ জেল। এ জাতীয় তীব্র ও সূর্তাক্ষ ভাষা ব্যবহার লেখকের সমাজ সচেতনতা এবং মানবিকতার পরিচায়ক। জেলের বিষাক্ত পরিবেশ বর্ণনার উদ্দেশ্য নায়ক হেমাঙ্গের শারীরিক ও মানসিক উৎপীডনের প্রাক্‌-প্রস্তুতি সৃষ্টি করা। হেমাঙ্গ বাঙালী কয়েদী, তার জেলযন্ত্রণা এবং দুর্দশার এই হল অন্যতম কারণ—“জেল গোবাদের মামারবাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, শ্রীঘর, বাঙ্গালীর পক্ষে তা সেই হরিংবাড়ী (হয়রাণ রাডা) নেড়ীমারা পেয়াদারও বাঙ্গালীর ওপর যত জবরদস্তি।”[১৬] বাঙালী কয়েদীর ওপর জবরদস্তির যে চিত্রের সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন কেদারনাথ দত্ত, পরবর্তীকালে সেই চিত্রই আরো ব্যাপক অত্যাচারের আকার নিয়ে ভারতের কয়েদখানাগুলিকে নরককুণ্ড করে তুলেছে। লেখকের বিশেষ গুণ এই যে, সংক্ষিপ্ত একটি পারচ্ছেদে ব্রিটিশ কারায় মনুষ্যত্বের অবমাননার যথাযথ চিত্রটি তুলে ধরেছেন। এইখানেই গ্রন্থটির মূল্য ও মর্যাদা।

‘আমাদের হাজত’[১৭] ‘জন্মভূমি’ মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম এবং ভূমিকা থেকে বোঝা যায় লেখক ১৮৯০—৯১ সালের বাংলার একটি জেলখানার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক কারণে কারাপ্রবেশ করলেও বর্তমান কাহিনীতে লেখক কোনো রাজনৈতিক বা রাজদ্রোহমূলক প্রসঙ্গ আনেননি। বরং পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন—“এমনও কেহ যেন মনে না করেন, আমি রাজনীতিক আসামী, স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণ

বলি দিতেছি, অতএব কারাবাসেই আমার আনন্দ, মৃত্যুতেই আমার সুখ। বলা বাহুল্য, আমি স্বদেশ-হিতৈষী জাতীয় নহি।"[১৮]

এজন্য গ্রন্থটির রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই, ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের হরিণবাড়ি জেলের একটি নিখুঁত চিত্র এখানে উপজীব্য। লেখক কারাবাসের সূচনা অংশ বর্ণনা করেছেন। ফলে পূর্ণাঙ্গ কারাকাহিনী সৃষ্টির সুযোগ এখানে নেই। অবশ্য একটি বিশিষ্ট কয়েদী নীলমণি অধিকারী এগারো বছরের কারাদণ্ডভোগের পর যে অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছেছে তার এক মর্মান্তিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। দণ্ডব্যবস্থা নীলমণি অধিকারীর মনুষ্যত্বের শেষ নির্যাসটুকুকেও নিঃশেষ করেছে। নীলমণি হয়ে উঠেছে লৌহকঠিন, কঠোর যন্ত্র বিশেষ। মানবিক অনুভবের কিছুই আর তার অবশিষ্ট নেই। লেখকের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হরিণবাড়ির শুকনো ঘাসের উপর হাঁটতে হাঁটতে—

"যমদূত অমনি পূর্ব্বের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল—এটা শ্বশুরবাড়ী নয়, এটা যোমালয়।"[১৯]

নীলমণির রূঢ় অমার্জিত স্থূল আচরণের কারণ জেলের নির্মম অমানবিক পরিবেশ। তার ভদ্রতা এবং শালীনতা অসামাজিক এবং বিকৃত চোর ডাকাত খুনীর সহবাসে বিপর্যস্ত—

"তাহাদিগকে লইয়াই আমাকে দিনরাত্রি ঘরকন্না করিতে হয়। আমার হৃদয় পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন হইয়া গিয়াছে। লোকের কষ্ট দেখিলে আমার আর কষ্ট বোধ হয় না। লোকের দুঃখ দেখিলে এখন আমার আনন্দ হয়। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ এই আমার পৈতা দেখুন। আমার নাম—শ্রীনীলমণি অধিকারী।"[২০]

নীলমণি কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়। হরিণবাড়ির সে একটি বিশিষ্ট সংখ্যা। যে সংখ্যায় কোনো জাতি, মনুষ্যত্ব বা মানবিক মূল্যবোধের স্থান নেই।

গ্রন্থটিতে কারাজগতের যেসব ছবি চিত্রিত তা অবর্ণনীয়, মনুষ্যত্ব-বর্জিত। লেখকের ত্রুটি হলো তিনি সাধারণ পুরুষ ও নারী কয়েদীর কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি (এর ব্যতিক্রম নীলমণি)। বিষয় নির্বাচন বস্তুধর্মী। বন্দীমনের কোনো একান্ত অনুভব বা কান্না অনুপস্থিত। বর্ণনায় সরস ব্যঙ্গ ও রসিকতা থাকলেও বিষয় নির্বাচনে, উপস্থাপনায় এবং চরিত্রচিত্রণে যেভাবে একটি গ্রন্থ সাহিত্যধর্মী হয়ে ওঠে তার অভাব এখানে লক্ষণীয়। তবে একথা সত্য লেখক অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে কারাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক—যেমন কয়েদঘর, আহার, পুতিগন্ধময়

শয্যা ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। রচনাটির শেষে কয়েদীদের অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। তালিকাটিতে পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজশক্তির অমানবিক কারাব্যবস্থার বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ আছে। উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীর সঙ্গে কয়েদীরা কি জাতীয় আচরণ করবে, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদের কেমনভাবে চলতে হবে, কয়েদীদের স্বাধীনতার পরিসর, খাদ্যব্যবস্থা, দণ্ডব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এমন তথ্যবহুল বর্ণনা অন্য রচনায় দুর্লভ।

খ. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯০৫—১৯২২)

সুরথকুমার বসুর 'স্বদেশীর কারাবাস' [১১] গ্রন্থের নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বদেশে এক স্বদেশীর কারাবাসের অভিজ্ঞতা গ্রন্থের বিষয়বস্তু। কারাজগতের প্রতিক্রিয়া লেখক মনে কী ধরনের যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছিলো তা গ্রন্থের বিষয়বস্তু নয় অথবা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দীমনের বেদনাতাড়িত পরিস্থিতি গ্রন্থের সাহিত্যিক প্রবণতাও নয়; বরং বলা যায় কারাজগতের অভিঘাত লেখককে কীভাবে কারাগারের খুঁটিনাটি বিষয়কে পর্যবেক্ষণ করতে শিখিয়েছে সে কথাই লেখকের আলোচ্য।

লেখক নিজে একাধারে বন্দী এবং স্বদেশী। কিন্তু স্মৃতিকথায় লেখকমন কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। যে ভূমিকা আত্মস্মৃতিমূলক কাহিনীতে অধিকাংশ স্মৃতিকথাকেই অন্যতম চরিত্র করে তোলে। লেখক এখানে কোনো বিশিষ্ট চরিত্র নয়—তিনি কখনো নিরপেক্ষ কথক, কখনো পর্যবেক্ষক, কখনো কারাগারের ইতিহাস লেখক। গ্রন্থটি জেলজগতের চিত্র আস্বাদনে পাঠকের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সদা ব্যস্ত রাখে। অর্থাৎ কারাজগত সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল এখানে উৎকর্ণ। ছোট বড়ো অনুচ্ছেদ ও শিরোনামে বিন্যস্ত গ্রন্থটির বিভিন্ন বিষয় পাঠককে সজাগ করে রাখে। অন্যভাবে বলা যায় এখানে হাজত; মেয়ে জেল, আহার, পোশাক, স্নান, হাজতের রন্ধনশালা ইত্যাদি বিষয়গুলি যেন এক একটি জীবন্ত চরিত্র। লেখক দক্ষতার সঙ্গে কয়েদী সমাজেরই একজন হয়ে জেলখানার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ এবং আচরণীয় নিয়মকে বর্ণনার গুণে সজীব চরিত্র করে তুলেছেন। জেলজগতের বিস্তৃত তথ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে লিখিত হয়েছে। একাজে তিনি প্রতিবেদকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

জেল প্রবেশের বর্ণনাটি অত্যন্ত নিখুঁত, চিত্তাকর্ষক 'একজন ওয়ার্ডার আসামীগণের নাম, কে নিয়াদী, কে হাজতী, মোট কত আমদানী অর্থাৎ, নতুন ভর্ত্তি ইত্যাদি লিখিয়া লইল', এরপর একজন কয়েদী লেখক স্বদেশী মামলায় দণ্ডিত জেনে বললেন—'আপনি কয়েদীগণের সহানুভূতি জানিবেন'। ঠিক এভাবেই তিনি হাজত, মেয়েজেল, স্নান, আহার ও পোষাকের তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ সাংবাদিকের মতো নিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগে অথচ সুতীক্ষ্ণ ভাষায় পরিবেশন করেছেন। সামাজিক মানুষের কাছে জেলজগৎ শুধু অপরিচিতই নয়, ধারণাবিহীন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে অন্যান্য দাগী আসামীর সঙ্গে দেশব্রতী লেখক সংখ্যা হয়ে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনাটি স্মরণীয়—

"ঘরের ভিতরের পাহারাওয়ালার চিৎকার, ঠিক চিৎকার নয়, কতকটা গানের মতো,—পহেলা নম্বর, ৪১ জমা, খবর আচ্ছা, অর্থাৎ এক নম্বর ঘরে অভ্য ৪১ জন কয়েদী আছে, তাহাদিগের খবর ভাল।"[২২]

আরো লক্ষণীয় বিষয় মুসলমান এবং হিন্দু কয়েদীদের নমাজ এবং গায়ত্রীপাঠ জেলে নিষিদ্ধ ছিলো। প্রত্যেক কয়েদীকেই কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। কাজ অনুযায়ী তাদের বিশেষ বিশেষ নামকরণ হতো, যেমন—কয়েদী পাহারাওয়ালা, কয়েদী পাচক, কয়েদী কুলি, কয়েদী মেথর, কয়েদী বাগানের মালি ইত্যাদি। লেখক মন্তব্য করেছেন সমস্ত কাজই যখন কয়েদীর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয় তখন 'জেলখানাকে কয়েদীর মুল্লুক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' এই তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি কারাগার কোনো মানসিক শোধনাগার নয়—একটি আবদ্ধ নির্যাতন জগৎ। গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে লেখক দুটি কৌতূহলপ্রদ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন—(১) সাধারণ কয়েদীরা নানাভাবে অর্থ উপার্জন করে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখে, এমনকি বিভিন্ন কয়েদীর ব্যবহার্য আসবাব এবং জিনিসপত্তর আশ্চর্যজনকভাবে চুরি হয়ে যায়। এরকম একজন হতভাগ্য কয়েদীর নাম উল্লেখ করেছেন লেখক—কারেন্সি অফিসে চাকুরিরত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কর্তৃপক্ষ যদি এজাতীয় চৌর্যবৃত্তির নালিশ পান তবে তাঁরা অভিযোগকারী কয়েদীকে অসাবধনতার অপরাধে বিশেষভাবে সাজা দেন। (২) এক আশ্চর্যজনক কয়েদীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন লেখক যার হাতে ছিল মোটা তারের বালার মতো একটি অলংকার। তারের মধ্যে কতকগুলি ছোট রিং পরানো। এই অদ্ভুত অলংকারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে লেখক জেনেছিলেন—দ্বিতীয়বার চুরি করে জেলে এলে হাতে বালা পরানো হয়। তৃতীয়বার এলে

বালার উপর রিং পরানো হয়। জেল আগমনের সংখ্যা অনুসারে রিং-এর সংখ্যা বর্ধিত হয়। এরকম নানা তথ্যে সমৃদ্ধ গ্রন্থ কারাসাহিত্যে খুব বেশি নেই। লেখক সাধারণ কয়েদী, উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা আলোচনা না করলেও জেল জগতের প্রাত্যহিক নিয়ম এবং সামগ্রিক রীতিনীতির বর্ণনায় মৌল পর্যবেক্ষণ শক্তির দাবি রাখেন।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নির্বাসন কাহিনী'তে[২৩] বর্ধমান জেলের চিত্র আছে। লেখক সরকারবিরোধী কার্যে দণ্ডিত হলেও কেমন করে জেলখানার প্রমোদ উদ্যানে রাজসম্মান পেলেন তার কোনো কারণ বিশ্লেষণ করেননি। সম্ভবত তিনি গোরা কয়েদীর সমান মর্যাদা পেয়েছেন। জেলজগৎ তার কাছে অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র বিশেষ। জেলের মনোরম পরিবেশে একটি গান ও একটি কবিতা লিখেছিলেন। সম্ভবত নির্যাতনবিমুক্ত কারাগৃহটি স্বাস্থ্যনিবাসের মতো লেখককে কবিতা ও গান রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে। এ জাতীয় কারাচিত্র আমাদের প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

বাংলার অগ্নিযুগের দীক্ষিত ঋত্বিক এবং বিপ্লবযজ্ঞের অতন্দ্রপ্রহরী বারীন্দ্র-কুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের কথা'[২৪] কারাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক সংযোজন। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে এদেশের শতসহস্র তরুণ স্বদেশের জন্য যেভাবে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন বারীন্দ্রকুমার তাঁদের অন্যতম শিক্ষাগুরু। বাঙালী জাতির নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্রস্বভাব যাঁদের আত্মদানে যোদ্ধার চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে বারীন্দ্রকুমার তাঁদেরই একজন। বাঙালীকে মৃত্যুপণ যোদ্ধার স্বভাবে পরিণত করার জন্য বারীন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীগণের যে কতটা কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে 'দ্বীপান্তরের কথা'য় তার বিস্তৃত পরিচয় আছে। লেখক অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে আন্দামানে নির্বাসিত হয়ে 'খোয়েদাদী আমলে' কীভাবে দিন যাপন করেছেন তারই আন্তরিক ছবি এই 'দ্বীপান্তরের কথা'। কয়েদীজীবনের ইতিবৃত্ত উপন্যাসের চেয়েও মনোরম হয়েছে লেখকের অনবদ্য কবিত্বপূর্ণ ভাষার প্রসাদগুণ ও মিতাচারে। আন্দামানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে আরম্ভ করে কয়েদীদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের ইতিহাস এমন উপভোগ্য ভাষায় বর্ণিত যে গ্রন্থখানি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যের মতো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়।

ইংরেজ কয়েদখানার আতিথ্য ভোগ করা যাদের ভাগ্যলিপি সেইসব লাঞ্ছিত বীর সৈনিক যে কেমন করে আত্মহননের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিম্বা কেমন করে আত্মতেজে বলীয়ান হয়ে ওঠে তার কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত দিয়েছেন লেখক।

বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সেলুলার জেলের রূপরেখা অঙ্কন নয়। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার এবং তাঁর সহযোগীগণ কেমন করে এক রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে প্রবেশ করে আন্দামানে নির্বাসিত হন এবং তাঁরা নির্বাসন-দণ্ড কালে কীভাবে সেলুলার জেলকে বিপ্লবের সংমার্চে পরিণত করেন তারই আগ্নেয় পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখকের দূরদর্শিতা, ইন্দ্রিয়ের সর্বত্রগামিতা, বর্ণনার পারদর্শিতা এবং রূপদক্ষতা ক্ষুদ্র গ্রন্থটিকে একটি অনবদ্য কারাসাহিত্যে রূপান্তরিত করেছে।

গ্রন্থে কয়েকটি উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীর পরিচয় আছে। চরিত্রচিত্রণের সুযোগ এখানে নেই। কোনো কাহিনীতে একটি চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে কাহিনীর গতিবেগ যেভাবে চরিত্রটিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায় আবার চরিত্রটি যেভাবে কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে বর্তমান কাহিনী সেভাবে সজ্জিত নয়। কাহিনী বয়নের লক্ষ্য চরিত্রগুলি নয়। কাহিনীর কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বীপান্তরের জগতের নানা কথা। সুতরাং কাহিনীর ঘন-সংবদ্ধ প্যাটার্ন তৈরি হয়নি। নানা কাহিনীর কথামালা একটি ধারাবাহিক কাহিনীর পরিপূরক হলে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তার প্রতিফলন গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বারীন্দ্রকুমার অভিজ্ঞতার চিত্রায়ণকালে প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ হিসাবে উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীর পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ কর্মচারী এবং রাজবন্দীর প্রসঙ্গ যখন আসে সেখানেও কোনো বিশেষ কাহিনী-স্রোতের পরিপূরক পরিচ্ছেদ তারা হয়ে ওঠেনি। তবে বারীন্দ্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি এবং অঙ্কন প্রতিভা প্রতিটি চরিত্রকেই গল্প উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞাতব্য করে তুলেছে হিলসাহেব, এমার্সনসাহেব, ব্যারীসাহেব, জেল সুপারিন্টেডেণ্ট কাপ্তেন মারে, মুন্সী গোলাম রসুল, খাঁসাহেব (খোয়েদাদ) এমন কিছু জেল কর্মচারীর পরিচয় ঘটনাসূত্রে এসেছে। হিলসাহেব অত্যাচারী ও দুর্দান্ত হলেও লেখককে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সাহেবরা অনেকেই ভারতীয় দর্শনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ওয়ার্ডার উইলস্ স্বর্গীয় পরম পিতার প্রেম এবং পাপীর অনুতাপের কথা বাইবেলায় লিখিয়ে স্বর্গীয় মহিমার আস্তরণে অগ্নিযুগের দ্বীপান্তরিত তরুণদের প্রায়ই বোঝাতেন।

সেলুলার জেলে নররূপী দৈত্যের নাম ব্যারীসাহেব। তাঁর সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার জানিয়েছেন ছাগল যেমন বাঘকে দেখে ভয় পায়, সেরকম কালাপানির কয়েদীরা ব্যারীসাহেবকে ভয় পেত। ব্যারীসাহেব ঠিক ব্যুরোক্র্যাট নন; সেনাবাহিনীর কর্ণেলের মতো তাঁর স্বভাবে রুক্ষতা—কঠোরতার

সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতাব আশ্চয মিল ছিল। বারীন্দ্রের দক্ষতা হচ্ছে তিনি অল্প কথায় এই সাহেবটিকে ফটোগ্রাফির মতো তুলে ধরেছেন।

বঙ্গোপসাগবের পরিত্যক্ত দ্বীপ একদিকে যেমন বর্বর জাররাওয়ালা জাতির বাস তেমনই সেলুলারেব সুসভা শোধনাগাবে মালিক এই ব্যাবীসাহেব—

"ব্যারীসাহেব মোটা মানুষ, পেটটি তাঁহাব Ghee-fed মাড়োযারির ভুঁড়িকে লজ্জা দেয, নাক বোঁচা ও রাঙ্গা, চক্ষু গোল গোল, খোঁচা খোঁচা গোঁফে কতকটা রক্তলোলুপ বাঘেব ভাব আছে।"[২৫] সাহেব তাব কঠোরতার পরিচয় দিযেছিলেন এইভাবে—

"তোমাব যদি অবাধ্য হও তাহলে ভগবান তোমাদেব সহায হউন, আমি তো হবো না সেটা এক রকম স্থির, আব এই পোর্টব্লেযাবেব তিন মাইলেব মধ্যে ভগবান আসেন না সেটা মনে রেখো।"[২৬]

বারীন্দ্রের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সুতীক্ষ্ণ, তিনি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখলে বিংশ শতাব্দীব প্রথম দশকেই প্রথম শ্রেণীব ঔপন্যাসিকেব সুনাম অর্জন করতেন। তিনি যেভাবে জেল কর্মচারী চবিত্রগুলিকে লক্ষ করেছিলেন সঞ্চিত স্মৃতি হুবহু তাকেই অঙ্কিত করেছে। ক্যাপ্টান মারের চেহারা সম্পর্কে তার প্রতিবেদন—

"মানুষটি গোঁপ দাড়া কামান, বেঁটে, নীলচক্ষু, মনে হইল বড চতুর।"[২৭]

মারে ছিলেন ব্যাবীসাহেবেব বিপরীত। 'গুটিকযেক প্যাট্রিযটের সঙ্গে তিনি স্বজনহীন জীবনে বন্ধুত্বের উষ্ণতা অনুভব করতেন।

ব্যারীসাহেবের দ্বিতীয উদাহরণ এক পাঠান পেটি অফিসার, খোযেদাদ খাঁ। পাঠান স্বভাবের অমানবিকতা এবং কদর্য নগ্নতা বারীন্দ্রকে আহত করেছে। লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায খোযেদাদেব বর্ণনাটিও চিত্রশিল্পীব মতো তুলে ধরেছেন—

"চেহারাটি বড হৃদ্‌রোগজনক,—বেঁটে, লোমশ, ঘাড়ে-গর্দানে, কালো চাপ দাড়ী, বড বড বাঁকা দাঁত, ভ্রূ জোড়া, উচ্চ নাশা, মেজাজ তিরিখ্‌খি, হাতে লগুড়।"[২৮] খোয়েদাদ সম্পর্কে লেখকেব মন্তব্য—'ব্যারী তবু তা পদে আছে, সে মুষ্টিযোগের উপর আবার খোয়েদাদী বজ্রযোগ' অবশ্য এই নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার পিছনে একটি গ্রহণীয় যুক্তি আছে। লেখক নিজেই স্বীকাব করেছেন যে, আন্দামানে ভারতবর্ষের দুর্দান্ত খুনী লম্পটদের রাখা হয়। সুতরাং বর্তমান কারাপদ্ধতি চালু রাখতে হলে ব্যারীসাহেবের মতো কঠোর ও সুদক্ষ প্রশাসকের অবশ্যই প্রয়োজন। এখানেও আবার সাদা কালো চামড়ার ইতর বিশেষ ছিল। পাঠান খোয়েদাদ ব্যাবীসাহেবকে যমের মতো ভয় করতো,

এমনকি মনে মনে 'বিসমিল্লা' নাম জপ করতো। ব্যারীসাহেবের বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের কাছে খোয়েদাদ হীনমন্য আত্মপরবশ, যে কয়েদীদের প্রাপ্ত দুধ আমতা আমতা করে কনভালসেন্ট কয়েদীদের অনুরোধে পান করে ফেলে। দুধটুকু যে ঘুষ তা জেনেও—'উষ্ট্রভোজী কাবুলী দুর্বাসার ক্রোধ শান্তির' যেন শেষ হয় না। সুপারিণ্টেডেনদের সঙ্গে ওয়ার্ডারদের প্রশাসনিক ক্ষমতার রকমফের ছিল। অধস্তন কর্মচারী মুন্সী গোলাম রসুল কীটের মতো মেরুদণ্ডহীন ও কুশ্রী—"এই ভব চিড়িয়াখানায় সে আর একটি অপূর্ব চীজ্। কালো, রোগা, কদাকার, দীর্ঘদন্ত ও সাহেবের শ্রীচরণের আজ্ঞাবহ ছুঁচো বিশেষ। সেই তখন ওয়ার্ডার হইয়া জেল মুন্সীর কাজ করিতেছে। পারতপক্ষে স্নানরূপ কুকার্যটা সে করিত না, তাই গন্ধের জ্বালায় তাহার কাছে দাঁড়ান দুষ্কর হইত।"[২৯]

রসুলের বীভৎসতা এবং হিংস্রতা কয়েদীদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তাদের আশা রসুল বরখাস্ত হলে শেষ দেখা তারা দেখে নেবে। কিন্তু বারীনের মন্তব্য—"ব্যারীসাহেবের প্রিয়তমা চেডীদিগের অন্যতম রসুল বড় ধুর্ত, তাই সে জেল হইতে বাহির হয় নাই। জেলেই ওয়ার্ডার হইতে ক্রমশঃ পেটি অফিসার, টিণ্ডাল ও পরে বর্তমানে জমাদার হইয়া নির্বিবাদে মোড়ল—যাত্রা নির্বাহ করিতেছে।"[৩০]

সেলুলার জেলে ব্যারীসাহেব, খোয়েদাদ, গোলাম রসুলের চরিত্র, শাসন প্রণালী এবং বর্বরতা সম্পর্কে বারীন্দ্রের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও রসিকতা বর্ণনায় সুদক্ষ শিল্পীর মত রং ও রেখার সামঞ্জস্য খুব অল্পই আছে। সেলুলার জেলের পাঁচ নম্বর খোয়েদাদী আমল আসলে এক দেশপ্রেমিক কয়েদীর চোখে জেল প্রশাসনের নির্মম চিত্র তুলে ধরা। অতিরঞ্জন ও স্থূলতা এই দুটি দোষ লেখককে স্পর্শ করেনি। আশ্চর্য লাগে দাগী আসামীদের সঙ্গে থেকেও কেমন করে বারীন্দ্রকুমার শিল্পীর প্রসন্নতা বজায় রাখলেন।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের গুণগত পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যটুকু খোয়েদাদী সম্প্রদায়ের গোচরে ছিলো। অ্যানার্কিস্ট'দের তারা মনে মনে ভয় করতেন। অ্যানার্কিস্টরাও একইভাবে উচ্চপদস্থ জেল অফিসার সম্পর্কে অতিব্যস্ত ও তটস্থ ছিলেন। দু' পক্ষের একই ধরনের ভয় ও উৎকণ্ঠার ভাব গোপন করার জন্য বাহিরের বেপরোয়া ভাবের মধ্যে অন্তরের সম্ভ্রম উঁকি মারতো জেল অফিসারদের আচরণে। একদিকে প্রশাসনিক শৃঙ্খলার উচ্চস্বর আর্তনাদ, অন্যদিকে—'লম্বা চওড়া বক্তৃতা করিতে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ

সম্ভোগ করিতাম'।

জেলখানার একটি বিশিষ্ট রাজবন্দী চরিত্র এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক নন্দগোপাল। তাঁর দেশাত্মবোধ, আত্মমর্যাদা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শক্তি অতুলনীয়। দ্বীপান্তরিত হবার পরেই তিনি ঘানি ঘুরানোর বে-আইনী নিয়মকানুনের প্রতিবাদ সুরু করেন। জেলারকে জানান সকাল দশটা থেকে বারটা পর্যন্ত যখন আহার ও বিশ্রামের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা—তখন ঐ সময় তিনি ঘানি ঘোরাবেন না। তিনিই প্রথম আন্দামানের বর্বরতার মধ্যে গান্ধীজীর অহিংস প্রতিরোধ এবং অবিরাম অসহযোগ পন্থাকে কার্যকর করেছিলেন। পশুর মতো ঘানি ঘুরানো প্রথা চিরকালীন অভ্যাসকে তিনি আঘাত দিলেন। ক্রমাগত তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ বাঁধে। নন্দগোপাল জেলখানার প্রতিটি বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দেন। নন্দগোপালের আত্মবিশ্বাস, একনিষ্ঠতা এবং আত্মনির্যাতনের অনবদ্য চিত্রটি লেখকের লিপিকুশলতায় জীবন্ত ও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থটির একটি বিশেষ গুণ রহস্যকাহিনীর মতো এখানে একদিকে যেমন কাহিনীর বৈচিত্র্য আত্মকথাকে গতিশীল করেছে, তেমনি আন্দামান দ্বীপের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ এবং সেলুলার জেলের বিচিত্র কয়েদী সমাজের পৌনঃপুনিক চিত্র সমগ্র কাহিনীকে মহাকাব্যের গভীরতায় ভাবসমৃদ্ধ করেছে। গ্রন্থের 'নবম পরিচ্ছেদ'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কয়েদীর অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত ও যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণে বারীন্দ্রের সমাজ ও জীবন সচেতনতা লক্ষণীয়। সমাজের পদস্খলিত অপরাধী সম্পর্কে বারীন্দ্রের মমতা ও সহমর্মিতা উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিশ্লেষণের সারমর্মটি নিম্নরূপ :—

আকস্মিক পদস্খলিত (Casual Criminal) অপরাধী পেশাদার অপরাধীর (Habitual Criminal) সংস্পর্শে নির্দোষ অপরাধীদের কলুষিত করে। কারাজীবনের বন্ধন ও শাসন অনেক ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়লিপ্সার অভাবকে উগ্র করে তোলে। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের কাজের একঘেঁয়েমি ও বর্বরতা কয়েদী সমাজের মনুষ্যত্বকে পশুত্বে পরিণত করে। ক্রমাগত ভয় ও দণ্ডতাড়না পরোক্ষভাবে অধঃপতনের কারণ। স্ত্রী-পুত্র সহবাসবর্জিত বাধ্যতামূলক কৌমারব্রত বাসনার অচরিতার্থতাকে সক্রিয় করে তোলে। জেলে চরিত্র গঠন, নৈতিকতা এবং ধর্মজ্ঞানের কোনো অনুশীলন নেই। সীমাহীন সাজা

এবং দণ্ডভোগের জন্য বন্দীমনে নৈরাশ্য, বিফলতা এবং দুরারোগ্য হতাশার সৃষ্টি হয়। উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীর নির্মম ও হৃদয়হীন আচরণ, পশু-প্রকৃতি কয়েদী জীবনকে দুর্বহ করে তোলে। এর উপর আছে পোর্টব্লেয়ারের দূষিত আবহাওয়া, রোগাক্রমণ এবং যৌন ব্যাধির অভিশাপ।

লেখকের বর্ণনা থেকে জানা যায় সাধারণ কয়েদীদের জেলসংস্কৃতির ও খেলাধুলোর কোনো নিয়মকানুন ছিল না। কর্তৃপক্ষ নির্বিবাদে একের পর এক শারীরিক শ্রমের ফতোয়া জারি করতেন। বন্দীজগতে কোনো নির্মল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না। তবে রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকলেও তারা অনুমতি সাপেক্ষে গ্রন্থপাঠের সুযোগ পেতেন।

'দ্বীপান্তরের কথা'য় উচ্চপদস্থকর্মচারী, সাধারণ জেলকর্মচারী, রাজবন্দী, সাধারণ কয়েদী, দণ্ডব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং কয়েদী সমাজের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন প্রণালীর বিস্তৃত খবর উপন্যাস পাঠের মতোই আকর্ষণীয়। কথাসাহিত্যে লেখকের দক্ষতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে শীত ও বর্ষা বসন্তের আকাঙ্ক্ষাকে মানবীয় মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নির্বাসিতের তপ্ত শ্বাসপ্রশ্বাস সুখী সামাজিক মানুষকে পৌঁছে দেবে মনুষ্যসৃষ্ট এমন এক নরককুণ্ডে যে নরককুণ্ডের গল্প আমাদের কাছে অনেকটা সহস্র আরব্য রজনীর মতো মনে হলেও আসলে তা একটি অশ্রুরুদ্ধ কাহিনী, যেখানে অগ্নিযুগের দেশপ্রেমিক কয়েদীরা ক্রমাগত পরিশুদ্ধ হয়েছেন দেশাত্মবোধের দৃঢ়সংকল্পে—

"শুধু একটানা বসন্তে জীবনে মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড নিতান্ত অপুষ্ট থাকিয়া যায়, শক্তির স্ফুরণে মানবকে দেবতা করে যে বজ্রাগ্নি তাহা যে পরম সত্য।" ·

বারীন্দ্রকুমার প্রণীত অপর একটি গ্রন্থ "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী"[৩২]। গ্রন্থটিতে বিপ্লবীজীবনের কথা বিস্তারিত, তুলনায় কারাজগৎ অবহেলিত। এখানে জেলজগৎ উপন্যাসের বিস্তার নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত নয বরং কারান্তবালের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় উদ্দীপনা বেশি। অবশ্য স্বভাবদক্ষ বাক্‌বিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ এখানেও একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্যাটার্ণ সৃষ্টি করেছে। তেরো সংখ্যক পরিচ্ছেদের নাম 'জেলসুখের রকমারি'। সুখপাঠ্য এই অধ্যায়টি যেন আধুনিক রম্যরচনার পূর্বসূরী। প্রহসন, ব্যঙ্গ এবং নানা গল্পাংশের যোগফল এই অধ্যায়টি। বিপ্লবী কানাইলাল এবং সত্যেনের চরিত্রদুটি তিনি নির্লিপ্তভাবে তুলে ধরেছেন রাজবন্দী নন্দগোপালের মতো চিত্রায়ণে। তবে একথা সত্য, 'দ্বীপান্তরের কথা'য় যে হীরকসামান্য

শব্দদ্যুতি গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে সেই লাবণ্য বর্তমান গ্রন্থে অনুপস্থিত। জীবনরস ও সাহিত্য আস্বাদনের অজ্ঞেয় রহস্য বর্তমান গ্রন্থে 'দ্বীপান্তরের কথা'র মতো লক্ষণীয় নয়। তবে আত্মদর্শনের নানা জিজ্ঞাসা এখানে দর্শনশাস্ত্রের মতোই আকর্ষণীয়।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের 'কারাকাহিনী'[৩৩] বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মতো উপস্থাপনার, কলানৈপুণ্যে এবং ভাষার প্রসাদগুণে সুসম্পন্ন নয়। গ্রন্থটির দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা, তিনি কারামুক্তির পর চন্দননগরে ফরাসী সরকারের কাছে আশ্রয় লাভের পর দিব্যজগতে প্রবেশ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবপন্থা থেকে এ ধরনের প্রস্থান তদানীন্তন রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো। শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে জনমনের গুঞ্জন আজও আলোচ্য। কিন্তু 'কারাকাহিনী' ১৩১৬ সালের 'সুপ্রভাত'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রকাশনার আগে ১৯০৮ সালের ১লা মে'র গভীর রাতে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গ্রেপ্তারের পর কারাগারের মধ্যেই যে ঈশানুশীলন তীব্রতর হয়ে ওঠে তার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। গ্রন্থটি এক স্বদেশপ্রেমিকের দার্শনিক উত্তরণের কাহিনী। লেখক জানিয়েছেন—'কারাগৃহবাসে আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কয়েকটি বাহ্যিক ঘটনামাত্র বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি।' কিন্তু গ্রন্থের মূল কাঠামোর সঙ্গে উপরোক্ত উক্তির সাদৃশ্য নেই। প্রথমত 'কারাকাহিনী' প্রবন্ধ নয়, এমনকি ব্যক্তিগত নিবন্ধ রচনার চেষ্টাও এখানে অনুপস্থিত। নির্বাচনে যে সংবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ প্রয়োজন 'কারাকাহিনী'র বিষয় নির্বাচন তার পরিপন্থী। উপন্যাসের মতো এখানে ঘটনা, আখ্যান এবং চরিত্র কেন্দ্রীভূত। আবার বাহ্যিক ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমাগত আন্তরিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। সুতরাং রচনার শুরুতে যে উদ্দেশ্যে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ রচনার ক্রমবিকাশে সেই উদ্দেশ্য থেকে প্রস্থান লক্ষণীয়। কাহিনীর শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন—

"অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল কষ্ট করিয়াছিলাম, উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি . . . শেষে স্বয়ং গুরুরূপে সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধনকুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার।"

লেখকের জীবনযাত্রার গন্তব্যস্থল যেখানে 'জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে' বন্ধুভাবে

লাভ করা এবং যার যথার্থ সাধনকুটীর ইংরেজ কারাগার সেখানে 'কারাকাহিনী' আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস হবে না, তা হতে পারে না। গ্রন্থে একটি ব্যবহার্য বাটি, স্নানের বালতি, কম্বল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলি লেখকের সরস বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠে, যদিও কয়েদী চরিত্রগুলি লেখকের মনে কোনো বড় প্রভাব ফেলেনি। কারানির্জনতা তাঁকে এক অজ্ঞেয় দার্শনিকবোধে আত্মস্থ করেছে। সেই আত্মস্থহৃদয় নিয়ে তিনি জেলার যোগেন্দ্রবাবু, বাঙালী ডাক্তার বৈদ্যনাথবাবু, অন্যতম চিকিৎসক ডেলী ও এমার্সন, কৌসুলী নর্টন সাহেব এঁদের প্রসঙ্গ এনেছেন অনেকটা আত্মজীবনীর ধারাবাহিকতাকে পরিণতি দেবার জন্য। পরিণতি নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোনো চরিত্র বৈশিষ্ট্য এখানে নেই।

'নির্বাসিতের আত্মকথা'র[১৪] লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তমপুরুষে কথা বলেন। উত্তমপুরুষে কথা বলার একটি বিশেষ কারণ লেখক নিজের কথা, সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়, নানা অভিজ্ঞতার কথা বলার চেষ্টা করেন। মন যখন একা কথা বলতে শুরু করে অবশ্যই তা মনের কথা, আপন কথা। অন্তরের কথার সঙ্গে সংবেদনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিস্তরের সংবেদন যখন অধঃক্ষিপ্ত হতে হতে চেতনা জগতে একটি গাঢ় মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তখন সেই মানসিক আবহাওয়ার সাহিত্যিক অনুরণনই আত্মকথা। আত্মকথা যেহেতু আত্মার কথা তাই তাতে কল্পনা ও অনুভবের স্বর্ণরেণু লাগে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ঐ স্বর্ণরেণুর সাত রং বিশিষ্ট হয়ে পাঠকের কাছে ফিরে আসে।

অন্যদিকে স্মৃতিকথায় সত্যবদ্ধ অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতা আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। স্মৃতিকথার পিছনে ইতিহাসের সত্য এবং সত্যানুভব সংলগ্ন হয়। স্মৃতির জগতে গ্রহণ ও বর্জন ঘটলেও বাস্তবতার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে না।

উপেন্দ্রনাথের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কতখানি আত্মকথা বা স্মৃতিকথা তা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আত্মজগতের সামগ্রিক ইতিবৃত্ত যে ইতিহাস রচনা করে সেখানে অগ্নিযুগের নানা সহকর্মীর সঙ্গে লেখক বা উপেন্দ্রনাথের আত্যন্তিক সম্পর্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান আত্মকথায় উপেন্দ্রনাথের শোক-দুঃখ ও অনুভবের স্থান অত্যন্ত গৌণ। বরং লেখক-নিরপেক্ষ কারাসংসারের কথা স্থান পেয়েছে বেশি। সেক্ষেত্রে বিষয় নির্দেশক শিরোনাম হতে পারে নির্বাসিতের কথা বা স্মৃতিকথা; আত্মকথা নয়।

লর্ড কার্জনের ভারতশাসনের শেষে বাংলায় বিপ্লববাদের যে উত্তেজনার স্রোত

বহমান ছিল তা ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রের সৃষ্টি করে। সেই সময় মানিকতলার বাগানে বোমা তৈরিকে কেন্দ্র করে দেশের যে কয়েকটি তরুণ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিচারে দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন বর্তমান গ্রন্থকার তাদের একজন। সেদিনের ইতিহাস বাংলার এক স্মরণীয় অধ্যায়। সেই অতীত দিনের ইতিহাসটুকু দেশে ফিরে গ্রন্থকার 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় ব্যক্ত করেছেন। কারাসাহিত্যের ইতিহাসে, বাঙালীর জাতীয় জীবনের অথবা বাঙালীর স্বরাজলাভের ইতিহাসে 'নির্বাসিতের আত্মকথা' অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকবে।

গ্রন্থটি যেহেতু রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি এজন্য প্রতিটি চরিত্রই এখানে ঐতিহাসিক। যেমন সত্যেন, কানাইলাল, উল্লাসকর, বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ। লেখক ইতিহাসকে কল্পনার মায়াতুলিতে কল্প-উপন্যাস বা নাটক করে তোলেননি। রচনা যেমন সরল ও সাবলীল, বর্ণনার ভঙ্গীও তেমনই মর্মস্পর্শী। উপন্যাসের হাসি কান্নার মধ্যে কোথাও যেন সত্য কল্পনার মায়াজালে ছলনাময়ী হয়ে ওঠে। আমাদের জ্ঞানজগৎ নানাভাবে জানিয়ে দেয় উপন্যাস সত্য নয়, কাল্পনিক। 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় সত্যের ছলনা নেই, এ বিষয় শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর কথাগুলি প্রণিধান যোগ্য—

"এর মধ্যে এতরকমের এত ছবি, এত গল্প, এত তথ্য, এত বর্ণনা নদীর মতো বহমান, যে তার স্রোতে দুঃখের জঞ্জাল কোথায় ভেসে যায়।" অথবা "বর্ণনাগুলি একটি প্রশান্ত স্মিতহাস্যে মণ্ডিত, গল্প কোথায়ও দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ে না বা ভারী বোধ হয় না। হাল্কা পায়ে সমতালে গন্তব্য পথে ছুটে চলে।"[১৩]

ইন্দিরাদেবী পুস্তক সমালোচনার শেষে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'কে 'মেঘদূতের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন- 'অধীনতা কাতর চিত্তে স্বাধীনতা-অলকার সুসম্বাদ বহন করে এনেছে'। অবশ্য এ মন্তব্যে ভাবোচ্ছ্বাসের অতিরেক আছে। 'নির্বাসিতের আত্মকথা কোনো অলকাপুরীর খবর বহন করে না বরং পাঠকের চিত্ত কষ্টে ও বিস্ময়ে পাষাণ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার সুসংবাদ গ্রহণে অতিরিক্ত কোনো আগ্রহ থাকে না।

আলিপুর সেণ্ট্রাল লকআপে যে ঐতিহাসিক বিপ্লবী চরিত্রগুলির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরা সকলেই একই বিপ্লবাদর্শে কারারুদ্ধ হলেও পারস্পরিক সম্পর্কের এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য উপেন্দ্রনাথের কৌশলে বিভিন্ন স্থানে ছুঁয়ে গেছেন। যেমন যুগান্তর দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও 'নবশক্তি'র সম্পাদককে 'শ্রীমান

দেবব্রত' বলে উল্লেখ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে। ন্যাশন্যাল কলেজের পলাতক ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সেন সম্পর্কে তিনি একটু নরম মনোভাব পোষণ করেছেন। শ্রীরামপুরের নরেন্দ্র গোস্বামী যে পুলিশের সহচর ত। তার অদ্ভুত কার্যকলাপ থেকে লেখক বুঝতে পেরেছিলেন। সন্ধ্যার সময় জেল চত্বরে যে গানের আড্ডা বসতো সেখানে— 'অরবিন্দবাবু দেবব্রত ও বারীন্দ্র ভিন্ন আর সকলেই এই হট্টগোলে যোগ দিত…'

গ্রেপ্তারের পর বারীন্দ্রের মনে স্বপ্নভঙ্গের আঘাত অত্যন্ত বেশি। অরবিন্দ ঘোষ আপন মনে সাধন ভজনে ডুবে থাকতেন। ব্যতিক্রম ছিলেন কানাইলাল ও সত্যেন্দ্র। তাঁরা রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যা করেন। এতে কানাইলালের ফাঁসি হয়। উপেন্দ্রনাথ নিজের অবস্থান সম্পর্কে নীরব ছিলেন। জেলের মধ্যেও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের ঝুঁকি সকলে এক সঙ্গে ভাগ করে নেননি। এক শ্রেণীর বিপ্লবীর ধর্মচর্চার সমান্তরালে অন্যশ্রেণীর (যেমন কানাইলাল, সত্যেন্দ্র) বন্দীদের বিপ্লব প্রচেষ্টা ছিল সক্রিয়।

ফাঁসির কয়েকদিন আগে কানাইলালের দীপ্তি ও স্নিগ্ধতা উপেন্দ্রনাথের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে—

"কানাই-এর মতো অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মতো তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে।"[১৬]

তাঁর কাছে জেল, প্রহরী ও ফাঁসিকাঠ সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্ন। ফাঁসির সময় নির্ভীক প্রশান্ত হাস্যময় মুখশ্রী দেখে এক ইউরোপীয় প্রহরী বারীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তোমাদের হাতে এরকম ছেলে আর কতগুলি আছে?'

বারীন্দ্রের মতো উপেন্দ্রনাথও ব্যারীসাহেব এবং খোয়েদাদ খাঁর চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তবে বারীন্দ্রের বর্ণনা যতখানি চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ, উপেন্দ্রনাথের তা নেই। ব্যারীসাহেব সম্পর্কে তিনি শুধু স্থূলকায় ও খর্বাকৃতি বলে বর্ণনা শেষ করেছেন। তাতে জীবন্ত দেহাবয়ব ফুটে ওঠে না। তবে উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক রসজ্ঞান ব্যারী সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য—

"বুলডগের মতো মুখখানি দেখিলে মনে হয় যে, কয়েদী তাড়াইতে যাঁহাদের জন্ম, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান নিজনে বসিয়া ইঁহাকে কালাপানির জেলে কর্তৃত্ব করিবার জন্যই গড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে Uncle Tom's Cabin-এর লেগ্রিকে মনে পড়ে।"[১৭]

পেটি অফিসার খোয়েদাদ সম্পর্কে 'দ্বীপান্তরের কথা'য় আক্রমণের উগ্র গন্ধ

নেই, ব্যঙ্গ-কৌতুকের সঙ্গে পরিবেশিত। অবয়ব বর্ণনায় তিনি সব কিছু চাক্ষুষ করাতে চান। আর উপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য বন্দীর কারা-পরিস্থিতির সঙ্গে খোয়েদাদের সম্পর্কটুকু দেখিয়ে দেওয়া। উপেন্দ্রনাথের ব্যারীসাহেব, খোয়েদাদ এবং আর এক জেল সুপারিনটেনডেণ্ট যেভাবে কয়েদীদের উপর নিত্য নতুন অত্যাচারের সুপারিশ করতেন তার সংবাদটুকু দিয়েছেন। চরিত্রচিত্রণে তিনি অমনোযোগী। পরিশ্রমের তালিকা এত নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক যে হেমচন্দ্রের মতো আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন বিপ্লবীও শেষ পর্যন্ত শারীরিক কষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

আন্দামানের বন্দীজীবনে যে বিচিত্র সাধারণ কয়েদীজগৎ মুক্ত ছিল উপেন্দ্রনাথ সেখানে প্রবেশ করেননি, তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সহকর্মী বিপ্লবী বন্ধুদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং জেলকর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্ণনাকাঠিন্যকে লঘু করার জন্য মাঝে মাঝে সরস মন্তব্য ও কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এ জাতীয় কৌতুক কাহিনীগুলি আসলে এক ধরনের ব্ল্যাক কমেডি। নিহিত কৌতুকের মধ্যে ট্র্যাজিক বেদনা সৃষ্টি লেখকের উদ্দেশ্য। এক কয়েদী ঝাড়ুদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে কালাপানির কয়েদখানায়। বোধশক্তি লুপ্ত এই অসুস্থ মানুষটি লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি— 'তোমরা ক ভাই?' সে উত্তর করিল 'সাত'। তাহাদের নাম করিতে বলায় সে আঙুলের গাঁট গনিয়া পাঁচজনের নাম করিল। বাকি দুইজনের নাম করিতে বলায় উত্তর দিল 'ভুলে গেছি।'

অমানবিক জেল পরিবেশ, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতা, কয়েদীর খোরাক চুরি, কর্মচারীর ঘুষ গ্রহণ, আন্দামানের প্রতিটি কয়েদীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের চূড়ান্ত বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এই বিপর্যয়ের চিত্র উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতা ও সমবেদনার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তাঁর সরস বাচনভঙ্গি হঠাৎ ঘন বেদনায় ক্লাসিক ব্যাপ্তি পায়। আবার তিনি সহজ প্রসঙ্গে চলে আসেন। দুঃখ, বেদনা এবং আনন্দের কাহিনীগুলোকে পরিব্রাজকের মতো সংগ্রহ করেন।

ইন্দুভূষণ এই সংগ্রহের একজন। শারীরিক কঠোর পরিশ্রমে অক্লান্ত ইন্দুভূষণ জেলখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে অসহিষ্ণু হয়ে—'একদিন রাত্রে সে নিজের জামা ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইয়া পিছনের ঘুলঘুলিতে লাগাইয়া ফাঁসি খাইল।'

অত্যাচারের আর একটি বলি উল্লাসকর দত্ত। উপেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ উত্থাপনে বিষাদতাড়িত। বিষয়কে তিনি ট্র্যাজিক কাঠিন্যে পৌঁছে দিয়েছেন পাঠকের

কাছে। এই বেদনাবোধ পরবর্তীকালে অতিরিক্ত সাহিত্যিক শ্রীলাভ করেছে অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি-কেলাসে।' প্রচণ্ড রোদে ইঁট তৈরির কাজে পরিশ্রান্ত উল্লাসকরকে মেডিকাল অফিসারের পরামর্শ উপেক্ষা করে কাজে বহাল রাখতে চাইলে উল্লাসকর তা অস্বীকার করেন। এর পরিণাম সাতদিন দাঁড়া-হাতকড়ি এবং ১০৬ ডিগ্রি জ্বরে চেতনালোপ। উপেন্দ্রনাথ আন্তরিক মমতার সঙ্গে উল্লাসকর সম্পর্কে বলেছেন—"আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদ রোগগ্রস্ত।"[১৮]

জেলকর্তৃপক্ষের অত্যাচারের অন্যতম কারণ কয়েদীদের অন্তর্বিরোধ। যে অন্তর্বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন পাঞ্জাব থেকে আগত স্বদেশী বন্দী নন্দগোপাল সংগঠিত ধর্মঘটের ডাক দিয়ে। উপেন্দ্রনাথ নন্দগোপাল সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল; প্রশংসামুগ্ধ ভাষায় তিনি নন্দগোপালের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিবাদী প্রত্যয়ের চিত্রটি এঁকেছেন।

আন্দামানের সেলুলার জেলের অভিজ্ঞতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লক্ষ করেছেন। উপেন্দ্রনাথের রচনার বড়ো গুণ সরস মজলিসী সাহিত্য কাহিনীর বিচিত্র বিন্যাসে রূপদক্ষ কথাশিল্পীর কলমে নিঃশব্দে একটি ট্রাজিক জগতের মর্মধ্বনি প্রকাশ করে। দার্শনিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবনাসক্তির সম্মিলিত ফল 'নির্বাসিতের আত্মকথা'। দ্বীপান্তরের গুপ্ত কথাকে, নরকযন্ত্রণাকে তিনি কোথাও অতিনাটকীয় নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী করে তোলেননি। দুঃখকে প্রসন্ন মানসিক ভারসাম্যের সঙ্গে পরিবেশন করার দক্ষতা গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করেছে। বিশিষ্ট বাঙালী মন নিয়ে একটি অপরিজ্ঞাত জগতের কাহিনী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের কারণ লেখকের রচনা নৈপুণ্য। সংক্ষিপ্ত ভাষায় সংযত আকারে যথাযথ প্রকাশ করার দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। অকথ্য নির্যাতন, অপমানের কশাঘাত, অর্ধাশন, অনশন, প্রাণান্ত পরিশ্রম, নিরাশা—ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা যেখানে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে মননের এক অপরিজ্ঞেয় অধ্যায় যা বাইরের কোনো ঝড়ঝঞ্ঝা বা বিরোধিতায় ধ্বংস হয় না। মনের চিৎ অংশের মহাপ্রদীপ জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে তিনি কারাকাটকের অন্ধকার রাজ্যকে আলোকিত করেছেন একের পর এক বিভীষিকা, নৈরাজ্য এবং নরক-যন্ত্রণার অধ্যায়গুলিকে। জেলজগতের সামাজিক জীবনের

মৃত্যু ঘটলেও সাহিত্য সত্তা যে অনির্বাণ আলোক জ্বালিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তার প্রতীক গ্রন্থ 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

বর্তমান গ্রন্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার এবং জেল কর্তৃপক্ষের পরিবর্তিত মনোভঙ্গীর যে বিস্তৃত আলোচনা আছে তা বারীন্দ্রের 'দ্বীপান্তরের কথা'য় অনুপস্থিত। বারীন্দ্রের সাহিত্যিক ভাবাবেগ গীতার ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্মতত্ত্বে নিষিক্ত। ফলে উপন্যাসের নির্মাণ কৌশলের পাঠ গ্রহণ করেছেন তিনি দর্শন ও সমাজতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে। তাঁর রচনায় সাহিত্যকথা প্রবন্ধের ঘনবদ্ধতা এবং বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ! সমাজবিদ্যার কঠিন আস্তরণ ভেদ করলে 'দ্বীপান্তরের কথা'য় এক লাঞ্ছিত দেশব্রতীর অমৃতকণ্ঠ শোনা যায়। গ্রন্থপাঠের এই পরিশ্রমটুকু উপেন্দ্রনাথ পাঠকের প্রজ্ঞাবোধে ন্যাস্ত করেননি। বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথা ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে ব্রিটিশ রাজশক্তির পীড়নের যে চিত্র অনুপস্থিত ছিলো, উপেন্দ্রনাথ যেন দেশমাতৃকা প্রেরিত দেবদূতের মতো সেই অপরিজ্ঞাত অত্যাচার কাহিনীকে বাঙালীর চিত্তজগতে প্রোথিত করেছেন। তার বক্তব্য প্রকাশের ভাষা নাতিবাদী নয়, শিল্পায়। রচনার সামাজিক ম[illegible] বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে ঘনিষ্ঠতর করেছে।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তার 'বন্দী-জীবন' (১ম খণ্ড ১৯২২, প্রকাশক: সংস্কৃত লাইব্রেরী) গ্রন্থের সূচনা অংশে 'বন্দী-জীবন' শিরোনামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে 'ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা' পর প্রকৃতপক্ষে এক বিপ্লবীর বন্দী জীবনের চিত্র অপেক্ষা বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১ম, ও ২য় খণ্ডে লিখিত হয়েছে। ১ম খণ্ডের ভূমিকাংশে লেখক দাবি করেছেন 'ভারতের সমাজ যদি প্রাণবন্ত হয়, তবে ভারতের প্রাণের এই অশান্তির ছবি তাহার সাহিত্যেও নিশ্চয়ই আপনার প্রতিবিম্ব আঁকিয়া দিবে।' অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে স্বাধীনতা আন্দোলন তার ভাঙাগড়ার ছবি সাহিত্যের শান্ত প্রবাহের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করুক—এটিই লেখকের প্রার্থিত। তিনি 'নির্বাসন কাহিনী', 'কারাকাহিনী', 'দ্বীপান্তরের কথা', 'নির্বাসিতের আত্মকথা', প্রভৃতি কারাকাহিনীর সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থকে এক পংক্তিতে রাখতে চান। অথচ ঘোষিত ভূমিকার সঙ্গে লিখিত বিষয়ের সম্পর্ক খোঁজা কষ্টসাধ্য। ভূমিকা অংশে তিনি 'নির্বাসিতের আত্মকথা' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"ভাব যেন সব তাতেই কৌতুক। তাই নির্বাসিতের আত্মকথা" চিত্তাকর্ষক হইলেও মর্মস্পর্শী হয় নাই। আর বারীনবাবুর দ্বীপান্তরের কথায় যেটুকু উপেন-

বাবুর লেখা সেটুকুই আমার ভাল লাগিয়েছে, এবং ওই পুস্তকের অর্দ্ধেকেরও বেশী উপেনবাবুরই লেখা। বারীনবাবু যদিও গোড়ায় লিখিয়াছেন "ইহা দুই মুখেরই এক কথা" কিন্তু ইহা যে দুই মুখেরই স্পষ্ট দুই কথা তাহা বুঝিতে কাহারও এতটুকুও কষ্ট হয় না।। বারীনবাবুর লেখায় মাঝে মাঝে বেশ কারত্ব থাকিলেও মোটের উপর তাঁহার লেখাতেও বিপ্লববাদদের মর্মকথা ব্যক্ত হয় নাই। তা ছাড়া এই দ্বীপান্তরের কথার অনেক কথাই বেশ অনায়াসে ধামাচাপা দেওয়া হইয়াছে।" উপরোক্ত মন্তব্যের সমালোচন করে বলা যায়—

(১) 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র সামগ্রিক সাহিত্যবস্তু, কারা অভিজ্ঞতা ও স্ব ও স্বরূপ সম্ভবত শচীন্দ্রনাথ স ন্যাল মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রথমোক্ত গ্রন্থে সাহি ত্যক ... প্রসঙ্গে ... ইতিহাস ও সাহিত্যের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ করেছি।

(২) 'নির্বাসিতের আত্মকথা' এবং 'দ্বীপান্তরের কথা' 'দুই মুখেরই এক কথা' নয়। বিষয়বস্তু, উপস্থাপনরীতি, অঙ্গসজ্জা এবং ভাষাছাদ দুটি গ্রন্থে সম্পূর্ণ পৃথক। 'বন্দীজীবন' ২য় খণ্ড 'নিবেদন' অংশে লেখক স্বয় গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, বর্তমান গ্রন্থটি কারারুদ্ধ বন্দীর স্মৃতিকথা নয়। যাই হোক, গ্রন্থটির যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে তা অনস্বীকার্য। কেন না বাংলা বারাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলন একটি বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেই আন্দোলনের গতি প্রকৃতির তুলনামূলক অধ্যয়নে বর্তমান গ্রন্থটা গুরুত্বপূর্ণ।

'স্রোতের তৃণ' বা স্বরাজ আশ্রমে আটমাস' গ্রন্থের বিষয় এবং চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক। লেখক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বর্তমান গ্রন্থকে মহাকাব্যের আকারে উপস্থিত করেছেন। মহাভারতের পর্ববিভাগের মতো মূল গ্রন্থকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন। যেমন উদ্যোগপর্ব, যাত্রাপর্ব, বিচারপর্ব, আশ্রমপর্ব ও প্রত্যাবর্তন পর্ব

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে মহাত্মা গান্ধীর কারাজগত সম্পর্কে একটি বিশেষ তত্ত্ব বর্তমান লেখক গ্রহণ করেছেন। কারাজীবন আসলে স্বরাজ প্রাপ্তির প্রশিক্ষণ শিবির। এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে লেখক গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'স্বরাজ আশ্রমে আটমাস'। স্বরাজী হিসাবে আত্ম-অহমিকার পরিবর্তে অহংসত্ত্বা নিরোধে যিনি বিশ্বাসী তিনি যথার্থই 'স্রোতের তৃণ'। নামকরণে একটি শিরোনামের বিকল্পে অন্য একটি শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে। দুটি শিরোনামের মূল সুর স্বরাজচেতনার ইঙ্গিতবহ।

লেখকের একটি বিশেষ গুণ তিনি কারাজগতের বাস্তব ঘটনার আত্মীকরণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপনেও সমান পারদর্শী। তাঁর লক্ষ্য সহজ গদ্যভাষায় কারাজীবনের সামগ্রিক আলেখ্য চিত্রিত করা। বিষয়নির্মাণ এবং উপস্থাপনে তিনি প্রত্যক্ষ বাচনপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিকের মতো জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের ঘটনা বিবৃতি তাঁর লক্ষ্য। এখানে তিনি যতখানি বক্তা, ততখানি চরিত্র নন। জেলজগতের নৈরাশ্য ও যন্ত্রণাকে রং ও তুলির বস্তু করে তোলা যেমন তাঁর লক্ষ্য তেমনি একথাও ঠিক দৃষ্টি সৌন্দর্য, ইন্দ্রিয় সচেতনতা এবং বর্ণগন্ধের কারাগারে তিনি বেশিক্ষণ আবদ্ধ থাকেন না। তাঁর রচনায় উচ্চাঙ্গের নীরবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক অখণ্ডের সত্যানুভব। লেখকের ইন্দ্রিয় জেলজগতের সেটুকু অংশই সনাক্ত করেছে যেটুকু অংশে মনুষ্যবর্জিত লৌহকপাট দীর্ঘ বিস্তারি শৈলমালার মতো তাঁর চিৎসত্তাকে গ্রাস করতে চেয়েছে। ফলে লেখক চিত্রিত কারাজগতের ল্যাণ্ডস্কেপে সাধারণ কয়েদী, অত্যাচার, সুপ্ত ইন্দ্রিয়ক্ষুধা ধরা দেয়নি। যে মন অব্যক্ত জগতের সঙ্গে কথা বলে সে যখন বহিরাশ্রয়ী প্রতিবেশের চিত্র আঁকার চেষ্টা করে তখন কোনো এক অজ্ঞাত মুহূর্তে অন্তঃপ্রকৃতির মর্মকথা বিষয় কাঠামোর নিয়ন্ত্রক হয়। আলোচ্য লেখক আশ্রমজগতের সঙ্গে কারাদণ্ডের অভেদ তৈরি করেছেন। অর্থাৎ তার কাছে কারাদণ্ড সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনবৃত্তের অন্যতম একটি ব্রত। ব্রতপালনের পথ যে গ্রন্থের মর্মকথা সেখানে কারাজগতের নিহিত অমানবিক সমাজব্যবস্থা কখনোই লেখকের অন্তর্জগতে সতীব্র যন্ত্রণার ট্রাজিক অনুভব সৃষ্টি করতে সক্ষম। বর্ণনায় বিষয়কে ছোট ছোট দৃষ্টিলব্ধ ধারণার মধ্য দিয়ে বীরেন্দ্রনাথ কথার চালচিত্র রচনা করেন। প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে যেন জন্ম জন্মান্তরের প্রার্থিত ব্রত উদ্‌যাপনের দায় গ্রহণ করেছেন লেখক—"মানুষের আইন অগ্রাহ্য করে ভগবানের আইনের স্রোতে নাচতে নাচতে সে যখন সেখানে যায়, সে তো সে স্থানটিকে তখনকার মতো তার স্বরাজ আশ্রম কিংবা তীর্থক্ষেত্র বলবেই এবং মনে মনে অনুভব করবেও—সেই রকম ভাব।"

দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুজগতের বর্ণনায় লিপিকুশলতা ও পর্যবেক্ষণের প্রখরতা আলোচ গ্রন্থে এতো সজীব যে, গ্রন্থপাঠে মনে হবে পাঠকও যেন আলিপুর সেণ্টাল জেলের ৪৪ ডিগ্রিসেলের স্বদেশী হওয়ার অভিযোগ রুদ্ধ হয়েছেন। কারাজগতের স্থির চিত্রগুলি পাঠকমনকে সরাসরি স্পর্শ করে বর্ণনার তড়িৎধর্মে। স্থির চিত্রগুলির মধ্যে ডায়েরি প্রবণতার বয়ন-রীতি প্রতিফলিত। আত্মগত ভাবনা, খণ্ডচিত্র পাঠককে প্রসঙ্গান্তরে পৌঁছে দেবার স্থিতিস্থাপক শক্তি গ্রন্থের শিল্পশ্রী বৃদ্ধি

করেছে। সহকর্মী বন্দী মানুষগুলি একই কারাগারের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। লেখকের মন হয়ে উঠেছে বন্দী পাখীর মতো—'এত কাছে থেকেও এত দূরে বাস করতে পারে একথা পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল।'

সাধারণ অপরাধী রহিম খানসামার দুর্নীতি, ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী হ্যামিলটন সাহেবের চরিত্রচিত্রণ বক্ষ্যমান গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। গ্রন্থের শেষ পর্বের নাম 'প্রত্যাবর্তন পর্ব'। সূচনায় রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের জীবন যাত্রার বিষয়টুকু লক্ষ্য করেছেন। ভোর না হতে যেভাবে ভোরের পাখী ডাকে, ঘুমিয়ে পড়া বনের কোণ থেকে যখন প্রভাতফেরীর কণ্ঠস্বর অরণ্য বনানী প্লাবিত করে, মানুষের হৃদয় রাজ্যে শৃঙ্খলিত বন্দীদশার ভেতর তেমনই যেন কোথাও ভোরের পাখী কথা বলে। এ জাতীয় একটি স্বাধীনতার উপলব্ধি গ্রন্থের শেষে ব্যক্ত হয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার সর্বব্যাপক রূপ সম্পর্কে তিনি যে ধারণা পোষণ করেন তা সম্ভবতঃ ভাগবতগীতার উপলব্ধি সমৃদ্ধ—

"প্রকৃত স্বাধীন মানুষের মত প্রকৃত পরাধীন জীব এ জগতে অতিবিরল এবং এ জন্যই বলছি যে, গত আট মাসের—প্রবাসের মধ্যে স্বরাজের আস্বাদন পেয়েও স্রোতেব তৃণ আজ জেল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা লাভ করেছে কি না ঠিক করে বলা কঠিন।"

কেননা দেহ-আত্মার প্রভেদ সম্পর্কে গীতায় ব্যক্ত হয়েছে—

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হান্ত ন হন্যতে ।।
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।[৪০]

গ. অসহযোগ আন্দোলন থেকে আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯২২—১৯৩০)

উল্লাসকর দত্তের 'আমার কারাজীবনী'[৪১] পূর্বোক্ত আলোচিত গ্রন্থগুলির তুলনায় চিহ্নিত ব্যতিক্রম। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে গ্রন্থটি কারাজীবনীর সার্থক প্রতিকৃতি নয়। কারাবাসের বিবরণ, সুখ

দুঃখ, নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও কয়েদী চরিত্র ইত্যাদি সাধারণ কারাবিষয়গুলি অপেক্ষা বন্দীর মানসিক অবস্থায়ই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অতিলৌকিক ঘটনার নিত্য অনুভব গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। ক্রমাগত অত্যাচার নির্যাতনে লেখক আন্দামান থেকে মাদ্রাজের মানসিক স্বাস্থ্যাবাসে স্থানান্তরিত হন। এখানে রোগগ্রস্ত অন্যান্য ব্যক্তির পরিচয় লেখক স্পর্ধিত দুঃসাহসের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

কারাজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এক প্রশস্ত শিল্পপ্রাঙ্গনে মুক্তি প্রত্যাশায় যেভাবে পরবর্তীকালে রানীচন্দের 'জেনানা ফাটকে', অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি-কেলাসে' বা অমলেন্দু দাসগুপ্তের 'ডেটিনিউ'-এ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—তেমন সদাজাগ্রত ব্যাকুলতা 'আমার কারাজীবনী'তে নেই। গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কারাতিক্ততার অতিরিক্ত অতিলৌকিক রসাস্বাদন। লেখকের অন্তর্জগতে কারাজগতের মাটি, জল ও মানুষ অপেক্ষা নিগূঢ় রহস্য সন্ধানের ইচ্ছা প্রবল। কারাজীবনের বিকৃতি, কুটিলতা এবং নির্মমতার উপকরণ উল্লাসকরের কাছে মজুত থাকলেও তিনি এমন বিষয় গ্রহণ করেছেন যা পাঠকের বুদ্ধিশীল জগতে মানবিকতার ইস্পাত কঠিন ধাতব দীপ্তি প্রজ্জ্বলিত করে না। যাঁরা অতি জাগতিক ঘটনার প্রতি আসক্ত তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অবশ্যই সুখপাঠ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক। সেদিক থেকে বিচার করলে সাহিত্যমূল্যায়নে আলোচ্য গ্রন্থটির একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে।

পাশবিকতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে কবি প্রাণের মৃত্যুঞ্জয়ী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'[৪২] পুস্তিকায়। মহাকালের ধূমকেতু হাতে করে যিনি যুগান্তরের প্রলয় শিখা নাচান—সেই বিদ্রোহী কবির আত্মপক্ষ সমর্থনের বাণীরূপ বর্তমান রচনা। এক অগ্নিক্ষরা কণ্ঠের অসহ দহন-ক্রিয়ার বিকীর্ণ অনুভবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে যেন মেসোপটেমিয়ার রণ-প্রান্তর। কিন্তু রচনা এখানেই শেষ নয়। ব্যক্তিগত পত্ররীতির মোড়কে অনিন্দ্যসুন্দর কাব্যভাষায় রচনার প্রতি ছত্রে ছত্রে ইন্দুপ্রভা বিকীরণ করেছেন কবি। এমন শাণিত বীর্যদীপ্ত কাব্যময় গদ্যভাষায় রচিত প্রতিবাদ পত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। নজরুল ইসলাম দুঃখকষ্টের তুষাগ্নির ভিতর একটি সংহত সংযত মানবিক জিজ্ঞাসার বাণী রচিত করেছেন। সমগ্র প্রতিবাদ পত্রটি বন্দী কবির মানবতার মহাভাষ্য, আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মতো বর্তমান পত্রে যুগযুগান্তের মানবতার জয়গান ধ্বনিত। এখানে ভাষা লিরিকধর্মী, প্রকাশরীতি বাহুল্যবর্জিত ও

ভাবগম্ভীর। মানবতার নিষ্ঠুর অবমাননা, রাজার ক্ষুদ্রতা-নীচতা-স্বার্থ-লোভের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে তা একটি পরাধীন জাতির নিরন্ধ্র অন্ধকারে জ্যোর্তিময় আলোক রশ্মি বিচ্ছুরণ করে।*

"তার অনুবাদে রাজবিদ্রোহ ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা উৎপীড়িত আর্ত্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্যবারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়েব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।"[৪৩]

"আন্দামানে দশ বৎসর"[৪৪] গ্রন্থের লেখক মদনমোহন ভৌমিক আন্দামানের জেলজগতের প্রত্যক্ষ চিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি প্রবন্ধধর্মী, গল্পরস অবতারণার সুযোগ নেই। কারাকাহিনীকে উপন্যাসধর্মী করে তোলার জন্য উপকাহিনী সংযোজন, চরিত্রসৃষ্টি এবং বর্ণনাধর্মে যে সযত্ন প্রয়াস অন্যান্য গ্রন্থে লক্ষণীয় আলোচ্য গ্রন্থে তেমন কোনো সচেতন প্রয়াস নেই। জেলজীবনে বিস্তৃত তথ্য বর্ণনায় লেখক আবেগশূন্য। বর্ণনীয় বিষয়ে বস্তুধর্মই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী এবং রাজনৈতিক সহকর্মী প্রসঙ্গে মদনমোহন কখনো দীর্ঘ অনুচ্ছেদ রচনা করেননি। নির্বাসন, কারা-যন্ত্রণা এবং অপমান এক অখণ্ড বস্তুধর্মী ভাষায় বিধৃত।

গ্রন্থটি পাঠে বোঝা যায় লেখকের চরিত্রচিত্রণ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কিন্তু দেশহিতব্রত এবং কারাগারের বস্তুজগৎ লেখককে এতো প্রভাবিত করেছে যার ফলে তিনি আপন অন্তর্জগতে এবং কয়েদীদের মনোজগতে প্রবেশ করেননি। আন্দামান জেলের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এবং ইংরেজ সরকারের আচরণ গ্রন্থটির সামাজিক রাজনৈতিক মূল্যবৃদ্ধি করেছে। লেখক সংবেদনশীল ও পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটির বাস্তবনিষ্ঠা ইতিকথার মর্যাদা পেতে পারে।

* লণ্ডন টাওয়ার জেলে কারারুদ্ধ বিদগ্ধ সাহিত্যিক ফ্রান্সিস বেকন রাজার কাছে মার্জনা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন (১৬১১ খ্রীঃ ভারতবর্ষ পত্রিকা, মাঘ, ১৩৫৬, পৃ, ১০৪-১০৫-এ প্রকাশিত) সেখানে দাসত্ব ও চাটুকারিতা লেখক সত্তার মৃত্যু ঘোষণা করে। যদিও যুগ পরিবেশ এবং রাজনৈতিক অবস্থা দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন তবে একথা সত্য বেকনের আত্মবিক্রীত মনোভাব আত্মসমর্পণের দিকগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করেছে।

'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'কারামুক্তি'[৪৫]। একটি লুপ্তসম্পন্ন পরিবারের বর্তমান বংশধর সাতকড়ি, গল্পের নায়ক। ঘড়ি চুরির অপরাধে—'কল্যাণপুরের সাতকড়ি পাঠক শাস্তি ভোগ করিতেছিল।' সাতকড়ি চরিত্রের পাশে আর একটি চরিত্র সাতকড়ির কিশোর পুত্র। সে তার বাবার মুক্তিকামনার দিন গুণে চলে। শেষে সে ফাটকের কাছে নিত্য যাতায়াত শুরু করে কিন্তু জেলের ভিতরে যাবার কোনো সুযোগ পায় না। যখন সে প্রকৃতই পিতৃসান্নিধ্যে এলো তখন সাতকড়ি মৃত।

গল্পটির পরিণতি করুণরসে। কারারুদ্ধ সাতকড়ির দুঃখময় জীবনের বাইরের জগতে দাঁড়িয়ে কিশোর পুত্রের অকারণ শাস্তি ভোগ বর্তমান গল্পের বিষয়। গল্পটি সংক্ষিপ্ত, গতিশীল ও পরিণতিমুখীন। পিতৃস্নেহবঞ্চিত কিশোর বালকের বাস্তবগ্রাহ্য চিত্র আঁকতে চেয়েছেন লেখক। কিন্তু কাহিনীর শেষে মৃত পিতার যখন সর্বাঙ্গ কম্বলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং পুত্রের 'বাবা গো বলিয়া চীৎকার'—এই দুটি দৃশ্য অবশ্যই দুঃখজনক, কিন্তু শিল্পরীতি সম্মত নয়। অবাস্তব ঘটনার সঙ্গে দুটি বাস্তব চরিত্রের শৈল্পিক সংযুক্ত ঘটেনি।

ঘ. আইন অমান্য আন্দোলন থেকে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯৩০—৪২)

সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত অরাজনৈতিক কারা উপন্যাস 'শৃঙ্খল'[৪৬]। চরিত্রগুলি কাল্পনিক। ঔপন্যাসিক চরিত্র-চিত্রণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, আখ্যানে নয়। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, পাশ করে কলেজ অধ্যাপনার চেষ্টা করছে। সে সৎ, হৃদয়বান এবং নীতিনিষ্ঠ। তার স্ত্রী অমলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্বেশ্বরের কারাবরণ। কারাবরণের পিছনে গ্রামের সুদখোর জমিদার তারিণী চৌধুরীর হাত রয়েছে। অবশ্য লেখক তারিণীকে চরিত্র করে তোলেননি। তারিণী প্রতিনায়কের মর্যাদা পেলে কাহিনী আরও গতিশীল হতে পারত।

বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে অমলার দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন ছিল তা লেখক বিশ্বেশ্বরের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে পাঠককে জানিয়েছেন। কিন্তু এই পর্যন্তই। স্ত্রী অমলা বর্তমান কাহিনীর নায়িকা হয়ে ওঠেনি কেননা স্মৃতির জগতে বিশ্বেশ্বর-অমলা মূল কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করেনি।

এমন কি তাদের সম্পর্ক বিশ্বেশ্বরের কারাজীবনের গতি পরিবর্তনে কোনো

দায়িত্বও গ্রহণ করে না। নায়ককেন্দ্রিক এই কাহিনীর কোনো পরিণতি নেই। কারা প্রবেশের পর বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে নবীন-ওয়াজ, সোলেমান, মাইতোর মিঞা, দীন মহম্মদ প্রমুখ সাধারণ মুসলমান কয়েদী চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে। এই চরিত্রগুলি স্বাভাবিক, রক্ত মাংসের অনুভূতি নিয়ে গড়া। তাদের শোক দুঃখ ব্যথা বেদনার দিকগুলি লেখক বাস্তব সম্মত ভাবেই দেখিয়েছেন। সাধারণ কয়েদী ওয়ার্ড থেকে সপ্তমপরিচ্ছেদে বিশ্বেশ্বরকে দেখা যাবে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের শান্ত নিশ্চিন্ত দিনযাপন কয়েদী সমাজের অস্থিরতা ও সংশয়কে বিস্মৃত করে বিশ্বেশ্বরকে। যেখানে গল্প নতুন খাদে বইতে সুরু করলেও লেখক উপন্যাস ও কাহিনীর বস্তু সম্পদকে কাজে লাগাননি।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে ফিরিঙ্গি এবং ভদ্রশ্রেণীর বাঙালী কয়েদীর বাস। এখানে গর্বিত বি. বি. ঘোষ ও জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের বন্দীজীবনে এক ধরণের সাথীত্ব গড়ে ওঠে। সহবন্দীদের সঙ্গে বিশ্বেশ্বর হাস্যপরিহাসের মধ্যদিয়ে নানা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আলোচনা করে। এরই মধ্যে আর একটি চরিত্রের আবির্ভাব, নাম মিরাণ্ডা 'ষোল-সতের বছরের ছিপ্ ছিপে সুন্দর একটি ছেলে'। মিরাণ্ডার প্রতি বিশ্বেশ্বরের ভালবাসায় স্নেহাতিরিক্ত আসক্তি দেখিয়েছেন লেখক। সম্ভবত স্ত্রী অমলার মাধুর্য ও সুখসঙ্গের অভাবটুকু বিশ্বেশ্বর মিরাণ্ডার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে অনুভব করেছে। মিরাণ্ডা বিশ্বেশ্বর সম্পর্কে কতখানি পিতৃস্নেহ আর কতখানি দাম্পত্য সম্পর্কের শূন্যতা তার মনস্তাত্ত্বিক চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন লেখক। এরপর কাহিনী গতি হারিয়ে ফেলেছে। জেলে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে নায়ক বিশ্বেশ্বর। শেষ পর্যন্ত ১৪ ডিগ্রী সেলে স্থানান্তরিত হবার পর হঠাৎ একদিন জেলার তাকে জানাল 'তুমি ছাড়া পেয়ে গেছ'।

লেখকের লক্ষ্য বিশ্বেশ্বরের চোখ দিয়ে কারাজগতের চিত্রগুলিকে ছুঁয়ে যাওয়া। বিশ্বেশ্বরের জেল প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যে কোনো মানসিক নৈতিক সংকট দানা বাঁধেনি। জেল প্রবেশের পর বিশ্বেশ্বরের সমাজ-পরিবার এবং কারাজগৎ স্থির জলের মতো দাঁড়িয়ে। ঘটনার নতুনতর তরঙ্গ বিক্ষোভ কাহিনীকে পরিণতিধর্মী করে তুলতে পারেনি।

স্ত্রী অমলা, মা আনন্দময়ী, জমিদার তারিণী চৌধুরী এবং নায়ক বিশ্বেশ্বর কাহিনীর উত্থান-পতন সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করেনি। ফলে কাহিনী যে একটি গভীরতর জীবনের নিগূঢ় অর্থদ্যোতনা ঘটাতে সমর্থ হত তা ব্যর্থ হয়েছে।

কাহিনী বিন্যাসে নূতনত্ব কিছু নেই, বর্ণনার ঢঙটি আরও সাধারণ। তুলনায় সাধারণ মুসলমান কয়েদীগুলি আশা আকাঙ্ক্ষায় রসোজ্জ্বল। অবশ্য এখানেও খণ্ডতার অতৃপ্তি রয়েছে। জীবন তরঙ্গের অতল গভীরে কত নিষ্ঠুর সত্য ও নির্মম নেমেসিস্ রয়েছে সেখানে লেখক অনাসক্ত। তিনি জেল জগতের উপরি কাঠামো বর্ণনাতেই আবদ্ধ থাকলেন; চরিত্রগুলির গভীরে প্রবেশ করে তাদের দেহ মনের বুভুক্ষা, কুসংস্কার, বন্দীমনের শিলীভূত ক্রন্দন প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে চিত্রিত করলেন না। তবে একথা ঠিক আঞ্চলিক উপন্যাসের মতো 'শৃঙ্খলে'র ভৌগোলিক পরিধি অবশ্যই কারাজগৎ। কারাজগতের স্থানিক পরিবেশ, জল-আবহাওয়া এবং ভূখণ্ড গ্রন্থের পটভূমি। কাহিনীর সুরু থেকে শেষ একটি বিশেষ কারা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, যদিও অঞ্চলটির নিগূঢ় পরিচয়দানে লেখক ব্যর্থ।

জেলখানায় তারাশঙ্কব 'পাষণপুরী[৪৭]' ও 'চৈতালি ঘূর্ণি[৪৮]' উপন্যাস দুটি রচনা সুরু করেন। এর আগে ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে 'কল্লোলে' প্রকাশিত 'রসকলি' গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক তারাশঙ্করের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কাবাবরণেব পর কারাজীবনই যথার্থভাবে তাঁর সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করল। জেলজীবনেব একাকিত্ব, সমাজবিশ্লিষ্ট মানুষগুলির নৈতিক বৈষম্যের বিভিন্ন দিক, অবরুদ্ধ কারাপ্রাচীরে পিষ্ট মানবতা, কয়েদী জীবনের ব্যথা বেদনার সঙ্গে সংকীর্ণতা, দলাদলি, মতান্তর, স্বার্থবুদ্ধি, আদর্শচেতনার অবলুপ্তি কখনও বা অবরুদ্ধ মানবিকতার হীরকসামান্য বর্ণ-দ্যুতি তারাশঙ্করকে জীবন সংবেদনশীল শিল্পীরূপে পরিগণিত করে। পাষাণকারা অবিচার ও মানুষের নৈতিক অধঃপতনের চারণক্ষেত্র। মানুষ-সৃষ্ট এই শৃঙ্খলিত জগৎ তাঁকে প্রথম শ্রেণীর মানবতাবাদী ঔপন্যাসিকে পরিগণিত করে। এর প্রমাণ 'পাষাণপুরী'।

'পাষাণপুরী'র সাহিত্যিক সাফল্য এবং শিল্পমহত্ব লেখককে পরবর্তীকালে আদর্শনির্ভর জীবনদর্শনের পূর্ণতা এনে দেয়। প্রকৃতপক্ষে 'পাষাণপুবী' তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক আদর্শের সূচনাভূমি। কারাজগৎ লেখকের সাহিত্যিক-সত্তায় জীবন অন্বেষণের যে বীজ বপন করে 'পাষাণপুরী'র প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার পর তাই 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা' ও 'গণদেবতা'র পথ প্রশস্ত করে। কারা-প্রাচীরের অবরুদ্ধ মানবসমাজ যেন একটি নতুন মানব সমাজ। সেই অপরিজ্ঞেয় অজ্ঞাত জগতের প্রতি তাঁর সাহিত্য সত্তায় যে সংযোগ সেতু সৃষ্টি করে তারই

ফলে তিনি চিরাচরিত উপন্যাসের পথ থেকে সরে আসেন। পারিবারিক জীবন, নর-নারীর প্রেম ভালবাসা, সাধারণ সমাজবদ্ধ মানুষের সুখ দুঃখের ছবি হঠাৎ যেন কারান্তরালের নিষ্ঠুর তাণ্ডবলীলায় লেখককে নতুন খাদে কলম ধবতে বাধ্য করলো।

জেলখানাব কয়েদী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থায় কারাকক্ষে প্রবেশ করে। জেলজীবনের খণ্ড সময়কালে চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, আশা-নিবাশা, সুখ ও দুঃখ যে সাময়িক ছন্দ সৃষ্টি করে লেখককে সেখান থেকেই কাহিনী সুরু কবতে হয়। সাধারণ উপন্যাসে কাহিনী, চবিত্র এবং ঘটনার যে পরিণতিমুখিন সুডৌল কাঠামো সৃষ্টি করা যায়, কাবাকেন্দ্রিক উপন্যাসে এমন কাহিনী আঁকতে গেলে অঙ্কনচিত্র, চরিত্র এবং ডিটেলস্ বাদ পড়ে যায়। পারিবারিক উপন্যাসগুলির মতো এখানে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী সৃষ্টিব সুযোগ নেই। তারাশঙ্কর কাবাগারেব স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন। খণ্ড সময় বৃত্তে তিনি বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের উপর অস্বাভাবিকতা বা পবিবর্তনেব ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি করেননি। বিশেষ কোনো বাজনৈতিক অবস্থা বা কোনো অপবাধীব মানসিক গতিবিধি লক্ষ করা লেখকেব উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন মানসিক স্তরেব কয়েদী চবিত্রগুলি কারান্তরালে যে বিমিশ্র রাগিনী সৃষ্টি করে তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরাই তাবাশঙ্করের উদ্দেশ্য। কাবাজগতের রক্তাক্ত চিত্রগুলি সংযম ও পবিমিতিব সৌষম্যে একটি স্থির ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চরিত্রগুলি তাদেব স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হযে কোনো তীব্র গতি প্রবাহ সৃষ্টি কবে না। জেলের নিবানন্দ, নৈবাশ্য, বাধ্যতামূলক অবসাদ তিলে তিলে মনুষ্যত্বের মুক্ত প্রকোষ্ঠগুলিকে নিযত ক্ষয়প্রাপ্ত করে। আত্মমর্যাদাবহনকারী সুস্থ ও অসুস্থ কয়েদীব মানসিক ভারকেন্দ্রকে কাবাজগৎ ক্রমাগত নৈবাশ্যময় করে তোলে। সাইদ, গৌব, কেষ্ট, চৈতন্য, গোঁসাই, ওস্তাদ প্রভৃতি এমনই কয়েকটি চরিত্র। যারা ইতব আমোদ প্রমোদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমনই এক সংসাব গড়ে তুলেছে যেখানে স্নেহ প্রেম মমতাব কোমল দিকগুলি লোপ পেতে বসেছে। আবার এরই মধ্যে বেদনাব তীব্র সংঘাত কখনোও বা এদের স্বচ্ছন্দ সামাজিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছে।

জেলখানাব অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র খুনেব আসামী কালী কামাব। তার ভীতি-বিহ্বল আতঙ্কিত মানসিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমেব স্নিগ্ধ মাধুর্য, যার কাবণ প্রেমিকা 'বাসিনী'। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ রাজনৈতিক অপরাধে

কারারুদ্ধ। তাদের মানসিক দিকগুলি নিম্নস্তরের কয়েদী জগতের স্বাভাবিকতাকে যেন সোচ্চার করে। সুবিধাবাদ, স্বার্থপরতা, অহংসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতা শিক্ষিত এই মানুষগুলির নৈতিক অধঃপতনকে সুস্পষ্ট করে পাঠকের কাছে লেখক তুলে ধরেছেন। অবশ্য সুরেশ ও অমর ব্যতিক্রান্ত চরিত্র। কারাপ্রাচীরেব অভ্যন্তরে তারা উচ্চতর মানবিকতার বাণী বহন করে। ছোটগল্পের মতো আর একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র সুরু। তাব অনশনব্রত, আত্মোৎসর্গের মাহাত্ম্য যেন সমস্ত জেলখানার মধ্যে স্বাধীনতার প্রার্থিত আদর্শের প্রতীক।

তারাশঙ্করের কারাকাহিনী আসলে লেখকেব অভিজ্ঞতা থেকে কল্পনায় উত্তবণেব কাহিনী। ফলে তিরিশেব দশকেব স্বাদেশিকতা, ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং গান্ধী-বাদী আদর্শের উচ্ছ্বাস যেমন এখানে স্থান পেয়েছে অন্যদিকে জেলজীবনের সাধারণ কয়েদী চরিত্রের বাস্তব চিত্রণে লেখক একইভাবে উৎসাহী। বিশেষ কোনো রাজনীতি বা চরিত্রের প্রতি লেখক উৎসাহী নন। তাঁর লক্ষ্য পাষাণপুরীব প্রাণস্পন্দন কর্ণগোচর করা। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক স্তরের মানুষগুলি জেল নিয়মের নিয়মিত পরিবেশে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তার স্থূল ও সূক্ষ্ম, মার্জিত ও অমার্জিত, প্রেম ও ঈর্ষা, সংযম ও বেপরোয়াভাবেব প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে লেখকের ক্রিয়াশীল সাহিত্যসত্তা পূর্ণমাত্রায় সচেতন। ন্যায় নীতিবোধের বিপরীতে যে অসামাজিক জান্তবতা জেলজগতের নিত্য সত্য তাব ধারাবাহিক নগ্নচিত্র তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য। এই একই উদ্দেশ্যে নিম্নতর কয়েদীব সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে ভদ্র কয়েদী। এঁদের নৈতিক সংকট, মনোবিকার এবং আদর্শবাদ অনবদ্য রসব্যঞ্জনায় উদ্‌ঘাটিত কবেছেন লেখক।

'পাষাণপুরী'র অন্যতম সাহিত্য লক্ষণ-এর ভাষারীতি। উপস্থাপনায় মহা কাব্যিক গুরুত্ব সৃষ্টি এবং কাব্যগুণে, সংলাপে ঔপন্যাসিকের সহমর্মিতায় 'পাষাণপুরী'র অন্ধ পরিবেষ্টনীর থমথমে নিজনতায় প্রাচীরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি যেন কথা বলে—

ক "মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের লজ্জায়, বেদনায়, জীবধাত্রী বুঝি অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া লইতেছেন।"

খ. "অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকা হইয়া আসিল। লজ্জিতা জননীর মত আলোক-শিশুটিকে ধরণীর বুকে শোয়াইয়া দিয়া রজনী-মা ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলিয়া গেল।"

গ. "আবার ওই নির্মম পাষাণ-পুরীকেই বলে—'মুক্তি-মন্দির।"

ঘ. "পাপীর পাপ শাসনে পেষণে নিঃশেষ হয় না, ভয়ে সাপের মত মনের কন্দরে গিয়া লুকায়। শুধু লুকায়ও না, কন্দরের মাঝে আহত সাপের মতই আক্রোশে গর্জায়।"

ঙ "অন্ধকার', শুধু জানালার ফাঁক দিয়া একটা ক্ষীণ দীর্ঘ আলোকেব ধারা দিবসের বুকে ছায়ার মত লাগিয়া আছে।"

চ. "মৃত্যু যে চব্বিশ ঘণ্টা জেলখানার ভিতবে পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

ছ. "রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল,—এ লোকটার জীবনের বেদনার গান রচনা শুধু ওই বিলাপ—ওই কান্না; মানুষের ভাষা যেদিন হয়নি সেই দিনের মানুষের কাব্য এই; শ্রেষ্ঠ সত্য।"

জ. "সুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরিয়া শুধু ঝিল্লীব একটানা অবিশ্রান্ত চীৎকার আর নিজেদের নিঃশ্বাসের মধ্যে বুকের পুঞ্জিত ব্যথা।"

'পাষাণপুরী'তেই প্রথম তারাশঙ্কর উন্মুক্ত লোকজীবনের অলিখিত সাহিত্য সম্পদকে স্থান দিয়েছেন। লোকপ্রবাদ লৌকিক বাগ্‌ভঙ্গি নিম্নস্তরের কয়েদী চরিত্রের মুখে বসানো হয়েছে। একই কারাআবেষ্টনী ও কারাসংস্কারের মধ্যে থেকেও সমাজের নিম্নস্তরের মানুষগুলি অন্য ভাষায় কথা বলে। তাদের কথার মধ্যে আঞ্চলিক উপভাষার মতো সংস্কৃতির নানা দ্যোতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলাফেরা করে। চৈতন্য কেষ্টোর প্রত্যুত্তরে গান তৈরি করে—

"গোঁফ কামিয়ে মন্দোদরী ধরবে মুড়ো ঝাঁটা,
পবের নাবী হরণ করার দেখাবে মজাটা।"

ডাকাতি ও ব্যভিচারের অপরাধে দণ্ডিত দুর্দান্ত কয়েদী হতভাগ্য জীবনের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে ভরিয়ে রাখে কল্প প্রেম-তৃষ্ণার সংগীতে—

"লাল গামছা ডুরে সাড়ী কিনতে হবে হাটে,
বউটি আমার দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের ধারে মাঠে।"

'কয়েদীর আকাশ'[৪৯] বন্দীমনের মুক্তি সঙ্গীত। খাঁচার পাখি যেভাবে বনের পাখির সঙ্গে কথা বলে, গোপাল হালদারও সেলের মধ্যে বসে মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশটুকুর সঙ্গে কথা বলেছেন। অবশ্য বন্দীমনে মুক্তি স্বাদের যে তীব্রতা তা তিনি সম্ভবত গ্রহণ করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছ থেকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি চেতনার সত্য মিথ্যার বিতর্কে নেমে শেষে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সুরে সম্বোধন করে বলেছেন—'ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে', 'আমি কতদিনকার আত্মীয়ের দেখা পেলাম', আকাশের প্রশস্ততা মানুষের মনে মুক্তির স্বাদ এনে

দেয়—যে মুক্তি অনাদি কালের বাসনা।

গোপাল হালদার বদ্ধ জেল জীবনের মধ্যে যেটুকু আকাশের সন্ধান পেয়েছেন তাতে কাতর হয়েছেন। এক অনির্দেশ্য অস্থিরতা এবং যন্ত্রণাবোধ বন্দীজীবনের মধ্যে কোনো আশার আলোক দেখাতে পারেনি। লেখক রোমান্টিক কবির মতো জেল থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখেন—অনির্বচনীয় মুক্তি। কারামুক্তি নয়—এমন কি সামাজিক অর্থনৈতিক দাসত্বের মুক্তিও নয়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ মানুষকে উন্মুক্ত প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্তু মনোজগতে মুক্ত প্রকৃতির স্মৃতিরেশ থেকে গেছে। যে কোনো ধরনের সামাজিক বন্ধন যা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের পরিপন্থী রোমান্টিক কবিরা বিশেষ করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। গোপাল হালদার বর্তমান রচনায় প্রথম দিকে এমন একটা আক্রমণের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তারপর ক্রমশঃ তিনি তাঁর আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত মনকে যুক্তির কাছে পৌছে দিয়েছেন। এবং তখনই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের মুক্তির অন্বেষণ যেখানে পরিশীলিত ও শিক্ষিত মন প্রবন্ধের মতো যুক্তির পরম্পরা নিয়ে আঙিনা ও আকাশের সম্পর্ক আলোচনায় নেমেছেন। রচনাটি একটি ছোটগল্প হতে পারত, এমন কি আরও পরিমিত এবং কল্পনাসমৃদ্ধ হলে একটি দীর্ঘ কবিতা হতে পাবত। কিন্তু কল্পনাস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধের পাণ্ডিত্য গল্পের চলমানতাকে ভেঙে দিয়েছে। আত্মকথার মতো লেখক অনুভূতির সূক্ষ্ম তারগুলি বাজাতে সুরু করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ যুক্তির ধাতব কঠিন সিদ্ধান্ত গল্পের সীমাহীন কল্পনাকে রোধ করেছে।

বন্দীমনের উপর মুক্ত আকাশ রচনার শুরুতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সেখানে বিস্ময় ও খরস্রোতা কল্পনার প্রবহমানতা রচনাকে গল্পের নিকটবর্তী করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য রচনাটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধে পর্যবসিত হয়েছে।

'ডেটিনিউ'[৫০] এর লেখক অমলেন্দু দাশগুপ্তের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থের ভূমিকাংশে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখকের পূর্ণাঙ্গ পুস্তক চারটি– 'বক্‌সা কেম্প', 'ডেটিনিউ,' 'বন্দীর বন্দনা' ও 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ'। প্রথম তিনটি গ্রন্থই বিপ্লবীজীবনের পটভূমিকায় লিখিত।

'আত্মস্মৃতিমূলক বর্তমান গ্রন্থের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির রসাস্বাদনে লেখক যতখানি যত্নবান, আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্রতায় লেখক ততখানি আদর্শবাদী। গ্রন্থের

গুরু নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের ভীতি বিহ্বলতায়। এটি ইতিহাস গ্রন্থ বা জীবনবৃত্তান্তও নয়, বরং একটি বিস্মৃত বিপ্লবী সমাজের কথা যা লেখকের কাছে এক সময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে চরিত্র সৃষ্টিতে আত্মসান্নিধ্য ও আত্মবিচ্ছিন্নতার সমান্তরাল সুর ধ্বনিত। গ্রন্থটি স্বাধীনতা পূর্বসময় কারারুদ্ধ ডেটিনিউদেব কাহিনী। অধিকাংশ ডেটিনিউবন্দী শিক্ষিত মধ্যবিত্তেব একটি বড অংশ। ডেটিনিউ-এব বন্দীদশা তাদের শ্রেণীবিচ্যুত কবেছে। ফলে তাদের জীবন যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি বৈপ্লবিক। সংসার জীবনের নানা হিসাব, নানা চিন্তা এঁদেব সংকীর্ণ ও সংকুচিত করেনি। সাহিত্যিক অমলেন্দু চরিত্রগুলির 'মন মাতানো মজলিশ' সৃষ্টি করলেও জীবনাদর্শের কঠিন স্তবগুলিকে স্পর্শ করেননি।

লেখক কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের খবর দিয়েছেন। ঠিক চরিত্র সৃষ্টি নয়, চবিত্রেব নমুনা প্রদর্শন। যেমন বক্সা জেলেব এক মুসলমান যুবক বুখারী। লেখক চবিত্রটি সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। তাব জীবনের পূর্ব ইতিহাসও লিপিবদ্ধ কবেছেন, তাতে গল্পবস জমে উঠেছে। কিন্তু বুখারী চরিত্রের গভীবে তিনি প্রবেশ কবেননি। বক্সাদুর্গের আব একটি চরিত্র ডাক্তার গুরুগোবিন্দ, একটি টাইপ চরিত্র। তাব হৃদয়বৃত্তি, বন্ধুপ্রীতি এবং অস্বাভাবিকতা ঐতিহাসিক চবিত্রকে অতিক্রম করে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন কাল্পনিক চরিত্র হতে পাবত। বক্সাজেলের কিরণ মুখার্জী, টেগার্ট সাহেব, লর্ডসিনহা বোডের ফণিভূষণ দত্ত এবং সিউডী জেলেব এক সত্যাগ্রহী ভদ্রলোকের নিঃসঙ্গ চিত্র লেখক লিপিবদ্ধ কবেছেন।

'নির্বাসিতেব আত্মকথা' এবং 'দ্বীপান্তরেব কথা'য বর্তমান গ্রন্থের মতো কিছু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চবিত্র রয়েছে। 'ডেটিনিউ'-এব লেখক আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস লেখাব চেষ্টা করেছেন। অনেকাংশে কবিত্বপূর্ণ ভাষা অবশ্যই প্রশংসাব যোগ্য, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির জন্য যে গূঢ় অন্তর্দৃষ্টির প্রযোজন তা সকলের থাকে না। কারান্তরালে প্রাপ্ত চরিত্রগুলিকে অমলেন্দু দাশগুপ্ত তারাশঙ্করেব মতো গভীর সাহিত্যিক প্রজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হয়ে আঁকার চেষ্টা কবেননি। তাদের সুখ-দুঃখ ও ব্যথাবেদনার যে নিত্য সত্য বর্তমান. মনুষ্যত্বের মহিমা বা অবমাননার বিচিত্র লক্ষণ যেভাবে চবিত্রগুলিকে দ্বন্দ্বমুখর ও সংক্ষুব্ধ করে তোলে—বর্তমান লেখক তাব কোনো সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরেননি। যে রাজনৈতিক ঘটনাবলী তিরিশের দশকে ফবিদপুর, সিউড়ী, বক্সা, দেউলী এবং প্রেসিডেন্সি জেলে বিপ্লবের ঝড সৃষ্টি করেছিলো তার যথার্থ ইতিহাসটুকু লেখকের

দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী লিখেছেন,—"অমলেন্দু জানেন বিপ্লবীগণও জানেন যে চরিত্রগুলির প্রতিটি সত্তা এক একটি আগ্নেয়গিরি। অভ্যন্তরে তাঁদের গলিত লাভাস্রোত গর্জমান। যে কোন ক্ষণে বহ্নির উদ্‌গীরণ সম্ভব। বিরাট ধ্বংসের আগুন বুকে লুকাইয়া তাঁহারা সন্তর্পণে সমাজের মধ্যে দিয়া বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা মহৎ মৃত্যু, তাঁহারা মহৎ মুক্তি, তাঁহারা সৃষ্টির নমস্য।"[৭১]

কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাকে আত্মকাহিনীর জগতে ফিরিয়ে আনতে যতখানি মননশীল হওয়া প্রয়োজন; বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দৈন্য সেভাবে বিপ্লবী চরিত্রগুলিকে বিস্ফোরণের মুখে আনা হয়নি। আসল কথা—

"আবার অনেক সময়ে একটা অন্ধ-আক্রোশেও উত্তেজিত ও ব্যস্ত হইয়াছি। এই অস্তিত্বের পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্তরালে কোন রহস্য রহিয়াছে, একবার দেখিয়া লইতে চাহিয়াছি। কিন্তু আমি আমার নিকট ভয়ানকভাবে বন্দী হইয়া রহিয়াছি, কোনদিক দিয়াই মুক্তির সামান্যতম ছিদ্রপথ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারি নাই।"[৭২]

এই বোধ বন্দীজীবনে লেখকসত্তার এত সক্রিয় ছিল যে তিনি তার বাইরে এসে সত্যের নগ্নমূর্তি লক্ষ করেননি।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'মুখরবন্দী' ও 'বন্দীর মন' [৭৩] গ্রন্থদ্বয়ের সাহিত্য লক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা রূপরীতির প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। গ্রন্থ দুটির পত্রধর্মী স্বভাব বিভিন্ন মানসিক স্তরের দীপাবলী যেন। পত্রাকারে রচিত খণ্ড খণ্ড মানসিক চিত্রগুলি আসলে বন্দীমনের মুখর কল্পনা। গ্রন্থের শুরুতে লেখক বলেছেন—

"দেবতার ভাণ্ডার থেকে আগুন চুরি কোরে এনে মানুষকে তার ব্যবহার শিখিয়েছিল বোলে 'প্রমীথিয়ুস' হোলো দেবরাজের বন্দী। ককেশাশ পর্বতের নির্জনে শৃঙ্খলিত হয়ে রইলো সে। এক বিরাট ঈগল পাখী রক্ত পান কোরতো রোজ তার হৃৎপিণ্ড থেকে· · ·তারপর একদিন চৈতন্যের হোলো আবির্ভাব। যৌবনশক্তির চৈতন্য আপন ক্ষমতায় হোয়ে উঠলো অপ্রতিহত। 'হারকিয়ুলস' এর বিরুদ্ধতা করা দেবরাজেরও সম্ভব হোলো না। মুক্ত হলো দানববীর প্রমীথিয়ুস·········দূরদর্শী কবির কল্পনা এ"।[৭৪]

ভূপেন্দ্রকিশোর নিশ্চয়ই দেবতার ভাণ্ডার থেকে সম্পদ চুরি করেননি। তিনি দেশপ্রেমিক, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক—পেশোয়ার জেলে

শৃঙ্খলিত বন্দী। তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডের মানবিক স্পন্দনটুকু ঈগলপাখির মতো স্তব্ধ করতে চেয়েছে ব্রিটিশ কারার নির্মমতা। কিন্তু লেখকের কল্পনার মুক্ত আকাশে এসে মিশেছে বন্দীমনের শিল্প জিজ্ঞাসা। কোথাও জাতি দ্বন্দ্ব, কোথাও বিটোফেন, কোথাও বা—

"দুটো সেল্ পাশাপাশি। মাঝখানে একটা দোর রয়েছে; তার ওপর ঝুলছে সবুজ-খদ্দরের পর্দা। একটা সেলে আমি থাকি, আর একটা আমার বাথরুম। সেল দুটোর সামনে এন্টিসেল্। সেটাও আমার এলাকায়। সাকুল্যে ১২ × ১২ হাত জায়গার একচ্ছত্র সম্রাট আমি।"[৫৫]

লেখকের চৈতন্যস্রোতে একটি পাখী থেকে শুরু করে যিশু, অস্কার-ওয়াইল্ড, ডি. এইচ. লরেন্স সকলেই উপস্থিত। ব্যক্তিগত অনুভূতিশীল অনুভবের ব্যাপ্তি ও বিশালতা পাঠকের মনে ভূমা বোধ এনে দেয়। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতা—

"চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;
এইসব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে॥"[৫৬]

ভূপেন্দ্রকিশোরের লেখায় এমন একটি সুর আছে—

"ভোরের এ আলোকোচ্ছ্বাসের সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশী হয়ে উঠল বন্দীমন। ও যেন ছোট একখানি সম্পূর্ণ চিঠি। তেমন চিঠি, যার প্রত্যাশায় মন থাকে চঞ্চল।"[৫৭]

অথবা "এই যে অপরিমিত কালের জন্য অপরিমিত গতিবন্দনা, একে জীবনেও ভুলে যেতে পারবো না—কারণ, এ আমার বন্দীজীবনের হঠাৎ সূর্যোদয় হোক্ না ক্ষণকালের? কিন্তু এর প্রভাব আমার চিত্তে চিরকালের হোয়েই দেখা দিয়েছে।"[৫৮]

ভূপেন্দ্রকিশোরের বর্তমান গ্রন্থ দুটিতে জেলজীবনের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ খোঁজার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম। কেননা লেখক জেল জগতের বিচিত্র চরিত্র, অত্যাচার, নির্যাতন ইত্যাদি বস্তুনির্ভর নানা ঘটনা ও তথ্যের ইতিহাস রচনা করেননি। এমনকি ঐতিহাসিক যুগের ঘটনা পরম্পরার চিত্রাঙ্কনও তাঁর লক্ষ্য নয়। লেখক বন্দীমনের নিছক একান্ত অনুভূতিগুলিকে পত্রাকারে উপস্থিত করতে চেয়েছেন।

যে রচনার কেন্দ্রগ শক্তি আত্মমুখিনতা ও নির্লিপ্তি, যে চিন্তার বিচরণক্ষেত্র আপন চৈতন্যের কক্ষান্তরে—সেখানে বস্তুনির্ভর কারাসংবাদ আশা করা অনুচিত। বন্দীমনের স্তব্ধতার অনুষঙ্গে বিবর্তিত চিন্তাস্রোতের বিচিত্র রসভাষ্য বর্তমান রচনার লক্ষ্য।

ঙ. ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯৪২-১৯৪৭)

'জাগরী'[৫৯] সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস। ১৯৪২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'জাগরী' লেখা। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতবর্ষের বিদ্রোহী জনমনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা 'জাগরী'। রচনাটি যে রাজনৈতিক আদর্শের নানা বিপরীত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর গড়ে উঠেছে তার প্রমাণ উৎসর্গ পত্রের কথামুখ-"যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ জাতীয় ইতিহাসে কোনোদিনই লিখিত হইবে না, তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—"

'জাগরী'র পটভূমি বিয়াল্লিশের গণ আন্দোলন। কিন্তু কথাকেন্দ্র বাবা, মা, বিলু ও নীলুকেন্দ্রিক একটি পরিবার। পারিবারিক বন্ধনের উপর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আঘাত সৃষ্টি করে একটি পরিবারের কর্মাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে বহুমুখী সংঘাতের সৃষ্টি করেছে।

গ্রন্থের চরিত্রগুলি রাজনৈতিক সংঘাতে বিকশিত এবং চলিষ্ণু। বাবার ভাববাদী আদর্শের সুতীব্র বলিষ্ঠতা, মায়ের অন্তর ধর্মের স্নেহ ও কল্যাণবোধ, বড় ভাই বিলুর অহিংস গণ-আন্দোলনের বিশ্বাসলোপ ও সোসালিস্ট তত্ত্বের নবতর বিশ্বাস, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ এবং নীলুর উগ্র কম্যুনিস্ট মতবাদ চরিত্রগুলির রাজনৈতিক দিক। কিন্তু প্রতিটি চরিত্রই (নীলু ব্যতীত) জেলজীবনের মধ্যে থেকে অতীত জগতে ক্রম সঞ্চারিত।

'জাগরী' একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক উপন্যাস। এর চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও বস্তুত তারা লেখকের কারাভিজ্ঞতারই ফসল। রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে পারিবারিক স্নেহমমতার দ্বন্দ্ব গ্রন্থের ভূমিকেন্দ্র। প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ আদর্শে কেবল বিশ্বাসী নয়, একনিষ্ঠ। অনেকটা মহাভারতের চরিত্রের মতো এখানে চরিত্রগুলি রাজনৈতিক ঘটনা ও পারিবারিক বন্ধনে ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ায় বিক্ষত।

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধীর

নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস গণ-আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনেব অভিঘাতে কম্যুনিস্ট ও সোসালিস্ট চিন্তাব যে সংঘর্ষ সূচিত হয়েছিল তারই সাহিত্যিক ভাষ্য 'জাগরী'। লেখক ইতিহাসেব মধ্য দিয়ে বিপুল রাজনৈতিক কর্মধারা সমৃদ্ধ একটি পরিবারের আদর্শকে বিভিন্ন চরিত্রের চিন্তাভাবনাব মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ১৯৪৩ সালে মে মাসের এক রাতে পূর্ণিয়া জেলে ফাঁসিব আসামী বিলু, আপার ডিভিসনে বাবা, আওবৎ কিতায় মা আব রাতের শেষে কান্না ফটকে ছোট ভাই নীলু—এই চাবজনেব আত্মকথা বা স্বগত চিন্তাব মধ্যে দিয়ে একটি যুগের বাজনৈতিক ভাবতরঙ্গ প্রকাশিত হযেছে। বাবার জীবনমন্ত্র 'রঘুপতি রাঘব বাজা রাম'। এই গানেব মধ্য দিযে বাবার আত্মশক্তি এবং ভাবগত উচ্চতা প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে শান্তি ও অহিংসার বাণী আত্মস্থ করেছেন তা নীলু ও বিলুব চৈতন্য জগতে ভেঙে চুর্ণবিচুর্ণ হযে গেছে। বিলুব মা মাতৃস্নেহে, মমতায বিলুর ফাঁসিব আশংকায আর্তনাদ কবে বলেছে 'গান্ধীজী তুমি আমাব একি করলে?' জেল গেটে শেষ বাতে দাঁড়িয়ে নীলু আত্মসংকট ও আত্মযন্ত্রণার তটে দাঁড়িয়ে মানবতাব সমুদ্রগর্জন শুনেছে।

একটি সম্ভাব্য ফাঁসিকে কেন্দ্র করে চাবটি চবিত্রের স্মৃতিচাবণ উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাস, চবিত্রবিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব ও মনোবিকার, বাজনীতি ও সমাজঘটিত জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রহস্যময় প্রতীকের ব্যঞ্জনা 'জাগবী'র পটভূমি, পরিবেশ এবং কাহিনী বিন্যাসে তার রূপ-বীতি ও আঙ্গিকেব সামগ্রিক নূতনত্ব তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণভাবে অভিনব। কারাজীবন এবং কারাজগতের মধ্যে থেকে লেখক কল্পিত চাবটি চরিত্রেব মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে একটি বিপ্লবগন্ধী যুগের পাবস্পরিক আদর্শের সংঘাত, মান-অভিমান, আত্মসংকট, দ্বন্দ্বতাড়িত বাঙালী মানস কিশোরী সবস্বতীর নবানুরাগ—এক কথায় একটি পবিবারের দুর্দম কর্মপ্রবাহ যা অগ্নিময় এবং জীবন্ত। 'জাগবী'তেই প্রথম ব্যক্তি চেতনা, সমাজসত্য, রাজনৈতিক চেতনা এবং জীবনসত্য বাস্তবনিষ্ঠ ও সত্যবদ্ধ।

কংগ্রেস সংগঠনেব সমাজতন্ত্রের অপূর্ণতা গান্ধীবাদী বাবার হিংসালোভশূন্য মানবিক আদর্শ, মায়ের শাশ্বত মাতৃত্ব (যা সমাজ বাস্তবতারই অন্য পিঠ), চন্দ্রিমার সরলতা, নোরে সিং-এর আন্তরিকতা ও নিয়মানুবর্তিতা, বিধায়ক মিশিরের মতো ধূর্ত ব্যবসায়ী এমন আরো অনেক ছোট ছোট চরিত্র আছে যা মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে লেখকের কল্পনা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে একটি গভীর অন্তর্লীন মানবতার প্রত্যন্তে পৌঁছে দিয়েছে। স্মৃতির ভাবানুষঙ্গে অনুভূতির এমন সার্থক

সংযুক্তি কেবল কারাসাহিত্যে নয়, বাংলা কথাসাহিত্যেও দুর্লভ।

প্রধান চারটি চরিত্রে মানসিক অবস্থানের সঙ্গে লেখক সুকৌশলে মিলিয়েছেন তাদের বাস্তবগ্রাহ্য চরিত্রপট। নীলু উগ্র এবং গোঁয়ার, বিলু নীতি ও শৃঙ্খলায় স্থিতধী, বাবা গান্ধীবাদী আদর্শে একনিষ্ঠ, মা মাতৃস্নেহে বিহ্বল বাঙালী নারী। চারটি চরিত্রের অল্পবিস্তর জোয়ার-ভাঁটা একটি পরিপূর্ণ কাহিনী গড়ে তুলেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে 'জাগরী' কি কারাকেন্দ্রিক উপন্যাস? কেননা কারাজগতের মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে ঘটনাস্রোত এমন একটি স্তরে পৌঁছেছে সেখানে আগষ্ট আন্দোলনের মাদকতা আছে কিন্তু ব্রিটিশ কারার লৌহকপাট নেই। প্রশ্নটির দু'ধরনেব ব্যাখ্যা সম্ভব। প্রথমত 'জাগরী' কোন বিপ্লবীর কারাস্মৃতি নয়, সেখানে জেল প্রতিবেশ কাহিনীর একটি স্থায়ী অংশ। জাগরী এমন একটি কাহিনী যার মূল চরিত্রগুলি দাগী কয়েদী কিংবা কোনো ডেটিনিউ কিংবা কোনো যাবজ্জীবন দণ্ড প্রাপ্ত আসামীর আত্মস্মৃতির চর্বিতচর্বণও নয়। 'জাগরী'তে জেল-প্রতিবেশ অবশ্যই কাহিনীব স্থায়ী অংশ। কিন্তু যে তিনটি চরিত্র জেলজগতের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে এঁবা সকলেই উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের কক্ষচ্যুত অংশ। সুতরাং তাঁরা অতীত ঘটনা মন্থন করবে তাতে সন্দেহ কি? দ্বিতীয়ত, 'জাগরী'তে সচেতনভাবে জেলজগৎ রয়েছে উপন্যাসের মূলস্রোতকে পরিপুষ্ট করার জন্য। যেমন জেলে পুরুষ ও মেয়ে বিভাগে কয়েদীদের আলাপ আলোচনার বৈপরীত্য। নারী কয়েদীদের আলোচ্য বিষয় ব্যক্তি নিন্দা ও ব্যক্তি স্বার্থের আত্মকেন্দ্রিক গল্প। তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব মনোমালিন্য অত্যন্ত প্রকট। অন্যদিকে পুরুষ কয়েদীদের আলোচ্য বিষয় রাজনীতি ও ধর্ম। নারী কয়েদী যেখানে পারিবারিক জীবনের কুম্ভপাকে ঘূর্ণায়মান, পরনিন্দা ও পরচর্চা যাদের অজ্ঞতাকে নগ্নভাবে দেখিয়েছে সেখানে পুরুষ চরিত্র সমাজনীতির নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিব্যাপ্ত। যেমন বিলু উদার ও দার্শনিক নিরাসক্তির প্রতীক, তেমনি বাবা মানবধর্মের চিরন্তন বিশ্বাসে আস্থাশীল। নীলু আপাত অসহিষ্ণু একরোখা হলেও দাদার প্রতি প্রেম ও ভালবাসায় সে যেন আত্মঘাতী সমালোচক। মায়ের মনোবিকারের অবশ্যই একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে, যা বাদ দিলে চরিত্রটিকে অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু বিলুর আসন্ন ফাঁসি মায়ের আপাত মানসিক অসামঞ্জস্যের বিপদ প্রতিহত করে।

সতীনাথ ভাদুড়ী নিছক কারাজগতের তথ্য তুলে ধরার জন্য 'জাগরী' রচনা করেননি। একটি যুগের রাজনৈতিক চরিত্রগুলিকে যদি জেল প্রাচীরের লৌহ-

নিগড়ে অবরুদ্ধ করা না যায় তাহলে তাদের চিন্তাস্রোতের অর্গলমুক্তি ঘটে না। চরিত্রগুলিকে স্থিরচিত্রের মতো বিলুর ফাঁসির আগের মুহূর্তে পুর্ণিয়া সেণ্ট্রাল জেলে প্রতিষ্ঠিত না করলে 'জাগরী' একটি আধুনিক চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে পরিণত হত না। সুতরাং উপন্যাসের আঙ্গিক কৌশল এবং শিল্পরীতির স্বার্থে কারাজগৎ একটি জরুরী অনুষঙ্গ-এর অতিরিক্ত কোনো মূল্য থাক:ত পারে না।

বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা এবং অঙ্গসজ্জার দিক থেকে 'পাষাণপুরী' এবং 'জাগরী' সম্পূর্ণ পৃথক। 'পাষাণপুরী'তে জেলের নিরানন্দ পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের কয়েদীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রার কতকগুলি স্থির চিত্র আঁকা হয়েছে। জেল পরিবেশ অধিকাংশ কয়েদীর মনুষ্যত্বের শেষ নির্যাসটুকু কীভাবে ধ্বংস করে তারই কথা দেখা যায় মাত্র। অবশ্য অনশনব্রত মৃত্যুবরণকারী সুরু যেন অমানুষিক জেল প্রতিবেশের উপব বিদ্রোহের গান রচনা করে। 'পাষাণপুরী'র সঙ্গে 'জাগরী'র সাদৃশ্য অন্যখানে। দুটি গ্রন্থেই একই দোলাচল রাজনৈতিক যুগের প্রতিফলন ঘটেছে—"বিচারাধীন রাজ-বিদ্রোহীর দল! সম্মুখে দীর্ঘ কারাবাস, তবু ওরা এমন হাসি হাসে কি করিয়া! বিস্ময় জাগিবারই কথা! আবার ওই নির্ম্মম পাষাণ-পুরীকেই বলে মুক্তি-মন্দির!" ৬০" যেন 'জাগরী'র 'বাবা' চরিত্রের আভাস দেয়। অন্ধকার এণ্টি-সেলের দরজায় খুনী আসামীর তন্দ্রাহীন জাগরণ যেন বিলুর আসন্ন ফাঁসির উৎকণ্ঠার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এমনকি পাষাণপুরীর সূচনা অংশটির সঙ্গে জাগরীর সূচনা অংশের কাহিনীগত সাদৃশ্য না থাকলেও চিত্র ও সঙ্গীতধর্মে দুটি উপন্যাসে সাযুজ্য লক্ষণীয়। 'জাগরী'র কাহিনী পাষাণকারার বদ্ধ আবেষ্টনী থেকে রাজনৈতিক তরঙ্গ বিক্ষোভের সমকালীন ইতিহাসে ছুটে গেছে। 'পাষাণপুরী' অন্ধকারা-আবেষ্টনীর মধ্যে নিয়ত পিষ্ট মানব মূর্তিগুলি তুলে ধরেছে। যদিও তাদের অন্তর্জীবনের রহস্যময় গভীর মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলি তারাশঙ্কর তেমন ভাবে উদ্‌ঘাটন করেননি। মনস্তত্ত্বের-নির্জ্ঞান চেতনার তমোগহ্বরে প্রবেশ করলে অবশ্যই তারাশঙ্কর পাষাণপুরীর মধ্যে 'জাগরী'র মতোই আধুনিক জনকল্লোল শুনতে পেতেন। দুটি উপন্যাসের একটি বড় উপাদান কারাজগৎ ও তার কয়েদী-সমাজ হলেও জীবনরহস্যের টানাপোড়েনে 'জাগরী' বিশাল, ব্যাপক ও গভীর। ফলে 'জাগরী'তে এপিক রস যতখানি সুতীক্ষ্ণ 'পাষাণপুরী'তে তা প্রত্যক্ষগোচর নয়।

বনফুলের 'অগ্নি'৬১ মননশীল রাজনৈতিক উপন্যাস। 'জাগরী'র মতোই এর বিষয় ঐতিহাসিক আগষ্ট আন্দোলন। বন্দী অংশুমানের স্বীকারোক্তি

আদায়ের চেষ্টা বর্তমান কাহিনীর অন্যতম দিক। কারা কাহিনীগুলিতে জেল-আবেষ্টনীর মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীর কাছ থেকে কথা বার করার এ রকম কূট-কৌশল আমরা আত্মকাহিনীমূলক কারাবিবরণীতে কম দেখেছি। বর্তমান কাহিনীতে জেল পরিবেশের বিবরণটি যথাযথ। উপন্যাসের নায়ক অংশুমান ইলেকট্রিসিটির ইতিহাস বিষয়ক যে গ্রন্থটি পাঠ করার সুযোগ পেয়েছে তাকে লেখক রাজনৈতিক আবর্তের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় টেনে এনেছেন।

অংশুমানের জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা চেতনার ভিত্তি দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যে গড়ে উঠেছে। ফলে নৈতিকতা ও রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সে ব্রিটিশ রাজশক্তির অপমানজনক সন্ধি করতে রাজী নয়। যে আপস জেলের ডেপুটি, কম্যুনিস্ট মতাবলম্বী নীহার সেনকে কৌশলগত দিক থেকে গ্রহণ করিয়েছে। লেখকচরিত্র প্রধান বর্তমান উপন্যাসে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের সঙ্গে কম্যুনিস্ট মতাদর্শের বিচ্যুতিটুকু দেখাবার চেষ্টা করেছেন—

"চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটাকে লঘু-হাস্যভরে উড়িয়ে দিলেন যখন নীহার সেন, তখন অস্তরার দাম্পত্য-নীড়ের শেষ খড়টুকুও যেন উড়ে গেল।"[৬২] অংশুমান যেন স্বপ্রস্তুত জাতীয় চৈতন্য। তার স্খলন, পতন বা বিচ্যুতির প্রশ্ন ওঠে না। সে মেরুদণ্ড শক্ত করে—

"সহসা চিৎকার করে বলে উঠল অংশুমান, তবু ভয় খাব না, তবু অন্যায় সহ্য করব না, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা নেবই।"[৬৩]

কেন না লৌহকারার পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে অংশুমানের অন্তর্জগতে এক চির অনির্বাণ অগ্নি কথা বলে যাকে ভয় আবৃত করলেও ধ্বংস করতে পারে না, অর্থাৎ অংশুমানের আত্মত্যাগ ও দেশাত্মবোধের সঙ্গে নীহার সেনের কমিউনিস্ট বিবেক সংকীর্ণ ও স্থূল, যা তার স্ত্রী অস্তরাও বুঝতে পেরেছে। নীহার সেন অংশুমানের বিপরীত তটে দাঁড়িয়ে জাতীয় চেতনার প্লাবনকে দূর থেকে লক্ষ্য করে, অংশগ্রহণ করে না।

এবং শেষে অস্তরা যখন রাজনৈতিক হত্যার অভিযোগে ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত আসামী তখন সে ফাঁসির মঞ্চে অংশুমানকে আবিষ্কার করে ও কম্যুনিস্ট নীহার সেনের ফাঁকিটুকু সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারল। কারাজগতকে কেন্দ্র করে 'জাগরী'র চারটি চরিত্রের উক্তিও স্বাধীন ক্রিয়াকলাপে উন্মুক্ত। লেখক সেখানে স্বভাবতই কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি। নীলু কম্যুনিস্ট হলেও, এমনকি বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করলেও সে

নীহার সেনের মতো ফাঁকা বস্তুবাদী কম্যুনিস্ট নয়। নীলুর চরিত্রের এমন একটি গভীরতা আছে যে গভীরতা নীহার চরিত্রে দুর্লক্ষ্য। অন্যদিকে নীহার সেন অংশুমানের রাজনৈতিক প্রতিযোগী নয়। যেমন নীলু দাদার প্রতিযোগী রাজনৈতিক শক্তি। জাগরীতে রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংঘাত যতখানি তীব্র বনফুলে ততটা তীব্রতা পায়নি। অম্বরার চরিত্রে ·সংকট সামান্য আরোপিত হলেও অংশুমান ও নীহারের মধ্যে কোন মনস্তাত্ত্বিক সংকট নেই।

অংশুমানের স্মৃতিমন্থনের সঙ্গে বিলুর মনোজগতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু বিলু যে রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত সেখানে অংশুমান আচ্ছন্ন 'অনির্বাণ অগ্নির' যাদুস্পর্শে। কারণ বনফুলের লেখনী উপন্যাসের চেয়ে গল্প লিখতে বেশি আগ্রহী। অংশুমানের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে পর্যায়ে একটি গভীর ঔপন্যাসিক উচ্চতা সৃষ্টি করতে পারতো বনফুলের সরল লেখনী সেই কৌশল গ্রহণ করেনি।

চ. স্বাধীনতা উত্তরকালীন প্রকাশিত কারাগ্রন্থ

(গ্রন্থগুলির রাজনৈতিক ঘটনাকাল স্বাধীনতা-পূর্বকাল বলেই বর্তমান আলোচনায় গৃহীত হলো।)

স্বাধীনতা উত্তরকালে ব্রিটিশ কারার অন্ধার মেখে প্রকাশিত হয়েছে অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি-কেলাস'৬৪ গ্রন্থটি, যথার্থ অর্থে উপন্যাস নয়। স্বাধীনতা পূর্ব রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিফলনও বর্তমান গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়নি। লেখক 'সমুদ্রের বাঁধ', 'পঞ্চম বাহিনী', 'পাতালের মানুষ', 'সিকমান', 'বিশনম্বর', 'আশমান ও জমিন', 'নটেগাছটি' নামক সাতটি পৃথক পৃথক শিরোনামায় 'বি-কেলাসে'র সামগ্রিক কথা তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি প্রকৃতই কোন সাহিত্যিক রীতির মধ্যে আসন গ্রহন করতে পারে সে বিষয়ে লেখক সূচনা অংশে বলেছেন— "উপন্যাস লিখতে গেলে স্বপ্নের বুনুনী ছিঁড়ে যায়। বিবরণ দিতে গেলে ঘটনার বাঁধুনি থাকে না। কাজেই আমি বলছি কথা-উপকথা নয়, ইতিহাস নয়, শুধু কথা।" অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যিনি এক চোখে বস্তু দেখেন তিনিই অন্য চোখে স্বপ্ন দেখেন, সে মানুষ উপন্যাস রচনায় সার্থকতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম। কিন্তু স্বপ্নের বা ঘটনার বুনুনী যিনি অক্ষত রাখতে চান তিনি কেমন করে উপন্যাস লিখবেন, এ প্রশ্ন সংগত। 'বি-কেলাস' উপন্যাসের মর্যাদা না পেলেও একে শুধু কথা বলা যায় না। এখানে কয়েদী সমাজের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, স্থূলহাস্য

পরিহাস, দেহাসক্তি, অতীত জীবনের পঙ্কিলতা, প্রেম-ভালবাসা, অর্থ নৈতিক বিপর্যয়, মনুষ্যত্বের বিকৃতি-নিষ্ঠুরতা, পশুত্ব, ভণ্ডামি, নীচতা, যৌনবুভুক্ষা, একাকীত্ব, নৈতিক সংকট নানাভাবে লেখক তাঁর মর্মান্তিক কারাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনুভব করেছেন। অতীন্দ্রনাথের লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন জেল কাহিনী ও জেল চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কারাজগতের সংগীত রচনা করা।

আলোচ্য পুস্তকটি সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার মতামত উদ্ধারযোগ্য— "পটভূমিকা, পরিপ্রেক্ষিত, বিচার, রঙ, রেখা ও কল্পনাবোধ কোনটিই শিল্পসীমা অতিক্রম করে নাই। সরু মোটা তুলির টান পরিমিত এবং ক্ষিপ্ত করাঙ্গুলির লীলা সমানই বিস্ময়কর। ছবিগুলি উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও জীবন্ত।··· ·· বি-কেলাস খণ্ড অংশের প্রকাশে কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন গল্প নহে—তথ্যের গুরুপাকে গুরু প্রবন্ধ সমষ্টিও নহে, পরশাসন পর্যুদস্ত একটি সুপ্রাচীন জাতির জীবন ধারার সন্ধান ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।"[১৫]

'বি-কেলাসে' নানা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক স্তরের মানুষ ভিড করেছে। এদের কারো সঙ্গে লেখকের আত্মীয়তা আছে কারো সঙ্গে নেই। কিন্তু আত্মীয় অনাত্মীয় প্রশ্ন এখানে অবান্তর। লেখক মনস্তত্ত্বের গভীর রন্ধ্রগুলি উন্মুক্ত করছেন চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। যেহেতু এটি একটি নিটোল উপন্যাস নয় তাই চরিত্র ও ঘটনার বিশ্লেষণ ও বয়নকৌশল তেমন কোনো মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ সৃষ্টি করে না যার তরঙ্গ-সংক্ষোভে কাহিনী পরিণতি-মুখী হতে পারে। লেখকের ত্রুটি হলো তিনি কোনো একটি চরিত্রকে বিশ্লেষণমুখর একটি বিশেষ বিন্দুতে পৌঁছে দেবার পর সে চরিত্র-পরিণতির দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন না। চরিত্রগুলির অঙ্কন কার্যে, ঘটনার বিশ্লেষণে তিনি প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মত কাহিনীর বিশালতা, ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিকে নজর দিলেও যেহেতু তাঁর লক্ষ্য কেবল কথা বলা, কাহিনী বয়ন নয়— তাই বিশেষ একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার মুখোমুখী এনেও চরিত্রের পরিণতি-ক্রিয়ায় তিনি ব্যর্থ।

'বি-কেলাসের' বিশেষ গুণ হল কারাজগতের নিম্নস্তরের মানুষগুলির নৈতিক জগতকে লেখক তন্ন তন্ন করে দেখেছেন। দাগী আসামী, খুনী, ডাকাত এমন কতো অপরাধী চরিত্র রয়েছে যাদের মনোজগতের নানাকথা লেখক অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এক ধরনের লোক-সাহিত্যের প্রতি লেখকের আগ্রহ। সাধারণ কয়েদীসমাজে অলিখিত বিচিত্র

সাহিত্যসৃষ্টির লৌকিক ঝোঁক অতীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। এমন কি সেই লোকসংস্কৃতির অমার্জিত, স্থূল অথচ প্রাকৃত অবিকৃত রূপটিকে গ্রহণ করতেও তিনি ভোলেননি।

কারাজগতের লৌহকঠিন অমানবিক জেলব্যবস্থা অধিকাংশ কয়েদীকে পশু করে তোলে। তবু এই বীভৎসতা ও যন্ত্রণার মধ্যে মানবমনের চিরন্তন অনুভূতি তাদের অন্ধকার জীবনে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা যোগায়। এমন অনেক কয়েদী আছে যাদের কোনোদিনই মার্জিত সুস্থ সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু একঘেঁয়েমি ও নিরানন্দের মুহূর্তগুলিকে তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততায় বেঁধে ফেলেন। ভাব, ভাষা এবং বিষয় বৈচিত্র্যে এ ধরনের সৃষ্টি কার্যে অবদমিত কামনার প্রতিফলন ঘটলেও তাতে নিছক আদিরসের সংবাদ থাকে না। জেল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বা বিশেষ কোনো জেলকর্মচারীর বিরুদ্ধে, অথবা নারী ও পুরুষের চিরন্তন কামনাবাসনা কেন্দ্রিক এক ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা কোনো কোনো প্রতিভাবান কয়েদীর মুখে তৈরী হয়। বন্দীরা মুখে মুখে গান, কবিতা বা ছড়া তৈরি করে। এই সব সৃষ্টির মধ্যে বন্দীজীবনে কারাব্যবস্থার অমানুষিক চাপ প্রকাশ পায়। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে যদি সমাজ-শৃঙ্খলার অজুহাতে অবরুদ্ধ করা হয় তবে বন্দীমনে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া আসতে পারে তার সাহিত্যিক প্রতিফলন ঘটে আলোচ্য কবিতায় বা ছড়ায়।

'পাষাণপুরী' এবং 'বি-কেলাসে' কয়েদী জীবনের এই জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির নানা প্রচেষ্টা দেখানো হয়েছে। লেখাগুলিতে কোথাও কবিতা বা গানের স্থূলতা, অশ্লীলতা, যৌনকামনা, কোথাও বা জেলজীবনের মধ্যে থেকে কল্পিত প্রিয়াসঙ্গের আকুতি মিশে রচনাগুলিতে কয়েদীমনের নগ্ন অনুভব লক্ষ করা যায়। যেমন 'পাষাণপুরী'র নির্ভীক বন্দী নরু—"ছাদ হইতে খসিয়া পড়া পলেস্তারার একটা টুকরা দিয়া নরু মেঝের উপব দাগ দিতে দিতে লিখিতে লাগিল—

"মানুষের ভয়,—
সে-ত কভু মরণকে নয়!
দুর্ভেদ্য তমসা-মাখা আবরণ তার
ভয় সেই, ভয় শুধু তারে অজানায়।"[৬৬]

এই কবিতা নরু উদ্ধার করেছে নিঃসঙ্গ জেলজীবনের মধ্যে বাস করে। কিংবা সাইদ, কেষ্ট, চৈতন্য, গোর, ওহিদ এবং জোবেদ এমন কয়েদীরা এক সঙ্গে বসে

জেলের মধ্যে কবিগানের ঝড় তোলে—

"জেলের মধ্যে কবিগান হয়ই বারো মাস,
গণশা শালার বদলে আজ গাবেন কেষ্ট দাস,—
আপনারা দেবেন গো সাবাস !"[৬৭]

'বি-কেলাসে' কয়েদীদের সামান্য খাদ্যদ্রব্য চুরি করে যে বেপরোয়া ব্যবসা চলে তা বুভুক্ষু কয়েদীর কাছে গান হয়ে ধরা দেয়—"নিত্যিকার মত মকবুল আজও কাসছে আর গাইছে পাশের সেল-এ—

খাওয়া-কারা বিদায়ঘটা বিরাট আয়োজন
এককাঠা ডাউল এককাঠা ভাত তাতে খুসী মন
মোদের মতন পরম সুখে কে আছে ভাই মণ্ডলে
জেলখানাতে দুঃখে আছেন কেয় বলে ?"[৬৮]

মালদার ছিরা মণ্ডল টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে পরকীয়া প্রেমের ঘুমপাডানী গান ধরেছে—

"টিপির টিপির জল পড়িছে বাইরে ভিজে কে ?
বাড়ির পাছে মানের গাছ কাইটা মাথায় দে।"[৬৯]

কিন্তু পরকীয়া রতির এতো সাহিত্যিক আয়োজন কয়েদীদের সন্তুষ্ট করে না। তারা দেহতত্ত্বের মদিরা পান করতে চায়। শেষে কবিতা হয়ে উঠে নারীদেহের যাবতীয় সংবাদ—

"অশোক পাতা কলমীর লতা মাঝ দরিয়ায় ভাসি লো।
এবার ম'রে সূতা হব
তাঁতিদেরও ঘরকে যাব
ছোট ছোট সেমিজ হয়ে তাদের বুকে থাকবো লো।"[৭০]

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী অতীন্দ্রনাথ বসুর মতো কারাগারে মনের অবচেতন স্তর নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তিনি ৪৪ ডিগ্রী সেলে অবরুদ্ধ ছিলেন—"৪৪ ডিগ্রীর যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে সাধারণ লোক কিছু দিনের মধ্যেই চোখে সরিষার ফুল দেখিত।"[৭১]

তাঁকে এবং কয়েদীদের পাথর মেশানো ভাত দেওয়া হত, তিনি রসিকতা করে লিখেছেন—'কোনটা বেশী ছিল বলা কঠিন' এবং এই শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশেই তিনি দুঃখের ভার লাঘব করতেন ছড়া কেটে।

"লিখিবার জন্য আমাদের কাগজ-কলম কিছু ছিল না—মুখে মুখেই কবিতা

তৈয়ারী করিতে হইত এবং পরে চীৎকার করিয়া পরস্পরকে শুনাইতাম। প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কবিতা তৈয়ার করিতেন। আমাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছেন—'যদি মহারাজ না আসিত।'[৭২]

আন্দামানে নির্বাসন-আজ্ঞা আসার পর সেলের দেয়ালে তিনি সুরকী দিয়ে লিখেছিলেন…

"বিদায় দে মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে,
এই প্রর্থনা করি মাগো মনে যেন রেখ সন্তানে।
আবার আসিব ভারত-জননী মাতিব সেবায়,
তোমার বন্ধন মোচনে মাগো যেন এ প্রাণ যায়।
বিদায় ভারতবাসী, বিদায় বন্ধু বান্ধবগণ
বিদায় পুষ্প-তরুলতা, বিদায় পশু পাখীগণ।
ক্ষমো সবে যত করেছি অপরাধ জ্ঞানে অজ্ঞানে,
বিদায় দে মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে।"[৭৩]

সহজ পদ্যবন্ধে দুঃখের সারসংক্ষেপ উন্মুক্ত হয়েছে ভারত-জননীর জন্য প্রার্থনার পদ লিখে। তাঁর রচনাগুলিতে রাজবন্দীর প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো সহজ সরল রসিকতার অন্তরালে দুঃখের চিত্র আছে। অতীন্দ্রনাথের কয়েদীসমাজ ত্রৈলোক্যনাথের মতো সরল নয, তারা মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে যেখানে সুপ্ত হয়ে থাকে অবদমিত কামনা।

জেলজীবনের গাঢ় অন্ধকার, 'মনটনি' খাদ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি ও কারাব্যবস্থা —এগুলির খুঁটিনাটি বর্ণনায় লেখক অতীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আগ্রহী। তিনি এমন সব চরিত্র তুলে এনেছেন—যারা সংসার সীমান্তের বাসিন্দা। সংসারের প্রত্যন্তে তারা নিয়ত দাঁড়িয়ে থাকে অনার্য উপজাতির মতো। মদ, কামিনী-কাঞ্চন তাদের নিত্য সহচর হলেও ব্যাধি ও ক্ষুধার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বাঁধা তাদের ঘরকন্না—

"বিস্যতে পরবে নাচগান আছে, বাজি রেখে মোরগের লড়াই আছে, পচাই মদের দোকানে দিল খোলা হল্লা আছে—মরণও দারিদ্র্যের ভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়।"[৭৪]

নিম্নস্তরের কয়েদী জীবনগুলি কারাজগতের অভ্যন্তরে একটি নতুন মানবসংসার সৃষ্টি করে।[৭৫] সেই সংসারের সঙ্গে মার্জিত সভ্য জগতের নিশ্চয়ই একটি বড় ব্যবধান আছে। সুমার্জিত সভ্যজগতের সঙ্গে এই কারাসংসারের মিল বা অমিল

কতখানি তার নানা বিচিত্র চিত্র পর পর সাজিয়েছেন লেখক। এখানে ঘুসঘুসে জ্বর, খুসখুসে কাসি ও নানাজাতির সুখদুঃখ যে বিচিত্র ঐকতান সৃষ্টি করে তা শোনার জন্য লেখক কারাগারের অন্ধ গবাদে কান পেতেছেন। এবং একে একে উঠে এসেছে মান্নু, ভিখনলাল, সুনীল, মোতি, শ্যামলাল, মদন এমন কতো বিচিত্র মনস্তত্ত্বের মানুষ। কেউ অত্যাচারী, কেউ ভণ্ড, কেউ কাপুরুষ, কেউ পরশ্রীকাতর, কেউ প্রতিহিংসাপরায়ণ, কেউ বা অসামাজিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। লেখক সুনীল-লাবণ্য-মোহিতের যে উপকাহিনী সৃষ্টি করেছেন প্রেম ও কামনার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে তার পৃথক গল্পমূল্য রয়েছে। অন্যদিকে শীর্ণ এরফানের ঘানিটানা, ডাক্তার গণিরস-রাজের লোভ ও রক্তশোষক মনোবৃত্তি কয়েদী সমাজকে ক্ষুধাতুর ও কামাতুর করে এক স্থায়ী ক্রীতদাসে পরিণত করে—এমন কত কথা এই গ্রন্থের নানা অংশে ছড়িয়ে রয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এর দার্শনিকতা। লেখক তাঁর জীবনের নানা উত্থান পতনের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন—যে ব্যাখ্যার মৌল প্রেরণা কখনো রুশো, কখনো শরৎচন্দ্র, কখনো বেদান্ত কখনো বা আইনস্টাইন।

গ্রন্থের 'আসমান ও জমিনে' অংশে লেখক সহজিয়া নাথ ধর্মের দেহাত্মবাদী দর্শনের অবতারণা করেছেন। গোরক্ষবৃত্তের যে লৌকিক কাহিনী এক শ্রেণীর হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত লেখক তাকে উদ্ধার করেছেন কারাভ্যন্তরে আসঙ্গ-লিপ্সার গজল গানে। দেহাসক্তির এমন তীব্রতা কেন যে লেখক লোকঐতিহ্যের দেহতাত্ত্বিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত করে কাম ও প্রেমের নিত্যতত্ত্ব প্রচার করলেন—তা বোঝা যায় না।

'বি-কেলাস' এ কারণেই সম্ভবত উপন্যাস হতে পারল না; কেন না ঘটনা, চরিত্র ও প্লটে যে সংহত রূপ বর্তমান গ্রন্থে প্রাপ্তব্য ছিল লেখক তার রসাভাস ঘটিয়েছেন।

রানী চন্দের 'জেনানা ফাটকে'র [৭৬] সাহিত্যিক মূল্য যতখানি, ঐতিহাসিক মূল্য ততখানি নয়। গ্রন্থটি লিরিকধর্মী। লেখিকার নারীসুলভ কোমলতা গ্রন্থের মৌল ছন্দ। এখানে নারী কয়েদীর চোখ দিয়ে জেলজগৎ দেখা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন জেলের উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী, কারাব্যবস্থা, নিত্য-নৈমিত্তিক জেলজীবনের নানা গল্প-কথা স্থান পেয়েছে তেমনি অভিজাত পরিবারের গৃহিনীসুলভ বর্ণনার নানা খুঁটিনাটি কাহিনীর গল্পরস বৃদ্ধি করেছে।

লেখিকা নানা চরিত্রের চিত্রশালা সৃষ্টি করলেও তিনি চরিত্রগুলির অবচেতন জগতে প্রবেশ করেননি। ইন্দুমতী, দাসীপুণি, শান্তি, নন্দিতা, এলা, ভবানী, মমতা, মিছিরন, নেছামন এমন জেনানা চরিত্রের অম্লমধুর স্মৃতিকথা পরিবেশন লেখিকা রানী চন্দের লক্ষ্য।

ভ্রমণ কাহিনীর মতো এখানে জেলজগতের বিচিত্র নারী চরিত্রের বর্ণনা এসেছে কিন্তু চরিত্রগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেনি। বন্দীজীবনের স্মৃতিচারণে বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের কোনো সংবাদ এখানে নেই। চরিত্রগুলি স্বাভাবিক, স্নিগ্ধসরস, স্বচ্ছন্দ ও মানবিক মূল্যবোধের দায় ও দায়িত্বে সমৃদ্ধ। মিলনী-মা, কার্তিক সর্দার, মায়া এবং রাজসাহী জেলের সাধারণ বন্দীরা যারা বেশির ভাগই জাতি ধর্মে মুসলিম নানা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছে, তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্না-ভরা হৃদয়টুকু আস্বাদ করতে চান লেখিকা, ব্যাখ্যা করতে চান না। এতে এক ধরনের ব্যক্তিপন্থী আত্মস্মৃতি সৃষ্টি হয়েছে।

কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক 'জেনানা-ফাটকে'র আঙ্গিক ও বিষয়-বস্তু সম্পর্কে বলেছেন—

"বিভীষিকার চেয়ে বরং হাওয়া বদলের আমেজ বেশী"[৭৭]

—এই মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা জেলজগতের বীভৎস চিত্র লেখিকার দৃষ্টিগোচর হলেও তাঁর শিল্পীমন সেই বীভৎস রসের প্রতি আসক্ত নয়। ব্রিটিশ কারার নির্মম চিত্র বিশেষ এক বাক্ ভঙ্গিমায় রানী চন্দ তুলে ধরেছেন—

"ভাবী আর মায়া উঠে পড়েছেন, আমিও উঠে বসলুম। জমাদার ঢুকল জেনানা ফাটকে তিনজন পুরুষ কয়েদী নিয়ে। আগের মতোই মুখ নিচু ক'রে পরপর লাইন সমান রেখে এগিয়ে এল তারা। প্রথমটি ভারী, কাঁধে খাব'র জলের বাঁক, দ্বিতীয়টি মেথর দুহাতে দুটো কেরোসিনের টিন, তৃতীয়টি পাচক, তার হাতের টিনে 'মাড়ি'—কয়েদীদের ফেনাভাত। ভাবী খানিকটা মাড়ি এনে ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন। বললেন—রাখি দিই কিছুটা, নয়তো খিদা পেইলে খাবা কি?"[৭৮]

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাঁকে বেশী দিন সহ্য করতে হয়নি। জেলজীবনে তাঁর একটু মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছে—

"ইংরেজী খবরের কাগজ পাই, লাইব্রেরির বইও মেলে মাঝে মাঝে। খাওয়া, বসা, শোওয়া, পড়া, গল্প, গান দিয়ে গোটা দিনের সব সময়টা একরকম বেশ ভাগ ক'রে নেওয়া গেছে।"[৭৯]

সুতরাং যদি বাস্তবে হাওয়া বদলের পরিস্থিতি থাকে তবে নিশ্চয়ই স্মৃতি-কাহিনীকে তার মিথ্যাচার বলা চলে না। গ্রন্থটির আন্তর-কাঠামো নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় লেখিকা কারাবাসকালে দিনলিপি লিখতেন। তা না হলে চরিত্র-গুলির এত নিখুঁত বর্ণনা কেবলমাত্র কল্পনার রং তুলিতে গড়ে উঠতে পারে না।

গ্রন্থটির কয়েকটি ঐতিহাসিক দিক লক্ষণীয়। নারী কয়েদীর এমন নিখুঁত চিত্র একমাত্র কৃষ্ণা হাতি সিংহের 'ছায়া মিছিল' বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্যে খুব অল্পই আছে। কারাজগতের অন্তঃপুরে নারীসমাজের কলধ্বনি সাধারণ কয়েদী সমাজের থেকে অবশ্যই পৃথক। সুখ দুঃখের ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে তারা জেলজগতের নতুন একটি সংসার গড়ে তোলে। যে সংসারে আকাঙ্ক্ষিত গৃহস্থ জীবনের প্রতিধ্বনি নারী কয়েদীর শূন্যতাবোধকে আরও তীব্র করে।

'বাইশ' পরিচ্ছেদে জেলখানায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের একটি সুন্দর চিত্র উল্লিখিত আছে। নারী সমাজের চেতনা, নির্ভীকতা, স্বাধীনতাস্পৃহা এবং বলিষ্ঠ জীবনবোধ বর্তমান পরিচ্ছেদে এলা, লাবণ্য নন্দিতা ও মায়ার অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অবশ্য কারা প্রাচীরের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে নিসর্গ বর্ণনার লিরিক প্রবণতার সঙ্গে চরিত্র, ঘটনা, এবং কারাব্যবস্থার খুঁটিনাটিতে কোন শিল্পসঙ্গতি নেই। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের নিসর্গচেনতা এক গভীর মননশীলতার সক্রিয় অনুসঙ্গ বলে নিসর্গ প্রকৃতি জেলজীবন বিচ্ছিন্ন নয়। রানী চন্দে নিসর্গ এসেছে নিছক বর্ণনার দাবী পূরণের জন্য। নিসর্গ প্রকৃতি ও জেলজীবন একাত্ম হয়ে ওঠেনি। এর উপর খণ্ড, বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি কোন সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি না করায় গ্রন্থটি সঙ্কলন গ্রন্থের মতো পরম্পরাহীন। কারাজগতের বিস্তৃত তথ্য থাকা সত্ত্বেও 'জেনানা ফাটক' কোন পূর্ণাঙ্গ আত্মস্মৃতি বা জেলস্মৃতি অথবা কোন সুখপাঠ্য কথাসাহিত্য হয়ে ওঠেনি।

কল্যাণী ভট্টাচার্য রচিত 'জীবন অধ্যায়নে'র[৮০] ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ মন্তব্য করেছেন—

"কল্যাণীর বইথানিতে পাই আর এক তথ্য ; অতি সাধারণ অশিক্ষিতা নারীদের অবদানও এক্ষেত্রে কম নয়। বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান—কত সামাজিক স্তরের নারী এই জেলের পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে—দেখে বিস্মিত হয়েছি। শুধু গ্রন্থ রচনার নৈপুণ্যে নয়, বুকের রক্ত দিয়ে যেন কল্যাণী এই সব ভুলে যাওয়া নাম-হারা মেয়েদের কাহিনী রচনা করেছেন।"

প্রকৃতপক্ষে 'জীবন অধ্যয়ন' স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের এক নারীর দেশের জন্য মরণ-যজ্ঞে আত্মসমর্পণের কাহিনী। জীবনটা নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল স্বাধীনতার উদ্দাম আহ্বানে। তাই 'জীবন অধ্যয়নে' কেবল চোখ দিয়ে দেখা স্মৃতিকথা ব্যক্ত হয়নি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা রক্তাক্ত স্মৃতির অশ্রুসজল বেদনাসিক্ত কাহিনী—'জীবন অধ্যয়ন'। সেই অর্থে গ্রন্থটি অগ্নিযুগের স্বাধীনতা-কামী এক বীরাঙ্গনার মুক্তিসঙ্গীত। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী বাংলার নারী সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য দলিল 'জীবন অধ্যয়নে'র মধ্যে দিয়ে লেখিকা আমাদের বিস্মৃতপ্রায় অতীতের অত্যাচারের কালো পর্দা চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে জীবনযাত্রার সুরু তার সমাপ্তি ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। ছ' বছরের অন্তরীণ কারাজীবনের অশ্রুসিক্ত জীবন কীভাবে লেখিকার স্মৃতির মণিকোঠায় জীবন্ত হয়ে রয়েছে তা পাঠ করলে বিস্মিত হতে হয়। আলোচনাকে মুখ্যত কারাশাসনের পদ্ধতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। লেখিকার বর্ণনীয় বিষয় কারাগারের শাসন প্রণালী, অত্যাচার, শোষণ, শৃঙ্খলা এবং অগণিত বন্দীর সুখের বুকফাটা আর্তনাদের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা—

"জেলখানায় ঢুকে মনে হয়—চারিদিকে একি দৈন্য—একি গভীর অন্ধকার। কারুর মুখে এতটুকু হাসির রেখা যেন ফুটে ওঠে না—কারুর জীবনে এতটুকু বসন্তের হাওয়া দোল দিয়ে যায় না। কেবলই জীর্ণতা—শুষ্কতা।"[৮১]

কারাজীবনের দৈন্য, অন্ধকার এবং শুষ্কতাকে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তির মধ্যে তুলে ধরেছেন—

"অনন্ত নরকের কল্পনা হিংস্র বুদ্ধির চরম প্রকাশ—সেই নরকের আদর্শ সভ্য মানুষের জেলখানায় আজও বিভীষিকা বিস্তার করে আছে। সেখানে শোধন করবার নীতি নেই, আছে শাসন কববার হিংস্রতা।"[৮২]

জেলখানায় জেল কর্তৃপক্ষের পাশব পীডনের মর্মন্তুদ চিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি কেবল ব্রিটিশ কারাগার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, সভ্যতার সামগ্রিক কলঙ্ক সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

লেখিকা প্রেসিডেন্সি জেল, হিজলী জেল, বহরমপুর জেল, মেদিনীপুর জেল ও বোম্বাই জেলে বন্দীজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ সম্পর্কে একটি বিষয় ম'ন রাখা প্রয়োজন গ্রন্থটি ঐতিহাসিক যুগ ও ঘটনার পরি-

প্রেক্ষিতে লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কিশোর সাহিত্য। লেখিকা 'মণিমেলা'র ছেলে-মেয়েদের জন্য গ্রন্থরচনা করেছেন। এজন্য এখানকার ভাষা সহজ সরল এবং গল্প বলার ঘরোয়া মেজাজটুকু বর্তমান।

জেল অভিজ্ঞতার পর গ্রন্থের মধ্যভাগ থেকে (অর্থাৎ পৃষ্ঠা ১৪৬ থেকে, পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা ২৭৭) অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু নারী চরিত্র, নিজের বাল্যকথা, ঊর্মিলার কারাবাস, ছায়া ও সুমনাদির জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও ছাত্রী আন্দোলনের ইতিহাস যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ কারা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এক রাজনৈতিক তরঙ্গ বিক্ষোভের পূর্বাপর চিত্র কিশোরপাঠ্য ভাষায় এঁকেছেন লেখিকা। গ্রন্থটির সেদিক থেকে একটি স্থায়ীমূল্য আছে।

লেখিকা জেলজগতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড থেকে কারাব্যবস্থা এবং শাসন প্রণালীর বিস্তৃত সংবাদ দিয়েছেন। একথা ঠিক তিনি যে সমস্ত জেলকর্মচারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাদের চরিত্র বর্ণনায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থের একটি চিত্তাকর্ষক দিক হল এর সহজ গদ্য ভাষা যা প্রসঙ্গান্তরের গতিধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নিকুঞ্জ সেনের 'জেলখানা কারাগারে'র সঙ্গে 'জীবন অধ্যয়নে'র বিষয় ও রচনায় রীতিগত মিল আছে। নিকুঞ্জ সেনের দৃষ্টিতে যেসব সাধারণ কয়েদী এসেছে তাদের বর্ণনা যেমন সহানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি একটি সমব্যথী মন 'জীবন অধ্যয়নে' লক্ষণীয়। যদিও এখানে অধিকাংশই নারীচরিত্র কিন্তু তাদের স্মৃতিজড়িত ব্যথাতুর ছবি আঁকতে বসে লেখিকা দুঃখের গভীর জ্বালায় জ্বলে উঠেছেন। অন্যান্য নারী রাজবন্দীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি ছিল যৌথ পরিবারের মতো। সহজ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তারা তৈরি করেছিল একটি বৃহৎ বন্দী নারীসমাজ। সেই সমাজের অনেক কথাই আজ অজ্ঞাত থাকত যদি না লেখিকা এমন মরমী ভাষায় সে যুগের আগ্নেয়স্মৃতি লিখতেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো 'জীবন অধ্যয়ন' আত্মস্মৃতিমূলক গদ্য কাহিনী হলেও এতে উপন্যাসের লক্ষণ আছে। উপন্যাসের বিশালতা, ঘটনার বিস্তৃতি, চরিত্রসৃষ্টির পরিস্থিতি অজ্ঞাতসারে লেখিকা তৈরি করে ফেলেছেন। ঘটনার সঙ্গে কখনো দূর থেকে, কখনো যুক্ত থেকে, কখনো বা নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি যে তিরিশের দশকের নারী নির্যাতনের মহাকাব্য রচনা করেছেন, সেখানে স্নেহ প্রেম প্রীতি ভালবাসার সমান্তরালে অত্যাচার, নির্যাতন ও মানবতার নিষ্ঠুর অবমাননা অনবদ্য গদ্য কথায় রচিত হয়েছে যা সাহিত্য এবং ইতিহাস দুটি বিষয়েরই দাবী পূরণ করে।

'জেলখানা-কারাগারে'র [৮৩] ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ১৯৩২ সালের জুন মাসে বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে প্রায় একশ রাজবন্দী দেউলীর মরুভূমিতে স্থান লাভ করে। দেউলী জেলের স্মৃতিচিত্রের বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে দেউলী একটি গ্রাম যার ৬০ মাইলের মধ্যে কোনো রেল স্টেশন নেই। আন্দামানের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় নির্বাসনকেন্দ্র দেউলী—যা আজ মানুষের কাছে বিস্মৃত।

নিকুঞ্জ সেন ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের এই নির্মম দমন ও পীড়নকেন্দ্রের ইতিহাস না লিখলে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক রক্তাক্ত অধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সেই দিক থেকে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা', অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'ডেটিনিউ' এবং নিকুঞ্জ সেনের 'জেলখানা কারাগার' যেন কারাস্মৃতির ট্রিলজি—যেমন বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের কথা', মদনমোহন ভৌমিকের 'আন্দামানে দশবৎসর' এবং সুধীর চন্দ্র দে'র 'সাগর ঘেরা পাথর কারা'—সেলুলার জেলের ব্রিটিশ অত্যাচারের ঐতিহাসিক দলিল।

লেখকের স্মৃতিকথায় প্রতিফলিত হয়েছে দেউলীজেলের রক্ত, অশ্রু, শোক ও স্মৃতি। গ্রন্থে উল্লিখিত চরিত্রগুলি কেউই কাল্পনিক নয়, ঐতিহাসিক। সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে রাজবন্দীদের সম্পর্কটুকু কেমন ছিল তা হারাণের সঙ্গে লেখকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারা যায়। 'জেলখানা তোমার কেমন লাগে?' লেখকের এই প্রশ্নের উত্তরে—হারাণ— "জেলখানা কারাগার বাবু জেলখানা কারাগার ; জেলখানায় কি মানুষ থাকে!" লেখক—"কেন আমরা কি কেউ মানুষ নই?" হারাণ—"ছিঃ, ওকথা বলবেন না, বাবু, ও কথা শুনলেও যে পাপ হয়, আপনারা তো দেবতা।"[৮৪] জেলখানায় থাকে লেখকের মতো দেবতা আর হারাণদের মতো মানুষ। সেই দেবতা ও মানুষের কারাজীবন বর্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।

নিকুঞ্জ সেন তাঁর স্মৃতিকথায় দেউলীজেলের অসংখ্য সাধারণ বন্দীর ছবি তুলে ধরেছেন। পাঁচুর কম্যুনিস্ট মানসিকতা, হারাণের স্নেহ প্রীতি মায়া মমতা, কালুয়ার বেপরোয়া জীবনের প্রতি আসক্তি, দাগী আসামী নকলীর দাম্পত্য প্রেম, রাম সিং-এর মানুষ হয়ে ওঠার আন্তরিক প্রচেষ্টা (যা জেলের শাসক সম্প্রদায়ের কোনোদিনই লক্ষ্যগোচর হয়নি), পাঁচু, দেবেন এবং বটুর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, বক্সাজেলের পকেটমার কয়েদী ক্ষুদুর পদস্খলনের কথা, এমন বিচিত্র সাধারণ কয়েদীর রুদ্ধশ্বাস স্মৃতিকথা রোমন্থন করেছেন লেখক।

এরই সঙ্গে বিপ্লবী ফণী দত্ত, জেল প্রশাসক ফিণে সাহেব, ক্যাপ্টেন অন্নদা মজুমদার, বিপ্লবী জ্যোতিষ জোয়ারদার, ডাক্তার খাঁ সাহেব ও জগন্নাথবাবু এবং অন্যান্য রাজবন্দীর স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ আছে। সব চরিত্রই সমান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়নি। সাধারণ কয়েদী, রাজবন্দী এবং জেল প্রশাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা লেখককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাদেরই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন ক্যাপ্টেন অন্নদা মজুমদার, মালুবাবু, কোহিনুর ঘোষ, ফিণে সাহেব, বিপ্লবী ফণী দত্ত ইত্যাদি রাজবন্দী ও জেলকর্মচারী হিসাবে লেখকের স্মৃতিতে আজও জীবন্ত। সাধারণ কয়েদী চরিত্রগুলিও—পাঁচু, হারাণ, ক্ষুদু, একইভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রন্থটিতে সরস কৌতুকের সঙ্গে মিশেছে কারাভিজ্ঞতা, কারাইতিহাস এবং কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর চিন্তা।

ইতিহাস নির্ভর গদ্য কাহিনী 'জেলখানা কারাগার' গ্রন্থের বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং গতিশীল। লেখক ক্রমাগত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেও তিনি কারাজগতের বাস্তব সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বর্তমান কারাস্মৃতি রচনা করায় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক মূল্যও দৃষ্ট হয়। চরিত্রচিত্রণে এবং বর্ণনা-ভঙ্গীতে লেখকের এমন একটি সাংবাদিক সুলভ বাচনভঙ্গী আছে যা দেউলী জেলের ইতিহাসে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে যে কোনো পাঠককে পৌঁছে দিতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যে তিনি জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তার কারণ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে লেখকের যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তা তিনি গ্রন্থ রচনা কালে বিস্মৃত হননি।

'নিঃসঙ্গ'[৮৫] স্মৃতিকথা পর্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে এক আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমিকের জীবনকথা বর্ণিত। গ্রন্থের দুটি অংশ: প্রথম অংশে লেখক কীভাবে নানা সংগ্রাম এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে কারাবরণ করলেন তা সংক্ষেপে বর্ণিত। এখানে দেশপ্রেমিকের আদর্শ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে লেখক পূজ্যপাদ দেশনেতা এবং যেসব শিক্ষাব্রতীর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগে প্রাক্-প্রস্তুতি পর্বে তিনি কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করলেন এবং সেই প্রস্তুতকার্যে যাঁরা তাকে প্রভাবিত করেছেন তাঁদের কথা লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার প্রেরণা, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও লিয়াকৎ হোসেন,

বিভিন্ন দেশের বিপ্লবইতিহাস, যুগান্তর দল, অনুশীলন দল এবং আত্মোন্নতি সমিতির ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং নৈতিকতার ধর্মীয় শক্তি লেখকের রাজনৈতিক চিন্তার প্রেরণাস্থল। এঁদের প্রেরণা এবং প্রভাব কারাজীবনের মধ্যেও লেখককে অভিভাবকের মতো আকর্ষণ করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (৯১ পৃষ্ঠা থেকে শুরু) জেলজীবনের কথা বর্ণিত। এখানে লেখকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি বর্ণনার একঘেঁয়েমি রোধের জন্য কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে মন্থর করে তোলেননি। স্কেচ আঁকার মতো দ্রুত ছোট ছোট বিবরণের মধ্য দিয়ে বিষয়ান্তরে চলে গেছেন। এরই মধ্যে হঠাৎ কোনো একটি বিশেষ কারাব্যবস্থার দিক লক্ষ্য করে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং জাতীয় সেন্টিমেন্টের দিকগুলি দেখিয়েছেন। লেখকের রাজনৈতিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

'পা ফেলছি আর ভাবছি, হয়ত এমনি জেলের মাটি দেশমায়ের কত বীর সন্তানগণের পাদস্পর্শে পূতঃ পবিত্র হয়ে আছে, কত সন্তান স্বাধীনতা পূজার বেদীতে আত্মদানের জন্য দিনের পর দিন কাটিয়েছে। তারা যেন এই জেলের হাওয়ায় মিশে আছে। এ যেন একটা তীর্থ, আমার মত নগণ্য লোক এই তীর্থে এসে ধন্য হয়েছে।"[৮৬]

প্রেসিডেন্সি জেল থেকে স্টিমারে চড়ে গোয়ালন্দের দিকে এবং শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পেরিয়ে লেখক কুতুবদিয়া দ্বীপে দণ্ডিত হলেন। এই জেল-স্থানান্তরের কাহিনীটি যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি মর্মান্তিক। কুতুবদিয়া দ্বীপে নিঃসঙ্গতা, আকাশচুম্বী অসীমতা, সমুদ্র ও বালুচরের লবণাক্ত অভিজ্ঞতা বর্তমান গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কবিকল্পনার সঙ্গে দর্শনের সংমিশ্রণে লেখক কুতুবদিয়ার জলোচ্ছ্বাসকে চিরন্তন মানবশিশুর নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র অন্তর্গত নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার করে মায়াময় সাগরের বুকে অজানা জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে পশ্চিমের ডুবন্ত সূর্যের অনুষঙ্গে যে সুরসংগতির সৃষ্টি করেছেন তা অনবদ্য। সমুদ্রপাড়ের গভীর অন্ধকার, মেঘ ও আকাশের ঝোড়োগর্জন, শ্রাবণধারায় আকুলতা, বন্দীমনের একাকিত্ব বর্তমান অধ্যায়ের কাব্যগুণকে বর্ধিত করেছে।

এরপর বাঁকুড়া জেল থেকে প্রেসিডেন্সি জেলের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড। সেখান থেকে দার্জিলিং জেল। এভাবে ক্রমাগত জেলপরিবর্তন গ্রন্থের গতিশক্তি বৃদ্ধি করেছে। একাধিক জেলের অভিজ্ঞতা যে গ্রন্থের উপজীব্য সেখানে স্বভাবতঃই

বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে অভিজ্ঞাতার পারিপার্শ্বিকে অনেক পাত্র বা চরিত্র উঠে এসেছে।

গ্রন্থের শুরুতে শ্রদ্ধেয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন—"বইখানি সাহিত্যরসের অতিরিক্ত ডকুমেন্টারি ভ্যালু বা ঐতিহাসিক তথ্যতার জন্য মূল্য বিশেষরূপে আছে। 'তেহিনো দিবসা গতাঃ'—যে সময় বাঙ্গালা দেশের যুবক একাধারে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আদর্শ ও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবিকতার আদর্শ জীবনের সারবস্তু করিয়া বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই গুরু বলিয়া মানিয়া, দেশের জনসাধারণ, দরিদ্রনারায়ণ হইতে সকলের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করাই পুরুষার্থ, এই বিশ্বাসে জীবনদানে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই গৌরবময় যুগের একটি চিত্র এই বই-এ পাওয়া যাইবে।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'এ কাহিনী যেমন আত্মকাহিনী তেমনি এতে একটি মানুষের আত্মারও যেন কাহিনী আছে। কত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে একটি মানুষের দেহাশ্রয়ী চৈতন্য কেমনভাবে দিনে দিনে নব নব ভাবে বিকশিত হয়েছে, তার কাহিনীও এই রচনায় আস্বাদ করেছি।"

প্রকৃতপক্ষে 'নিঃসঙ্গ' কেবল এক কারাবাসীর গোপন অনুভূতির কথা না, একটি যুগের আত্মা ইংরেজের পীড়ন যন্ত্রের অন্তরালে কেমনভাবে প্রোজ্জ্বল ছিল তারই প্রত্নলিপি—'নিঃসঙ্গ'।

'তখন আমি জেলে'[৮৭] এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর একটানা সাড়ে ছ' (৬½) বছর কারাবাসের স্মৃতিকথা। এখানে বহু চরিত্রের ছায়া পড়েছে কিন্তু তারা একসময় মিলিয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। এর কারণ 'এখানা উপন্যাস নয়, তাই চরিত্র সৃষ্টির দায়িত্ব এতে নেই' ('আমার জবাব'-এর অন্তর্গত)। কংগ্রেসী আন্দোলনের সমান্তরালে স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে যে বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল লেখক তারই একজন। গ্রন্থের শুরুতে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, যতীন দাসের মৃত্যুর পর বাংলার জাতীয় জীবনে যে শোকের ছায়া নেমে এলো তাই-ই বৈপ্লবিক শপথে রূপান্তরিত হল—"বিপ্লবীরা আর আত্মগোপন করে থাকতে চাইলো না। কংগ্রেসী আন্দোলনের পাশাপাশি সুরু হলো বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একটি রেজিমেণ্ট অস্ত্র আইন ও ১৪৪ ধারা অমান্য করে কলকাতা থেকে সুভাষের পৈতৃক গ্রাম কোদালিয়ায় রুটমার্চ করে গেল।"[৮৮] এভাবে ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালের বৈপ্লবিক

অভ্যুত্থানের বিস্তৃত বিবরণের পর চতুর্থ অধ্যায় থেকে লেখকের কারাভিজ্ঞতার শুরু।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বর্ণনায় কারাজীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক এবং কারাজগতের স্থায়ী প্রতিবেশ, জেলইয়ার্ড থেকে সুরু করে জেলখানার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তাঁর বর্ণনায় চিত্রসৃষ্টি থেকে বিবৃতিধর্ম বেশি সক্রিয়। আলোচনাক্রমে তৎকালীন বিভিন্ন রাজবন্দীর প্রসঙ্গ এবং চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিক তিনি তুলে ধরেছেন। জেলচত্বরে সন্ধ্যার পর অবসর বিনোদনের পরিবেশ তৈরি করা হতো অনেকটা ক্যাম্প-লাইফের মতো। কেন না কোনো স্বীকৃত সাংস্কৃতিক পরিবেশ জেলজীবনে ছিল না। জেল কর্তৃপক্ষ কোনো নাট্যানুষ্ঠান বা কবিতা পাঠের আসর অনুমোদন করত না। রাজবন্দীরা নিজেরাই গান বেঁধে সুর আরোপ করে এক এক সন্ধ্যাকে সরস উপভোগ্য করে তুলতেন। জেলখানার একঘেঁয়েমির ভিতর এই জাতীয় স্বতস্ফূর্তঃ কাব্যচর্চা বন্দী সমাজের সহজাত কাব্য প্রতিভার দিকগুলিকে উন্মুক্ত করে। বন্দী জীবনে মানুষের আচরণের মধ্যে এক ধরনের প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়া আছে। অনর্জিত শিল্পপ্রেরণা আসে কারাকক্ষের প্রতিক্রিয়া থেকে যা মানুষের চৈতন্য ও সংস্কারে ধাক্কা মারে। কারাজীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিস্ময়, স্বাধিকারবোধ, নির্মাণ ও সৃজনীস্পৃহা জীবজগতের গূঢ় প্রবৃত্তির মতোই নিত্য ক্রিয়াশীল। সেই ক্রিয়াশীল চৈতন্য থেকে সৃষ্টি হয় কারাসংস্কৃতি। লেখক দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। 'ভোলাবাবু' এবং 'সুরেনদা'র সঙ্গে যে কবির লড়াই সুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় পরিণত। এই সরস মধুর পরিবেশ জেলের এমন একটি স্থায়ী অংশ যা কয়েদীজীবনের সমস্ত অবসাদ ও নিরানন্দের পরিপূরক।

বর্তমান গ্রন্থে বিপ্লবীবীর ক্ষীণ দৃষ্টি অসুস্থ বৃদ্ধ সুরেনদার নির্ভীকতা—যিনি লিওনার্ড সাহেবের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন 'আপনার প্রথম বুলেট আমার হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করুক।' (লেখক মন্তব্য করেছেন—'সে-বুকখানা যেন দুর্ভেদ্য ট্যাংক, বন্দুকের গুলি প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে'।) এ-ক্লাশ ও বি-ক্লাশ বন্দীর সুযোগসুবিধার রকমফের, খাদ্য ও আহারের ব্যবস্থা, জেলখানায় নাটক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঢাকা জেলের অনশনব্রতে রাজবন্দীদের শপথ গ্রহণ ইত্যাদি কারাজীবনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকটা উপন্যাসধর্মী খণ্ড কাহিনীর আধারে পরিবেশিত। ঘটনার

দের টানবার, কাহিনী ও চরিত্রের সংগতি দেখাবার বা চরম পরিণতির দিক তুলে ধরার কোনো দায় ও দায়িত্ব লেখকের নেই। তাঁর দৃষ্টি ও অনুভবে যেটুকু আবেগ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে সেখানেই তিনি যবনিকা টেনেছেন। কৌতূহলকে ধরে রাখার কোনো চাহিদা লেখক বোধ করেন না। ঐতিহাসিক রাজনৈতিক চরিত্রগুলির সুখ দুঃখের পাঠ গ্রহণ করেছেন লেখক।

এমন অনেক ভাগ্যহত অসামাজিক ব্যক্তির আবির্ভাব জেল চত্বরে ঘটে যাদের মনোবিকার, উচ্ছ্বাস, অসঙ্গতি, আত্মরতির জট ও লুকানো ক্ষত দেখাবার বা মনস্তাত্ত্বিক সত্য অন্বেষণের চেষ্টা তিনি করেননি। কারণ গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে এক দেশপ্রেমিকের ব্যক্তিগত কারা অভিজ্ঞতা, যা আদর্শ, নৈতিকতা ও আত্মত্যাগের পরিমণ্ডলে পরিবর্দ্ধিত।

অতীন্দ্র বসুর 'বি-কেলাসে'র মতো তিনি জীবনের প্রশস্ত সমতল ছেড়ে বন্ধুর পথে অগ্রসর হননি। এখানে লেখক অনেকটা নির্বাক দ্রষ্টার স্থান গ্রহণ করেছেন। একটি যুগের অশ্রুপ্লাবিত বেদনার হৃদ্‌স্পন্দন পরিবেশন করাই লেখকের লক্ষ্য। 'জাগরী'তে এক রাজনৈতিক বন্দীর কাহিনী এবং প্রতিক্ষমান মৃত্যুর অস্থির পদ-চারণার শব্দ প্রতিষ্ঠিত। 'বি-কেলাসে' অন্ধকার জগতের মানুষগুলির আলো ও অন্ধকারের প্রতি লেখকের আগ্রহ। কিন্তু 'নিসঙ্গ' ও 'তখন আমি জেলে' গ্রন্থ দুটিতে রাজনৈতিক বন্দীর আত্মপরিচয় দানই মূলকথা।

কারাগারের ভাষা

আঞ্চলিক সাহিত্যের মতো কারাসাহিত্যেও শাসনযন্ত্রের এক বিশেষ অঞ্চল কারব্যবস্থা এবং কয়েদী সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত। এই ধরনের রচনাগুলিতে এমন অনেক ভাষা ও শব্দ ব্যবহার পাওয়া যায় যা অন্যান্য যে কোনো শাখার সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভারতবর্ষের কারাগুলিতে যে সব শব্দ ব্যবহার প্রচলিত (অর্থাৎ জেল কাজে ব্যবহৃত ভাষা) সেগুলি মুখ্যতঃ ইংরাজী, কেননা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে আমরা আধুনিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পাঠ গ্রহণ করেছি। অবশ্য মুসলিম প্রশাসন যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত শব্দ বিশেষ করে আইন সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহারে আরবি, ফার্সীশব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই সমস্ত শব্দ কারাসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ যা বাংলা শব্দ ভাণ্ডারকে বিশেষ করে লিখিত সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।[৮৯]

জেল প্রশাসনের শব্দ ভিন্ন এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি কয়েদী সমাজের

অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং তাদের নৈতিক স্তর থেকে উঠে এসেছে। এখানে দুটি দিক লক্ষণীয়—এমন কিছু শব্দ তারা তৈরি করে যা কয়েদী মানসিকতারই প্রতিফলন—শ্লেষ, ব্যঙ্গ এবং কারাযন্ত্রণার অভিব্যক্তি শব্দগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শব্দগুলি যেমন মৌলিক প্রতিভা সাহিত্যগুণেরও পরিচয় দেয়, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থূলতা এবং রুচিবিকারও ধরা দেয় স্পষ্ট ভাবে। এ-জাতীয় শব্দগুলির সাহিত্যিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই স্বতন্ত্র সামাজিক মূল্য আছে যা সমাজ ও ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

কারাগ্রন্থগুলি থেকে প্রাপ্ত শব্দগুলির বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিয়ে দেওয়া হচ্ছেঃ—

অংরেজী অথবার (ইংরেজী খবরের কাগজ)

অস্পতাল (হাসপাতাল)

আমদানী (নতুন কয়েদী)

আজবর (As you were / এ্যাজ ইউ ওয়্যার)

আওরৎ কিতা

আড়ুয়া বেড়ী (Crossfetters)

ইলিসিয়াম রো (লর্ড সিংহ রোড)

এন্টিরুম (হলঘরের অপর প্রান্তে ছোট ঘর)

একশ (১০০) ডিগ্রী সেল (মেদিনীপুর জেলে যেখানে একসময় কয়েদী অর্থাৎ রাজবন্দীদের দিনরাত তালাবদ্ধ রাখা হতো)

এ্যান্টিসেল (যে সেলের মাথার উপরটুকু খোলা)

একস্‌টান (বি. কেলাস ৬৪)

'একেবারে কল্‌মা পরাইয়া ছাড়ে' (হিন্দু ছেলেদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করান)

এ-কেলাস (জেলের বর্ণ বিভাগে যারা হরিজন অর্থাৎ ছিঁচকে চোর ; অর্থাৎ নতুন কয়েদী)

'এক আসামী একদম রিহা' (একজন কয়েদী একেবারে ছাড়া পেয়ে গেছে)।

"এক দুই তিন আসামী, জানালা-বাতি ঠিক আছে আট নম্বর"

(প্রহরী চিৎকার করে ঘোষণা করছে, আট নম্বর সেলের এত জন কয়েদী ঠিক আছে, বাতিও ঠিক আছে—কোনো অগ্নিকাণ্ড বা অপকর্ম ঘটেনি এবং জানালাও তেমনি ঠিক আছে, ভেঙে কেউ পালিয়ে যায়নি)।

কয়েদী কেরাণী (Convict Clerk)

কালাপাগড়ি (Convict Warder)

কামবিলাসী। কানবিলাস (Convalescent)

কানবিলাস বিভাগ (অসুস্থ রোগীর বিশ্রাম স্থল)

কোঠলি বন্ধ (জেলবন্ধ)

কলুপিষ

কঞ্জি (ফেনাভাত)

কুঠুরীতে বন্ধ (till further orders)

কম্বল খোলাই

কুইনাইন প্যারেড (কয়েদীরা সারিবদ্ধভাবে বসে হাঁ করতো, কয়েদী ওয়ার্ডার তাদের মুখে কুইনাইন মিকশ্চার ঢেলে দিত)

কুর্ত্তা (কম্বলের জামা)

কুরতি (তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর গায়ে দেবার পোষাক)

কালো বিল্লা (কয়েদী অফিসার থেকে নিযুক্ত পাহারা যাদের মিয়াদমুকুব এবং জেলের বিশেষ বিশেষ জায়গায় যাবার অনুমতি পায়)

কুলি-সর্দার (Convict Overseer)

কেস্-টেবিল

কমাণ্ডের (জেলের কয়েদীদের কাজের বিভাগ)

কদমখোল (Stand-at-ease)

কটোরা (লোহার বাটি)

কবায়ৎ (drill)

কালাটাংক (আন্দামানে কয়েদী রাখবার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র)

ক্রসবার ফেটার্স—Cross bar fetters (সাধারণতঃ বেতের পরিবর্তে লাগান হয়)

কয়েদী উপনিবেশ (Penal settlement)

খোপর (মুখের মধ্যে অর্থাৎ গলায় সীসার সাহায্যে থলি তৈরি করে তার মধ্যে কয়েদীরা লুকিয়ে পয়সা রাখে)

খরচা (পুরানো কয়েদী যখন ছাড়া পায়)

খাটাল (বড় বড় হলঘর)

খাণ্ডারবাণী (জেলখানায় গানের আসর)

খাস মুন্সী (Private Secretary)

খাটুনীঘর (যে ঘরে বসে মেয়ে কয়েদীদের ভোর থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত

আবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত বড় ভারী লোহার চরকার দড়ি পাকাতে হতো)

'খাড়া হো যাও' (সব কয়েদীরা একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়া)

গুন্তি (কয়েদীদের সংখ্যা গণনা)

গঞ্জি (Rice Porriage)

গলার হাঁসুলিতে 'ডি' লাগিয়ে রাখা—(Dangerous অর্থাৎ ভয়ঙ্কর স্বভাবের কয়েদী)

গলায় হাঁসুলি (Neck ticket)

গুমটি (জেলের ভিতরের কর্মকেন্দ্র অর্থাৎ Central Tower)

গিনতিমিলান (মোট কয়েদী সংখ্যা মিলিয়ে দেখা)

ঘানিঘরের ইস্কিদার (Instructor)

ঘায়েল (আহত)

চারঘন্টি (ভোর চারটায় কয়েদীদের ঘুম থেকে ওঠার ঘণ্টা)

চপক (জেলের কেন্দ্র)

চৌপল (পৌছানো)

চৌতালা ঘুমটি (Central Tower)

চেড়ী (জেলকর্মী)

চালানি ভাই (একই জাহাজে যেসব কয়েদীদের চালান দেওয়া হয়)

চারনম্বর ডিগ্রী

চাকরিতে সুকুস (চাকরিতে দাগ বা কলঙ্ক)

চটি পেনহাও (Sack Cloth)

চুয়াল্লিশ ডিগ্রী (৪৪ ডিগ্রী)—(একটি লাইনে ৪৪ টি কুঠরী)

চাকি শেড

চিঠির ডিউ

ছিল্‌কা কুটো (ছেলা কুটবার কাজ)

ছোকরা ফাইল (Boys Gang)

ছাঁটাইয়া দেওয়া (যে সব কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হয়)

'ছোট হাজরি' (ভোরে কয়েদীদের হাজির থেকে যে খাবার নিতে হয়)

জিম্মা। জমা (নতুন কয়েদী আসা)

জামিন্‌—খালাস

জেলরেয়াই (কারামুক্তি)

জংলী ব্যারাক

জবাবদার (ব্যরাক প্রধান)

জেল কা শাস্তি (discipline)

জেলগেটের বাইরের সেল (Punishment Cell)

জেলের ঘানি (মানুষ মারা কল, অপরিসীম পরিশ্রম, নির্যাতন ইত্যাদি)

জেল হিস্টরী টিকেট (কয়েদীর পূর্বাপর ইতিহাস লিখিত)

জাল-ডিগ্রী (যারা জেলের আইন মানতে চায় না তাদের শাস্তি দেবার জন্য যেখানে রাখা হয় ; জাল দিয়ে ঘেরা)

জেনানা-ফাটক (মেয়েদের জেল)

জাকাৎ

জেল-স্টাফ

জেল-মিউটিনি (কয়েদীদের চাহিদামত দাবীপূরণ না হলে বিদ্রোহ ঘটে)

জপতো

জুভেলিন-ওয়ার্ড

জোড়া ফাইল (দু'জন দু'জন করে কয়েদীদের লাইন)

জেল ব্ল্যাক বোর্ড (জেলে কত কয়েদীর জায়গা আছে, এখন কত কয়েদী আছে এবং তার মধ্যে বিচারাধীন কত, যে ডাক্তারবাবু ডিউটীতে থাকেন তাঁর নাম সকলের নীচে লেখা থাকে)

জেলক্যাম্প

জেল হেল (Jail hell)

টাকু (কয়েদী ব্যারাক)

টিণ্ডাল (জমাদারের অধস্তন কয়েদী)

টোকরী (মাটির মালসা)

টোলী (কয়েকজন সিপাই একত্রিত হলে টোলী বলে)

টাইল (উদর)

টিকটিকি (কয়েদীদের বেত মারার কাঠামো। লম্বা কাঠের ফ্রেমে বন্দীকে হাত দুটি উপরের দিকে লাগানো হাতকড়িতে আবদ্ধ অবস্থায় দাঁড় করানো হয়। পা দুটি আটকানোর জন্য পাদানে গর্ত করা দুটি তক্তা বসানো। নড়াচড়ার কোন উপায় থাকে না। তারপর পরিধেয় খুলে

নিয়ে বেত চালনা হয়। বেত মারার আগে রসুন সিক্ত একটু কাপড় কয়েদীর অনাবৃত পশ্চাদ্দেশের উপর লাগান হয়। চামড়া ফেটে রক্ত বেরোলেও যাতে সেপ্‌টিক না হয়। একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মধ্যযুগীয় বর্বর ব্যবস্থা)।

ঠাণ্ডা হো গিয়া (মারা গেছে)

ঠাণ্ডা গারদ

ঠিকা মজুরী (Piece work)

ঠিকাদার

ডাণ্ডাবেড়ী—Bar fetters (কয়েদী দুপায়ে গোড়ালির ঠিক ওপরে দুটি ভারি চামড়ার পাত মুড়ে দেওয়া তারপর ঐ পাত্রের উপর দুটি লোহার বালা পরান হতো; চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পদে তা বেজে উঠত)

ডবল মার্চ—(ভোরে এবং সন্ধ্যায় দুবার কয়েদীদের মার্চ করানো)

ডিগরী (Cell)

ডেটিনিউ (বিনা বিচারে জেলে আটক। বন্দীকে কিন্তু খাটতে হয় না, কতদিন আটকে থাকবে তার কোন মেয়াদ নেই।)

ডানডাস্‌ পয়েণ্ট (আন্দামানের কয়েকটি নির্দিষ্ট কয়েদীকেন্দ্রের একটির নাম)

নয়া নয়া বাহালী (নতুন নতুন লোককে কাজে নিযুক্ত করা)

নির্জন কারাবাস (Solitary Confinement)

নো-কেস্‌ (যে কয়েদীর নামে সারা বছর কোন অভিযোগ বা কেস্‌ থাকে না)।

নারা (জয়ধ্বনি)

নয়া গোল (Segregation ward)

নিয়াদী হাজতী

তকদীর (ভাগ্য)

তল্লাশি। তালাশি (দেহের মধ্যে টাকাপয়সা আছে কিনা খুঁজে দেখা/ Search)

তাওয়া (থালা)

তিননম্বর (সরিষার পাকুল্)

থাইসিস ওয়ার্ড

দাগী কয়েদী (Habitual offender)

দৈনিক সিধা (Daily ration)

দ্বারী (Gate Keeper)

দেশীপ্রহরী

দাক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ড (আলিপুর জেলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামীদের যেখানে রাখা হত)

দামলীকিতা (যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা থাকে)

দামুলী (lifer)

দফা বদলি (ওয়ার্ডারদের একদল চলে যায় অন্য দল আসে)

দফা (Section)

ধোলাই (প্রহার)

প্যাসেজ (জেলের ভিতরের কর্মকেন্দ্র)

পুরান ওস্তাদ কয়েদী (Jail Bird)

পাঁচ কাপড়া (কয়েদীদের পাঁচ রকমের কাপড়)

পেটি অফিসার (টিণ্ডালের অধস্তন কয়েদী)

পাগলা ঘণ্টা (Alarm Bell)

পাঁচ নম্বর খাতা (খাতা নয়, জেলের ইয়ার্ড। পাঁচ নম্বর খাতায় ঐ ইয়ার্ডের ইতিবৃত্ত লেখা থাকে বলে জেলের প্রচলিত অদ্ভুত ভাষায় ওকে বলা হয় খাতা)

পেনাল ডায়েট (ফেনমিশ্রিত খুদ, দুবেলা মাত্র আধ সের করে লবণহীন ভাতের ফেন খেতে দেওয়া হয়)

ফাইল (এক জোড়া আসামীর পিছনে আর এক জোড়া আসমী-এইরূপ দীর্ঘ লাইন)

ফাইল বাঁটা (কয়েদীদের ভাগ করা)

ফল-ইন (পাগলা ঘণ্টি বাজলে সিপাইরা যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থায় সহজলভ্য হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এসে দাঁড়ায়)

ফালতু (সাধারণ বন্দী)

"ফাইল, গাইল, ভাইল" (জেলে সর্বদা কয়েদীদের জোড়ায় জোড়ায় বসিতে হয়, জেলকর্মচারীদের মুখে গালাগালি লেগেই আছে, আর জেলখানার অখাদ্য কুখাদ্যের মধ্যে একমাত্র ভাল অর্থাৎ ভাইল কিছু পাওয়া যায়)

বেদী (বিছানা বা বালিশ)

ব্যারাটাংক (আন্দামানের একটি নির্দিষ্ট কয়েদী কেন্দ্র)

বটোরিয়া (মারে সাহেবের কয়েদীকৃত ডাকনাম অর্থাৎ ছোট্ট পাখী)

বি-ক্লাশ (একাধিকবার জেলখাটা কয়েদী—'জেল অপরাধী উৎপাদনের কারখানা, তার শিল্প সৌকর্য্যের পরাকাষ্ঠা বি-কেলাস কয়েদী')

বেঙ্গল ডায়েট (যে কয়েদী দু'বেলা ভাত পায়)

বিলাতী দাঁতোয়ান (Tooth Brush)

বে-ফাইল (ঠিকমত জোড়ায় না চলা)

বাচ্চা ফাইল (অল্প বয়স্ক কয়েদী)

'বম্ গোওয়ালা' (বাঙ্গালী)

ভাইপার (আন্দামানের একটি নির্দিষ্ট কয়েদী কেন্দ্র)

ভাঠহা (রান্নাঘর)

মোচলিখা

মেট (Convict Overseer)

মেয়াদি কয়েদী (term convict)

মূলাজা (তেলের ঘানি, ছোবড়া পেটানো ইত্যাদি কাজের কথা কয়েদীদের টিকিটে লেখা থাকে)

মার্কা (Remission)

মিট্টিকা তেল (কেরোসিন তেল)

মামা (মেট্রন)

'মুলকী ভাই' (কয়েদীদের মধ্যে এক অঞ্চলের লোককে বলে)

মিউটিনি (জেলে কয়েদীরা দলবদ্ধভাবে অনশন করলে মিউটিনি বলে)

'মিস্ ভ্যামিনা সেলস্'—আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একটি পরিচিত ওয়ার্ড ১৯৩৪ সালে জওহরলাল নেহ্রু এই সেলে দণ্ডিত হন)

রেণ্ডি ফাটক (মেয়ে জেল)

রোঁদে (Round)

রাস্সি বাটো (দড়ি তৈরী করো)

রাসপুটীন ('স্বদেশী বাবুদের ওয়ার্ডের গোঁসাইজীর নাম')

লালপাগড়ী লালকুত্তা (পুলিশ)

লপ্সী বা লাপ্সী (তরল ক্ষুদের জাউ বা মাড়ভাত)

লাপ্সী বাঁটা (জাউ পরিবেশন)

লাল উর্দি গেঙ্ (জেলের অল্পবয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে পৈশাচিক ঘটনায় যেসব বয়স্ক কয়েদীরা ধরা পড়ে)

লাল বিল্লা

'লিয়ে দিয়ে সাফ্' (ঢাকীসুদ্ধু বিসর্জন)

লোহার হাঁসুলী (হাঁসুলীর মধ্যে একটি তিন কোনা কাঠ ঝুলে থাকে, কাঠে কয়েদীর নম্বর, সাজা এবং মুক্তির তারিখ লেখা থাকে। এই হাঁসুলী রিবেট করা থাকতো, খোলা যেত না)

'শের কা পিঁজরা' (সেল)

'শহীদোঁকি টোলি নিকলি' (শহীদদের দল ধরা পড়েছে)

শ্বশুরবাড়ী (জেল)

শোর পয়েন্ট (দেশীয় ভাষায়' শুয়োর পেট')

সিগ্রিগেশন সেল

সাব্বল চালাও

সিধা-গোল-ভাগোয়াত্তক্তি (কয়েদী বিবরণের ইতিহাস)

'সরকার সেলাম'—(সিপাই 'সরকার' বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীরা সকলে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে সেলাম জানায়। তাছাড়া উর্দ্ধতন জেল কর্মচারী যখন জেল পরিদর্শনে আসেন তখনও ঐ রকমভাবে কয়েদীদের সমস্বরে 'সরকার সেলাম' বলতে হয়)

স্টাফ্ টক্স

গুণ্ডা সিক্যুরিটি (ক্রিমিন্যাল)

সিকিউরিটি বাবু (ভারতরক্ষা আইনে দেশের নিরাপত্তার জন্য বিনাবিচারে আটক বন্দী)

সাভাত (সব্জী)

'সাফ্ ইনকার গিয়া' (সম্পূর্ণ অস্বীকার করা)

সুসী জমাদারনী (female warder)

সিটি (বিপদসূচক শব্দ)

হরিণবাড়ীর জেল (হয়রাণ বাড়ী—আলিপুর জেল)

হাজামৎ (ক্ষৌরকার্য)

এক নম্বর (নারিকেল ছোবড়া ও বেতের কাজ)

দুই নম্বর (নারিকেল ছোবড়া কলে পিষে সিদ্ধ করা এবং সরিষার হাত্ত কুলুর কাজ)

তিন নম্বর (সরিষার পাকুলু)

চার নম্বর (লোহার কারখানা ও সুতো রঙের কাজ)

পাঁচ নম্বর (কাঠের কাজ)

ছয় নম্বর (নারিকেলের হাতকুলু ও সরিষার পাকুলুর কাজ)

সাত নম্বর (নারিকেল ছোলা ও শাঁস খোলার কাজ)

'লালটুপী, কালোটুপী, হলদেটুপী, এ-কেলাস, বি-কেলাস'—মানে কাঁচা আর পাকা ; চোর, জুয়াচোর, মেয়েচোর, পকেটমার, গুণ্ডা, ডাকাত, খুনে। আলাদা আলাদা সব দল বা গ্যাং। বাদসাহি জেল'।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

'মুক্তি কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে'

রাজনৈতিক চিন্তা

উপরে গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচীর সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির যে রাজনৈতিক অভিঘাত স্বাধীনতা পূর্ব যুগটিকে অস্থির করে তুলেছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে।

কোন কোন লেখক সশস্ত্র বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী অথবা পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে ছিলেন। আবার কেউ বিপ্লব ও ধর্মচিন্তার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। অনেকেই গান্ধীবাদী অহিংস নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন আবার অনেকে সহিংস থেকে অহিংস বিপ্লবপন্থায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এক শ্রেণীর লেখকগণের চিন্তায় সামরিক উত্থানের মধ্য দিয়ে সরকার গঠনের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য দিকে যুক্তিবাদী লেখকগণের চিন্তাধারা নানা শাখায় পল্লবিত হয়েছে। অনেকের চিন্তায় মার্কস্‌বাদের প্রতি আস্থা বা সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেয়েছে। অনেকেই বন্দী হিসাবে রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে অমানবিক কারাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সমালোচনাও অনেকে করেছেন। সেই সমালোচনায় সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকাও সমালোচিত হয়েছে নানাভাবে। অনেকে এরই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। কয়েকটি গ্রন্থে একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক দিক বিশ্লেষিত হয়েছে তা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের মিত্রশক্তির পক্ষে সমর্থনকে কেন্দ্র করে। এরই সঙ্গে আমরা দেখতে পেয়েছি অনেকেই বিপ্লবী জীবনাদর্শন থেকে যেমন আধ্যাত্মিক দর্শনে উন্নীত হয়েছেন, তেমনই সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক জীবনের প্রতি অনেকেই অনীহা ও অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

"সচিত্র গুল্‌জার নগর"[১] নামক একটি গ্রন্থকে কারাকেন্দ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। ঘটনাবলীর পটভূমিকা ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ ভেঙে পড়ছে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো দৃঢ় হচ্ছে। লেখক কেদারনাথ দত্তের (ভাঁড়) চিহ্নিত এই সময়কালের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ বিশেষ কয়েকটি সৈনিকব্যারাকে ধর্মনৈতিক বিদ্রোহ রূপে চিহ্নিত হলেও কার্ল মার্কসের কাছে তা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই পর্বের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হলো

নীল চাষীদের বিদ্রোহ, সন্ন্যাসবিদ্রোহ এবং শাসনের দায়িত্ব ভিক্টোরিয়ার স্বহস্তে গ্রহণ। 'সচিত্র গুলজার নগর' প্রকাশের পরে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় জেলের অব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন তাঁর 'জেলদর্পণ' (১২৮২ সন) নাটকে। ভূমিকাংশে লেখক জানিয়েছেন যে, শহরটাকে বিমর্ষ মনে হচ্ছে তার দুটি কারণ ১) দাসত্ব ২) বিভিন্ন অঞ্চলের (লেখক বর্ণিত) প্রতি পৌরসভার অবহেলা। এই দুটি ছবি লেখকের প্রতিবাদী সাহিত্যচেতনাকে পুষ্ট করেছে—

"এই কীর্ত্তিরাশি তোমাদের নয়, এ যখন তোমাদের হবে তখন তোমার দেশের শ্রী ফিরবে, তখন তোমরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদঙ্গম করবে।··· যতদিন উৎসাহ সাহস ও ঐক্যতার ফল সম্পূর্ণ ভোগ না করবে, তা যত দিন পুরুষ পরম্পরায় নিয়ম ও সামাজিক আচারের দাস থাকবে, ততদিন কেবল দাসত্বশৃঙ্খল বহন কর।"

উপন্যাসে লেখক যে শহরের বর্ণনা দিয়েছেন তা একটি নিপীড়িত অর্দ্ধাহারী অনাহারী মানুষের শহর। উপন্যাসের নায়ক হেমাঙ্গ কপর্দকশূন্য। তার চোখ দিয়ে লেখক দেখেছেন মানুষ উপার্জনের পথ না পেয়ে ভিক্ষায় নেমেছে। লেখক লক্ষ্য করেছেন ঐতিহাসিক রাজাদের অত্যাচারী নিপীড়িত মানুষের তুলনায় বর্তমান কালের মানুষ সমধিক নিপীড়িত, দুঃখী, নির্বল ও নিরুপায়। ফলে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে ব্রিটিশ শাসন—

(১) "এখনকার সাধারণ লোক সমধিক নিপীড়িত, সমধিক দুঃখী, নির্বল, নিরুপায়, হীনসাহস ও অল্পায়ু। কারণ? রাজার উৎপীড়ন— শোষণ ব্রত।"

(২) "কাঙ্গালিগুলো এ গরমিতে পুড়ে যাচ্ছে, সপাল বড় সাহেব এদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া খাচ্ছেন আর পাহাড়ের চূড়ায় বসে নিষ্কণ্টকে জবরদস্ত আইন করচেন।"

(৩) আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দাসত্বের খরশানে ছেদিত হয়েছে।"

বইটি একটি সামাজিক নক্সা। লেখক সৎ এবং নির্ভীক বলেই তাঁর আঁকা ছবিতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার দিকগুলি নির্মমভাবে চিত্রিত হয়েছে। কেদার-নাথ পুরোনো শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার তুলনা করেছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবে। এখানে তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় সমাজের করুণ ও অসহায় দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন।

'নির্বাসন কাহিনী'র[২] লেখক মনোরঞ্জন গুহ ১৯০৮ সালে ১৩ই ডিসেম্বর

নির্বাসিত হন এবং ২০শে ডিসেম্বর রবিবার লেখক ইনসেন জেলে বসে একটি সঙ্গীত রচনা করেন। সেই সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনের একটি পূর্ণতর দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটে। তাঁর সঙ্গীতে ছিল

> বন্দী হয়েছি দেহের মাঝারে
> তার উপরে বন্দী হলেম কারাগারে
> সকল বন্ধ, হইবে মোচন
> দেখা দাও একবার নয়নে নয়নে।[২]

লেখক ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। স্বদেশে বন্দী থাকার মর্মপীড়াই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে দৈহিক বন্ধনের দার্শনিক প্রশ্নে। 'আমি ত নূতন বন্দী নহি, অতি পুরাতন বন্দী। আমি যে দেহপ্রাচীরে আবদ্ধ আছি, এই কারাগারের প্রাচীর তাহাপেক্ষা সুদৃঢ় নহে।' অর্থাৎ লেখক ইনসেন কারাগার অপেক্ষা দেহকারাগারের কথাই বেশি করে ভেবেছেন। কারাগার জীবনেই তিনি 'বন্দী' নামে আরেকটি কবিতা লেখেন।

জেলপ্রবেশের আগে লেখক ছিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। জেলজীবনের নিঃসঙ্গতায় লেখক ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় প্রবিষ্ট হয়েছেন। এ সম্পর্কে ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন—'অন্তরে ও বাহিরে আমার যে যে অবস্থা ঘটিয়াছে এই পুস্তকে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।' কেননা তিনি বিশ্বাস করেন—'ইতিহাস সর্বদাই সত্যবাদী হইবে।'

বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অন্যতম প্রাণপুরুষ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়ীর ভূমিকায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করার জন্যে ১৯০৭ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকার দায়িত্ব উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আসে।[৩] এই সময় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ বীর দেশপ্রেমিকরা বাংলার যুবশক্তিকে নৈতিকতা, ধর্মশিক্ষা, জাতীয়তাবাদ এবং বিপ্লববাদের শিক্ষায় দীক্ষিত করতে থাকেন। এবং তাঁরা সকলে মিলে সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠেন। বারীনবাবু এবং অন্যান্যরা আলিপুর বোমার মামলায় ধরা পড়েন কিন্তু দীর্ঘকারাবাস এবং দ্বীপান্তরের মধ্যে থেকেও তিনি বিপ্লব প্রচেষ্টা থেকে সরে আসেন নি। 'দ্বীপান্তরের কথা' ১৩২৭[৪] এমন একটি গ্রন্থ যেখানে আমরা

এমন একজন বিপ্লবীকে পাই যিনি তাঁর দ্বীপান্তর জীবনে সংগ্রামী বিপ্লবী ঐতিহ্যে সমস্ত রক্তটুকু নিঃশেষ করেছেন। সেলুলার জেলে যে অমানবিক কারাব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে তিনি ধর্মঘট সংগঠিত করেন। এই ধর্মঘট সংগঠনের পেছনে ছিল তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ ও নিষ্ঠা।

কালাপানির জেলে ব্রাহ্মণদের পৈতে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদের ঘানি ঘুরানো ও ছোবড়া পেটাই ইত্যাদি সব ধরণের পরিশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। অনাচার ও অত্যাচারে প্রত্যেক কয়েদীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন তাঁরা। বারীন ঘোষ ও অন্যান্যরা 'আলটিমেটাম' দিলেন। তাঁরা তিনটি জিনিষ চাইলেন, ভাল খাওয়াপরা, পরিশ্রম হ'তে অব্যাহতি এবং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ। অনশন ধর্মঘট শুরু হ'ল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল। এতবড একটি আন্দোলনের পিছনে ছিল ইন্দুভূষণ, উল্লাসকর, নন্দগোপাল এবং বারীন ঘোষের বিপ্লবী প্রচেষ্টা। তাঁদের আন্দোলনের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল আদর্শবাদ। ডেপুটী কমিশনার লুইস সাহেব উল্লাসকর প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—"Ullaskar is one of the noblest boys I have ever seen ; but he is too idealistic'

কারাব্যবস্থার সংস্কার, রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা, সাধারণ কয়েদীদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ের পর্যালোচনায় আমরা 'দ্বীপান্তরের কথা'য় এমন একজন লেখককে দেখেছি যিনি চিন্তা-চেতনায় একজন যথার্থ বিপ্লবী ও বীরস্বদেশ প্রেমিক।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সূচনাপর্বে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বিপ্লববাদের অগ্রদূত। ১৮৯৩-৯৪ সালে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশে' তাঁর 'নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কঠোরতম সমালোচনায় ভরা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। 'যুগান্তর' এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় নতুন চিন্তার মননশীল প্রবন্ধ ও বিপ্লবী কর্মপন্থা রচনায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯০৮ সালের ২রা মে 'নবশক্তি' পত্রিকা অফিস থেকে ধৃত হন। জেলের নির্জনতা তাঁকে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত করে। এজন্য 'কারাকাহিনী'তে[৫] রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন ইতিহাস নেই ; আছে রূপান্তর ইসিহাস। যে ইতিহাসের একপ্রান্তে সন্ত্রাসবাদী চিন্তা অপর প্রান্তে আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-জিজ্ঞাসা। একটি প্রবন্ধে আত্মচিন্তার রূপটি স্পষ্ট—

"কারাগার কারাবাস মনুষ্যজাতির চিরন্তন অবস্থা। অপরপক্ষে সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা লাভার্থ অদমনীয় উচ্ছ্বাস ও প্রয়াস দেখিতে পাই। যেমন রাজনীতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে যুগে যুগে এই চেষ্টা। আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, সুখ দুঃখ বর্জন, Stoicism, Epicureanism, asceticism, বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, রাজযোগ, হঠযোগ, গীতা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ,—নানা পন্থা একই গম্যস্থান। উদ্দেশ্য শরীর জয়, স্থূলের আধিপত্য বর্জন, আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা।"[৬] কেননা দাসত্বের সার্বিক বিশ্লেষণ তাঁর কাছে—'শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থা। শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনতা চেষ্টাই মনুষ্যত্ব বিকাশ। স্বাধীনতাই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাকেই মুক্তি বলে।'

শ্রীঅরবিন্দ কারাবাসের পর ভারতী পত্রিকায় এইভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে ছিলেন এবং 'কারাকাহিনী' থেকে আমরা জানতে পারি সেলের নির্জন অবস্থা থেকেই তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন 'সেই অবস্থায়ই ভগবানের কি অসীম দয়া এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হইবার কি দুর্লভ সুবিধা হয় তাহাও বদ্ধমূলম হইল।' এ প্রসঙ্গে তিনি ইটালীর রাজ হত্যাকারী ব্রেসির নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি সাত বছর নির্জন কারাবাসে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি 'কারাকাহিনী' এক বিপ্লবীর আত্মোপলব্ধির কাহিনী। এক বিপ্লবীর চিন্তা জগতের রূপান্তরের কাহিনী। বিপ্লবী জীবনে তিনি জেনেছিলেন ব্রিটিশ শাসন কারাগারেই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, তার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।[৭] কারাজীবনে তিনি উপলব্ধি করলেন এই স্থূল দেহ আত্মোপলব্ধির পথে একটি বড় বাধা, একটি কারাগার।

'নির্বাসিতের আত্মকথা'[৮] প্রকৃতপক্ষে এক বিপ্লবীর আত্মকথা। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হন। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলাদেশে বিপ্লববাদের উৎপত্তি, তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন তথ্য, তাঁর জীবনে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ, তৎকালীন কংগ্রেসনেতৃবৃন্দের দুর্বলতার পৌনঃপুনিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা ও তথ্যের সমাবেশে ঘটেছে।

তাঁর মতে 'যুগান্তর' সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের

'সূত্রপাত।' ঐ ভূমিকা অংশে ইংরেজ নির্দেশিত বিপ্লবী নামকরণ যে এনার্কিস্ট করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করেছেন তিনি। তাঁর মতে—

"যাহারা সর্ব্ববিধ শাসন প্রণালীর বিরোধী, ইংরাজীতে তাহাদিগকেই এনার্কিস্ট বলে। এরূপ কোনও দল ভারতবর্ষে আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না।"

তিনি তাদের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে একটি পরাধীন জাতির সার্বিক মুক্তির উপায় হিসাবে ভেবেছেন।[10] শাসন যন্ত্র যখন কোন পরাধীন জাতির কণ্ঠরোধ করে তখনই সুরু হয় গুপ্ত বিপ্লব প্রচেষ্টা—

"যে সমস্ত পরাধীন দেশে লোকমত প্রভাবে বিদেশীয় শাসনযন্ত্র পরিবর্তিত করিবার উপায় নাই, সে সমস্ত দেশে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়া উঠিলে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি অনিবার্য।[11] এই বিপ্লব প্রচেষ্টা একটি অনিবার্য ঐতিহাসিক ঘটনা যা ইটালী, পোল্যাণ্ড, আয়াল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে একই কারণে ঘটেছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন ১৯০৫ সালের এই বিপ্লব প্রচেষ্টা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বা কতকগুলি তরুণের এনার্কিস্ট আন্দোলনও নয়। তিনি বলেছেন এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক ধারা ইংরেজের জানা ছিল। এজন্যই 'সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে রিফর্ম বিলের শান্তিজল ছিটাইয়া' দেবার চেষ্টা করেছিল ইংরেজ। এরপর তিনি ১৯০৫ সালের রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে থেকে ভারতবর্ষে নানা গুপ্ত সভা-সমিতি স্থাপনের চেষ্টা চলছিল। তাছাড়া প্রায় দীর্ঘ ৬০।৭০ বছর ধরে ইংরেজ বিরোধী মানসিকতা ভারতীয়দের মধ্যে গোপনে লালিত হচ্ছিল। সেই বিরোধিতা সরাসরি প্রতিবাদের আকার পেল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে—

"সমস্ত বাংলা দেশ লর্ড কর্জন কৃত অপমানে যে বাত্যা বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের মতো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই চাঞ্চল্য হইতে প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বিপ্লববাদের উৎপত্তি।[12]

এবং এই রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে উপেন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশটিও ঐতিহাসিক। মাস্টারীতে মন বসাবার চেষ্টা করছেন এমন অবস্থায় 'বন্দেমাতরমে'র একটি সংখ্যা তাঁর হাতে এসে পৌছল। ঐ পত্রিকায় ভারতের রাজনৈতিক আদর্শের আলোচনায় লেখক বলেছেন—"We want absolute autonomy free from British control."

বিপ্লববাদের সুরুতে এ জাতীয় উক্তি দৈববাণীর মত। কেননা তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন বিপ্লবী চিন্তাধারা থেকে অনেক দূরে—

"সেকালের নেতারা ভাজিতেন ঝিঙা আর বলিতেন পটল। যখন সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন তখন তাহার পিছনে 'কলোনিয়াল' কথাটি জুড়িয়া দিয়া শ্যাম ও কুল দুইই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাতে আইনও বাঁচিত, হাততালিও পড়িত।"[১৩]
উপেনবাবু সরস ব্যঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মানসিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। এবং যেখানে কংগ্রেসী আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্রোত, যারা আপোস ও রফা করে চলেছে সেই অবস্থায় উপেন্দ্রনাথের কাছে 'বন্দেমাতরমে'র উদ্ধৃতিটি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

উপেন্দ্রনাথের বিপ্লবীচেতনা সাহিত্যচিন্তার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে উঠে ছিল। কেননা—'ফ্রান্সের রবসপিয়ের হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দমঠের জীবানন্দ পর্যন্ত সবাই এক একবার মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া গেল'। এবং তিনি প্রশ্ন তুললেন 'আমি ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আর পাঁচজনে মিলিত হইয়া রাতারাতি ভারতটাকে স্বাধীন করিয়া লইবে, এতো আর সহ্য করা যায় না।' আমরা আলোচনার সুরুতে দেখেছি যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এই সব নির্ভীক তরুণদের প্রথম থেকেই একটি রাজনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো বাংলা থেকে সুরাট কংগ্রেসে বারীন ঘোষের যোগদানে। কিন্তু সুরাট কংগ্রেসে বারীনদের বিপ্লবীচেতনা গ্রহণীয় হয়নি। তার পরিণাম হয়েছিল বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠন। এর কিছুদিন পরেই মাণিকতলার বাগান থেকে ধৃত হলেন উপেন্দ্র বারীন্দ্র উল্লাসকর প্রমুখ বিপ্লবীগণ। কোর্টে যখন তাঁরা হাজির হলেন সে সময় আমরা উপেন্দ্রনাথের একটি চির স্মরণীয় উক্তি স্মরণ করছি, যে উক্তির মধ্য দিয়ে বাংলার বিপ্লবী জাগরণের আত্মাটিকে খুঁজে পাব। বিবৃতি লিখে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন—

"তোমরা কি মনে করো তোমরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে পার?" উত্তরে উপেন্দ্রনাথ—"সাহেব দেড় শ বৎসর পূর্বে কি তোমরা ভারত শাসন করিতে? না, তোমাদের দেশ হইতে আমরা শাসনকর্তা ধার করিয়া আনিতাম?"[১৪]
উপেন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যেই তৎকালীন বিপ্লবী চেতনার প্রত্যয়নিষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাধারা ফুটে উটেছে।

'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী'[১৫] একজন যথার্থ বিপ্লবীর অকপট আত্মকাহিনী। আলোচ্য গ্রন্থটির রাজনৈতিক দিকটির দুটি সমান্তরাল ধারা প্রবহমান। একদিকে

বিপ্লবে যোগদানের কৈফিয়ৎ, সুরাট কংগ্রেসে যোগদান এবং কংগ্রেস সম্পর্কে বারীন্দ্রের অভিমত, কংগ্রেস ভাঙনের তাৎপর্য, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ধারাবাহিকবিবরণ অন্যদিকে এরই সমান্তরালে বারীন্দ্রের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী, ধর্মগুরু অন্বেষণ, পরাধীন দেশের মুক্তি প্রচেষ্টায় ভগবৎমুখী আদর্শ-প্রেরণা। বারীন্দ্রের বিপ্লবী চেতনায় একটি অন্তর্মুখী দিক ছিল। বঙ্গভঙ্গের সুরুতে 'ভবাণী মন্দির' নামক একটি পুস্তিকা পড়ে তিনি মুক্তি-যজ্ঞে দীক্ষিত হন। এরই প্রত্যক্ষ ফল বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের যোগীগুরু অন্বেষণ। এই সময় তিনি সুরাট কগ্রেসে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। ক্ষমতালিপ্সা, আত্ম-অহমিকা, সংকীর্ণ দলবাজী সুরাট কংগ্রেসের আবাহাওয়াকে দূষিত করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বকে কেন্দ্র করে অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ডেলিগেটরা 'কেহ বা মডারেট, কেহ বা গরম দলের, চানাচুর ঘুঘনিদানার মতো পাঁচামিশেলী ভাবেই বসা হইয়াছে।' প্রকৃত পক্ষে এর পরেই কংগ্রেসে ভাঙনের সুরু।

অবশ্য এই ভাঙনের পিছনে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাদের কাজ ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী মিশনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসী রাজনীতির ভুয়ো চালটি ধরিয়ে দেওয়া। এই প্রচার কার্যেরই অনিবার্য পরিণাম কংগ্রেসের ভাঙন এবং স্বদেশীর জন্ম।

বরোদা থাকাকালীন বিষ্ণুভাস্কর লেলে নামক এক যোগীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ এবং বারীন্দ্রের যোগাযোগ ঘটে। তিনি তাঁদের নানা গোপন তান্ত্রিক যোগক্রিয়াদি শেখান। এবং ভবিষ্যৎ বাণী করেন—
"ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্য কিন্তু এক রকম বিনা রক্তপাতেই তাহা সাধিত হইবে। আকাশ থেকে ভগবানের আশীর্বাদের ন্যায় এ ধন তোমাদের হাতে আসবে, তোমরা শুধু শাসনযন্ত্র গড়ে নিলেই চলবে।"[১৬] এই লেলে বারীন্দ্র, অরবিন্দ ও অন্যান্য সহযোগীদের প্রভাবিত করেছিলেন এবং বিপ্লবীরা তাঁর আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনতে ব্যগ্র থাকতেন। এর পরেই বারীন্দ্র এবং তাঁর সহযোগীগণ গুপ্ত দলগঠন, এ্যকশন্ সেকায়াড তৈরি এবং সন্ত্রাসবাদীদের গেরিলা কায়দায় প্রশিক্ষিত করে তোলেন।[১৭]

এ যুগের বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা আরো তথ্য জানতে পারবো ক্ষীরোদকুমার দত্তের 'বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার'[১৮] নামক গ্রন্থে। এখানে বারীন্দ্রের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট চিত্র আছে।

বৈপ্লবিক পরিকল্পনা। প্রসঙ্গে লেখক শ্রীঅরবিন্দের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন—
"Secret Society did not include terroism in its programme, but this element grew upon Bengal as a result of the strong repression and re-action for it."
আলোচ্য গ্রন্থ সূত্রেই আমরা জেনেছি যে, বারীন্দ্রকুমার অর্থনৈতিক ভারত গড়ে তার ওপরে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন—
"India is on the cross-road of her destiny again. The great war of Non-Co-operation has subsided .....The National Movement must be made plastic and pliable enough to accommodate Itself to the changed circumstances,"[১৯]

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মর্মকথা ছিল গোপনীয়তা, ফলে ক্রমশ বিপ্লবীরা গণজীবন এবং গণচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশশক্তির অত্যাচার অন্যদিকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ এরই পরিণাম স্বদেশীদের রাজনৈতিক আত্মহনন। এই সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার 'অপরাধ স্বীকার কেন করিলাম' ও 'কেন ধরা পড়িলাম' নামক অধ্যায় দুটিতে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের দুর্বলতাগুলি তুলে ধরেছেন—
"তখন আমি মর্মে মর্মে বুঝিলাম, মনের খেয়ালে এতদিন সবই করিয়াছি শুধু দেশকে গড়ি নাই। যাহার জন্য রাজনীতিক মুক্তির এত আয়োজন, আত্মবলির এ অনুপম ব্রত, সে দেশই মুক্তির মর্ম বুঝে না।"[২০]
কারণ উগ্রতা, নিবুদ্ধিতা, অদূরদর্শিতা তাদের সমিতিগুলোকে সত্যই গুপ্ত করে তুলেছিল। যোগাযোগের অভাব, অর্থের অভাব, সাধারণ মানুষের সমর্থনের অভাব সর্ব দিক থেকে সন্ত্রাসবাদীরা যেন একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো—
"তখন বিপ্লবপন্থী লিডারও গরম গরম বোমাবাজী না দেখিতে পাইলে সহজে টাকার থলিতে হাত দিতেন না, তাঁদের সখের পোলিটিক্যাল গুণ্ডাবাজীর আমরা ছিলাম ভাড়াটে গুণ্ডা।"[২১] সন্ত্রাসবাদীদের এ জাতীয় রাজনৈতিক অজ্ঞতা উপেন্দ্রনাথও লক্ষ্য করেছিলেন—
"ইংরাজের বিরুদ্ধে বোমা লইয়া দণ্ডায়মান হওয়া বাতুলতা মাত্র। আমরা বালক-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমার বোধ হয় যে, এখনও কিছুদিনের জন্য ইংরাজের সংশ্রব বাঞ্ছনীয়। ব্রিটিশ উপনিবেশে যেরূপ গবর্মেন্ট আছে, আমাদের দেশে সেইরূপ গবর্মেন্ট অর্থাৎ হোমরুল, আমি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।"[২২] টেরোরিজমের মারাত্মক ভ্রান্তির ব্যাখ্যা ও

বিশ্লেষণে ঐ দুই বীরস্বদেশপ্রেমিকের উক্তিগুলো সেই সময়কার ব্যর্থ বিপ্লবী আন্দোলনেরই যথার্থ ইতিহাস চিত্রিত করেছে।

১৯২০ সালে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য তাঁকে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়েছিল। তমলুক মহকুমার হাঁসচড়া গ্রামে যখন তিনি প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন সেই সময় কলকাতার কার্যক্ষেত্রে যোগদানের জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ আসে। বীরেনবাবু কোলকাতায় আসেন এবং বঙ্গীয় প্রদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

প্রথমে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়গুলির উন্নতির দিকে আত্মনিয়োগ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো। এ ছাড়া প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে থাকতে হতো কংগ্রেস অফিসে। অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি থেকে জানা যায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্র গর্ভনমেণ্টের স্কুল-কলেজের সঙ্গে অসহযোগ করে। ক'লকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছিল এই ছাত্রসমাজ।

প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী হয়ে বীরেন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণায় মগ্ন থেকেছেন। কিন্তু তাঁর গান্ধীবাদী মন স্বরাজ আশ্রমের মূল কথাটাই গ্রহণ করতে পেরেছিল। তাঁব কাছে জেলও এক অর্থে ঈশ্বরের আবাসস্থল, কারণ ভগবানের সৃষ্ট মানুষ সেখানে বাস করে সে স্থান তীর্থস্থান স্বরূপ—

"এই কারাগারকে আর কারাগার বলে মনে হচ্ছে না। আজ মনে হচ্ছে,' আমি আমার বহুকালের বাস্তুভিটায় বসে দেখছি · স্রোতের তৃণ স্রোতে ভাসতে ভাসতে এবারে নির্ভুলে স্বরাজ আশ্রমের পুণ্যতীর্থে তীর্থযাত্রীরূপে আশ্রয় লাভ করেছিল।'[২৩] জেল জীবনে তিনি চিত্তরঞ্জন দাস, হেমন্তকুমার সরকার, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন।

বীরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ছিলেন। এই সমিতির চারটি প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অপরাধে লেখক বন্দী হন। সেই সময়কার তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ছাপ এই চারটি প্রস্তাবে পাওয়া যায়। প্রথম প্রস্তাব—গভর্ণমেণ্ট বাংলার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ এনেছে সবই ভিত্তিহীন। স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সর্বদা শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে তাদের কাজ করে চলেছে এবং এই কারণেই কংগ্রেসের কাজ পূর্ববৎ চলবে।

দ্বিতীয়—যেহেতু এই কমিটির মতানুসারে গভর্ণর ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারে প্রকাশিত ঘোষণাপত্রগুলি অন্যায়, অবিচারপ্রসূত এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি অসহযোগ আন্দোলনের সকল কার্য্য তৎপরতা বন্ধ করবার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে—সেই কারণে এই কমিটি সাধারণকে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনার জন্যে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান।

তৃতীয় প্রস্তব—দেশের মধ্যে উত্তেজনা থাকার জন্য এই কমিটির অভিমত যে যতদিন না সর্ব্বসাধারণ উত্তেজনা ও প্ররোচনাকে অতিক্রম করতে না শিখবে ততদিন কোন সভা বা মিছিল করা উচিত নয়।

চতুর্থ প্রস্তাব—বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল, এই কারণে এই কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশকে প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটির সঙ্গে যুক্ত করে এই কমিটির তরফের কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্যপরিচালনা করবার সকল ক্ষমতা দেওয়া হল।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির প্রকাশ অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছ' মাসের জন্য বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছিল এবং 'কিঞ্চিদধিক ছ'মাস ধ'রে আমাকে .....বিচারাধীন অবস্থায় জেলে বাস ক'রতে হয়েছিল।' জেল থেকে মুক্ত হবার পর তাঁর মানসিকতায় স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় স্বাধীনতার ব্যাখ্যাটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে—

(১) "আমি বিশ্বাস করি-মানুষ যেমন জেলে গেলেই পরাধীন হয় না, তেমি জেল থেকে বেরিয়ে এলেই সে স্বাধীনতার অধিকারী হয়েছে বলে ভুল বলা হয়।"

(২) "আমরা স্বাধীনতা মানে কি, এখনো ভালো করে বুঝতে পারিনি। স্বাধীনতা মোটেই বাহিরের জিনিষ নয়, অথচ আমরা কেউ তাকে বাইরের জিনিষ ছাড়া অন্য কোন আকারে কোনদিন উপলব্ধি করেছি বলে মনে হয় না।"

(৩) "মানবাত্মার স্বাধীনতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মানব তার নিজের ভগবান বিবেক ও আদর্শ এবং অন্যের ন্যায্য ও স্বাভাবিক অধিকারের কাছে ধীরে ধীরে পরাধীন হয়ে ওঠে।

প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের সমসময়েই মনুষ্য জীবনে যুগপৎ প্রভাতের সূর্য্যোদয় ও সন্ধ্যার সূর্য্যাস্ত পরিলক্ষিত হয়।"

লেখকের মতে জাতির চেতনাজগতে স্বাধীনতার অস্তিত্ব আস্তিক মানুষের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মতই এক মৌল অনুভূতি যে বীজ মুকুলিত হয়েছিল তাঁর রুদ্ধকারার দিনগুলিতে। লেখকের মতে যে স্বাধীনতাকে নিজের স্বাধীনতার মতই সমানভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখেনি, তাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা উচিত নয়। লেখকের চিন্তা-ভাবনায় মহাত্মা গান্ধীজীর প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় ধরা পড়েছে।

আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী, 'যুগান্তর' দলের অন্যতম প্রধানকর্মী হেমচন্দ্র কানুনগো মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে 'বাংলার বিপ্লব কাহিনী' লেখেন।[২৪] পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে নাম দেন 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা'। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি সাধারণভাবে বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্ক সূত্রে বাঙালী জাতি ও বাংলার সমাজ সম্পর্কে এক হতাশার ছবি এঁকেছেন। হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিপ্লবের ব্যর্থতা, ক্ষুদ্রতা, হীনতা এবং চরিত্রগত দিকগুলি। এই পুস্তকটি এক সন্ত্রাসবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতে সামগ্রিক ব্যর্থতার পর্যালোচনা। তিনি বারীন্দ্রকুমারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা, আত্ম-অহমিকা, বিভিন্ন পর্যায়ে বিপ্লবীদের মন্ত্র-গুপ্তি না মানার চরিত্রগত দুর্বলতা (এ সম্পর্কে লেখক রাউলাট রিপোর্ট-এর সাহায্য নিয়েছেন), জেলে বিপ্লবীদের রিফরমেটরি হয়ে ওঠা অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী আদর্শ পরিত্যাগ করে বিপ্লবীদের সুখপ্রিয়তা, দুর্বলচিত্ততা ও লক্ষ্যহীনতা প্রভৃতি বিষয় তথা জাতীয়চরিত্রের অযোগ্যতা বিশ্লেষণ করেছেন।[২৫] লেখকের বক্তব্য সন্ত্রাসবাদের বাইরের পরিমণ্ডল দেখে অনেকেই গৌরব অনুভব করছেন, দেশোদ্ধারের আর দেরী নেই—এ জাতীয় আত্ম সন্তুষ্টির জন্ম হয়েছে। কিন্তু হেমচন্দ্রবাবু মনে করেন প্রকৃত ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখা উচিত—'আর একটা সস্তা অসঙ্গত আশায় বুক বেঁধে নিশ্চিন্ত আছি যে, দেশ-উদ্ধারের আর দেরী নেই: বাংলা নিশীথ অথচ দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে, পেছন ফিরে আর দেখবার আবশ্যক নেই, অথবা নতুন করে কিছু ভাববার বা করবার দরকার নেই।' এইখানেই বিপ্লবী প্রচেষ্টার অসাফল্যের বীজ নিহিত। লেখকের অভিমত জাতিকে সর্ববিষয়ে স্বরাজের জন্য প্রস্তুত না করে বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তি লাভের চেষ্টা নিষ্ফল।[২৬]

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন বলে সেই সময়কার সন্ত্রাসবাদের প্রথমশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ রুষ্ট হয়েছিলেন। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' নামক

গ্রন্থে নলিনীকিশোর গুহ হেমচন্দ্র কানুনগোর রাজনৈতিক চিন্তার সীমাবদ্ধতার সুতীব্র সমালোচনা করেছেন। নলিনীবাবুর অভিমত হেমচন্দ্রের চরিত্রে সন্ত্রাসবাদী সততা নেই, তিনি কেবল মাত্র ১৯০৮ সালের সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপগুলির ব্যর্থতা দেখেছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে অগ্নিযুগের দীর্ঘ সময়ের ঐতিহ্যের কোন সংবাদই রাখেন নি। নলিনীবাবু তাঁর আলোচনায় ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ৪২ বছরের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাফল্যের দিক তুলে ধরেছেন। তিনি রাওলাট রিপোর্ট, সিডিশন কমিটির রিপোর্ট প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি ও তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাফল্যে ব্রিটিশ সরকার কীভাবে আতঙ্কিত হয়েছিল। এজন্য—হেমচন্দ্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—
"বহুলাংশে একদেশদর্শিতায় বিকৃত। সমগ্র আন্দোলনের সহিত পরিচিত না থাকায় ইহা অসত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।"[২৭] অন্য দিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যে পরিচয় কানুনগো দিয়েছেন তা সমর্থন করেছে প্রবাসী পত্রিকা।[২৮] পুস্তক সমালোচনায় তাঁরা অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, যাছিল 'আনার্কি কনসপিরেসী' ইত্যাদি তাই হঠাৎ রোমান্স ও কল্পনার মায়াজালে অগ্নিযুগ হয়ে ওঠে। পুস্তকসমালোচনায় হেমবাবুর সাহস, সত্যনিষ্ঠা, দৃষ্টি ভঙ্গির ব্যাপকতার প্রশংসা করা হয়েছে। লেখক যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য বিপ্লবের রীতি ও নীতির সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের গলদগুলিকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন সমালোচক তাঁর সেই স্পষ্ট ভাষণকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

'মাসিক বাসুমতী'[২৯] একইভাবে লেখকের বক্তব্য ও অভিমতকে সমর্থন করেছিল। সমালোচক গ্রন্থের ভূমিকা অংশ থেকে উদ্ধৃতি তুলে গ্রন্থকারের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা সেই অংশ উদ্ধার করলাম—
"জন কয়েক বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীকে উপলক্ষ মাত্র ধ'রে নিয়ে জাতীয় চরিত্রের যে সকল দোষ থাকতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি কখনও সম্ভব হতে পারে না, সেই সকল দোষেরই সমালোচনা করেছি।"[৩০]

আমাদের অভিমত স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক আদর্শ মূল্যায়নে বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা গ্রন্থের গুরুত্ব আছে। বিশিষ্ট একটি যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় হেমচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী মনে রাখবার মতো।[৩১]

'বন্দী জীবন'[৩২] গ্রন্থের সূচনায় লেখক শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"বন্দী জীবন-এর বর্তমান খণ্ডে য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সময় ভারতে বিপ্লবের যে কতদূর আয়োজন হইয়াছিল তাহাই বিশদভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই দিকটি যদিও রাউলাট রিপোর্টে একেবারেই গোপন করা হইয়াছে, কিন্তু 'টাইমস্ হিস্ট্রী অফ দি গ্রেট ওয়ার'-এ ইহার যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখমাত্র আছে। যদিও এই বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইয়া যায় কিন্তু সফলতা বিফলতার দিক দিয়া ইহার বিচার করা উচিত নহে। ভীষ্মের মহান চরিত্র কি কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তিনি হারিয়াছিলেন কি জিতিয়াছিলেন তাহার উপর কিছু নির্ভর করে?"

১৯১৫ সালের ২৬ শে জুন লেখক ধরা পড়েন, সাজা হয় বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলার জন্ত। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড পান এবং লেখকের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় সরকারের নির্দেশে। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাটের ঘোষণা পত্রানুসারে মুক্তিলাভ করেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে বিপ্লবের প্রস্তুতি ও ব্যর্থতার ইতিহাস বিভিন্ন অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বিপ্লবের ব্যর্থতার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

(১) বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে অসাধু ব্যক্তির অনুপ্রবেশ বিপ্লবের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। প্রসঙ্গতঃ তিনি ইতিহাসের সাক্ষ্য তুলে জানিয়েছেন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় একজন খাঁটি বলশেভিকের সঙ্গে অন্ততঃ ৩৯ জন বদমায়েস এবং ৭ জন আহম্মক এসে জুটেছিল। শ্রদ্ধেয় জননেতা চিত্তরঞ্জন দাসও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের সময় তিনি যত জোচ্চোর দেখেছিলেন ততো জোচ্চোর তাঁর ওকালতি জীবনেও দেখেননি।

(২) বাংলায় প্রকৃত সঙ্ঘশক্তি গড়ে ওঠেনি বা কোন সামরিক আয়োজন ছিল না। জনবিচ্ছিন্ন গোপন সংগঠনগুলি এজন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

(৩) নেতৃত্বের সংকট— ঋষি অরবিন্দ রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন। বিপিন চন্দ্র পাল ইংলণ্ড থেকে ফিরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তেমন সুবিধাজনক মনে করছেন না, তিলক বলতে সুরু করেছিলেন আন্দোলনের পদ্ধতি ভুল হয়েছে এবং নেতৃবৃন্দ—'যাহা উচিত বিবেচনা তাহা বলেন না, আবার অনেক সময় যাহা বলেন তাহা করেন না।'

লেখক শচীন্দ্রনাথ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাজনৈতিক ইতিহাস

লিখেছেন। দ্বিতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের পর থেকে অসহযোগ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তী শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল।

১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সাল এই সময়সীমার মধ্যে বিপ্লবীদের মধ্যে ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ঘনিয়ে এসেছিল। গান্ধীর আবির্ভাবের প্রাক্—পর্বটির ইতিহাসের সমালোচন করেছেন লেখক কিন্তু ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন নি। এছাড়াও তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের ইউরোপে দলগঠন, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জাপানে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপ্লবী চিন্তাধারা ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন। যুগটি কি সত্যই কোনো রাজনৈতিক ব্যর্থতার যুগ? এই প্রশ্ন লেখকও বার বার করেছেন। কিন্তু সমর্থন করেছেন বিপ্লবী আদর্শ, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগকে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বীরত্বের প্রয়োজন তার অভাবই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। শচীন্দ্রনাথ যুগটির ব্যর্থতা যুক্তিসম্মত পথে নিরূপণ করতে চেয়েছেন। কিছু 'তরুণ বিপ্লবীর বিকৃত মস্তিষ্কই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী—এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করেছেন তিনি। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে এবং যুগান্তর ও অনুশীলন দলের কার্যকলাপকে 'ছেলে মানুষীর খেয়াল' বলার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল—এই সময়কালের বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতার বিশ্লেষণ এবং বিপ্লবীদের মধ্যে নৈরাশ্যের দিকটি জানতে হলে আলোচ্য গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা ভাষায় লিখিত না হলেও বিষয়ের গুরুত্বে এবং সমধর্মিতায় দুই একটি অন্যান্য ভাষায় গ্রন্থও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর 'কারাকাহিনী'[৩৩] তাঁর জেল অভিজ্ঞতার প্রথম ফসল। রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার পাঠাগার হল আফ্রিকার এই কারাবাস। তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত দিক থেকে যে রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষ গান্ধী-মনকে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে যাদের জন্য প্রস্তুত করেছিল তার সূতিকাগার আফ্রিকার কারাবাসের দিনগুলি। তিনিই প্রথম কারান্তরালের জীবনকে পীড়িত মানুষের মুক্তির শিক্ষা-পর্ব বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সত্যাগ্রহ, অহিংস-অসহযোগ এবং নৈতিক ও আত্মিক শক্তির উৎসই হবে বিদ্রোহের গোলাবারুদ। এই সমস্ত চিন্তাগুলি লণ্ডনের পাঠাগার থেকে তিনি ধার করেন নি। কারাবাসকালে গান্ধীজী তিনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথমতঃ, থোরো, রাস্কিন, টলস্টয় প্রমুখ মনীষীদের

গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন, যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আবহমানকালের একটি মানবকান্নার ব্যাখ্যা ও প্রতিকার। গান্ধী চিন্তার বীজ এইসব মহান দার্শনিকদের চিন্তাশীল গ্রন্থগুলি।

দ্বিতীয়তঃ, কারাদণ্ডের পীড়নকে তিনি রাজনৈতিক শিক্ষার দিক থেকে দেখতেন। যে পীড়ন মানুষের আত্মাকে অবমাননা করে সেই পীড়নকে নৈতিক শক্তি ও সততা দিয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে। এ জন্যই গান্ধীজী 'কারাকাহিনী'তে বার বার বলেছেন তিনি কারাবাসকে দুঃখভোগ বলে মনে করেন না। সাধারণ কয়েদীরা যখন ক্ষুধা, পীড়ন এবং জৈবিক দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ছে তখন গান্ধীজী বলেছেন—

"দেশহিতের জন্য, মানরক্ষার জন্য, ধর্মের জন্য যদি আমার জেলে যাইতে হয় ত সে আমার সৌভাগ্য। জেলে দুঃখ কিসে?......যেখান ত শুধু শরীর বন্দী হইয়া থাকে, আত্মা পূর্ণতর স্বাধীনতা লাভ করে...শরীরকে যে বন্দী করিয়াছে শরীর রক্ষার ভার তাহারই উপর..... এই কাহিনী পড়িয়া পাঠক দেশ বা ধর্মের জন্য জেলে যাওয়া, সেখানে দুঃখভোগ করা ও অন্যান্য বিপদ মাথা পাতিয়া লওয়া আপনার কর্তব্য মনে করিবেন এই কথা মনে করিয়াই আমি আনন্দ পাই।"[৩৮]

তৃতীয়তঃ, গান্ধীজী কারাজীবনকে সত্যাগ্রহী আশ্রম মনে করেছিলেন। এই প্রিটোরিয়া জেলেই (পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোকসরস্ট জেলে) তিনি 'আমার জীবনই আমার বাণী'—এই বিশ্বাসে উপনীত হন। নিয়মানুবর্তিতা, জেল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, কয়েদীরা নিজেরাই রান্না করবে—এই প্রস্তাব জেল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া এই সমস্ত চিন্তাগুলির উৎস গান্ধীজীর কারাবাস। এর দুটি উদ্দেশ্য (১) কয়েদীদের নৈতিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি করা, (২) কারাগারকে কয়েদীদের রাজনৈতিক আত্মস্বাধীন করা। যাঁরা গান্ধীজীকে ভাববাদী দার্শনিক বলেন জেলজীবনের এই কৌশলগত দিকগুলিকে তাঁরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন তা ভাববার বিষয়। গান্ধীজীর কারাবাসকালে এই যে সত্যানুভূতি তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আইনস্টাইন বলেছেন—

"He demonstrated that the allegiance of men can be won, not merely by the cunning game of political fraud and trickery, but through the living example of a morally exalted way of life."[৩৫]

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত মোট তিনবার তিনি আফ্রিকায়

কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এই গ্রন্থে গান্ধীজীর অনন্যসাধারণ মনের শক্তির পরিচয় আছে যা সমস্ত দুঃখ উপেক্ষা করে মানুষকে সত্যের আদর্শে অবিচল থাকার শক্তি সঞ্চার করে। আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী জানিয়েছেন যে, 'তৃতীয়বারের জেল-জীবন তাঁর সত্যাগ্রহের ধারণাকে একটি ঘনবদ্ধ বাস্তবভূমির উপর দাঁড় করিয়েছিলো— 'জীবনে এই কয়েকটা মাসকে আমি অমূল্য মনে করি·· ··এইজন্য, ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।' এর পরেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহকে বাস্তবরূপ দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কারাজীবন তাঁকে সত্যাগ্রহের আদর্শ তৈরি করতে প্রেরণাস্বরূপ হলো। তিনি সত্য ও অহিংসাকে কেন্দ্রবিন্দু করে জাতীয় উন্নতির জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[৩৬]

গান্ধীজী কারাকাহিনীর শেষে জানিয়েছেন তাঁর ঈশ্বর চিন্তা টলস্টয়ের ভাবনায় অনুপ্রাণিত এবং কারাবাসকালেই তিনি জেনেছিলেন 'দি কিংডম অফ গড্ ইজ্ উইদিন উই।' 'কারাকাহিনী' ভারতবর্ষের কারাজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত গ্রন্থ নয়। আলোচ্য গ্রন্থটি আফ্রিকার কারাবাস কাহিনী। কিন্তু আফ্রিকায় তাঁর আত্মত্যাগ এবং কর্মযজ্ঞ মানুষের মুক্তির জন্য যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকেই তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধিতার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তা এবং রাজনৈতিক কর্মধারা ভারতবর্ষে যে বিরাট ঝড় তুলেছিল, সমগ্র জাতিকে ব্রিটিশ বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ করেছিল তার পাঠ নিয়েছিলেন তিনি আফ্রিকায়। গ্রন্থটি উদ্দেশ্যমূলক। জাতির বিদ্রোহী চেতনাকে বিকশিত করাই 'কারাকাহিনী'র উদ্দেশ্য—

'আমার আশা যাঁহারা এই কাহিনী পাঠ করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়ে এখনও দেশপ্রীতি জাগে নাই তাহা জাগরিত হইলে তাঁহারা সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিবেন, আর যাঁহাদের হৃদয়ে দেশপ্রীতি পূর্ব হইতেই জাগরূক তাঁহাদের সে প্রীতি দৃঢ়তর হইবে।'

'জাগরী'[৩৭] প্রকাশিত হওয়ার দশ বছর আগে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' প্রকাশিত হয়েছিল। 'অন্তঃশীলা'য় উপন্যাসের সুডৌল প্লট নেই, আছে চিন্তার স্রোত। এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্য—'সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে তবে হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের 'নিগেটিভ ক্যাপাবিলিটি' থাকবে; তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি, খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেঙে যায়, ঘটনাটি তেমন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে।' প্লটকে গৌণ করে

উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে চেতনার স্রোতের মধ্যে পৌছে দিতে হবে। উপন্যাসের এই নতুন আঙ্গিককে নতুন করে আহ্বান জানালেন সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'জাগরী'তে। ফলতঃ, জাগরীতে লেখক অনেকাংশেই নিরপেক্ষ; নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত প্রত্যক্ষভাবে নিবেদন করেননি। না করার কারণ লেখক একটি বিশেষ রাজনৈতিক পরিবারের চরিত্রগুলিকে তাদেরই চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতকে আকৃতি দিতে চেয়েছেন।

বিলু ও নীলু দুটি বিপরীত রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা পরিচালিত দু'ভাই। বাবা গান্ধীবাদের আদর্শে তাদের দীক্ষিত করেছেন মা রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে নিঃস্পৃহ থাকলেও পারিবারিক ভাঙন তাঁকে রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে পৌছে দিয়েছে। পটভূমি '৪২এর আগস্ট আন্দোলন। একদিকে রাজনৈতিক তরঙ্গপ্রবাহ পরিধির মতো যা ঘিরে রেখেছে এই পরিবারকে, অন্য দিকে কেন্দ্রস্থলে চারটি চরিত্র। লেখক এই প্রসঙ্গে ভূমিকায় জানিয়েছেন—'রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গবিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী'

চারটি চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা ও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের, তাদের অন্তর সত্তা পৃথক পৃথক। বিলু ফাঁসির আসামী, তার কথার লৌহকাঠিন্য জানিয়ে দেয় তিনি লেনিনবাদের বিরোধী— 'এই শহরের নাম লৌহগরাদ হইলে বেশ হয়, ধ্বনির ঝংকারে ঠিক লেনিনগ্রাদের মতো শুনিতে লাগে।' অন্যদিকে আবার ফাঁসিসেলের মশাগুলি 'কেন জানি না আমাদের গান্ধী আশ্রমের মশাগুলি ইহাদের অপেক্ষা জোরে ডাকে মনে হয় কামড়াইলে জ্বালা কম করে। নীলু থাকিলে ঠিক আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, এরা আশ্রমের মশা কিনা, অহিংস উপায়ে রক্ত খেতে শিখেছে।' বোঝা যায় বিলু গান্ধীবাদ এবং কম্যুনিজম্ থেকে সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

ফাঁসির আগের দিন বিলু উন্মুখ হয়ে রয়েছে অতীতের দিকে। ফাঁসিসেলের চারপাশের প্রতিটি অনুষঙ্গ ক্রমাগত তাকে অতীতমুখী করে তুলেছে। সেই সূত্রেই কিভাবে জেলের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ দানা বেঁধে উঠেছিল তার খবর দিয়েছে বিলু। এই ঘটনার উপস্থাপনে বিলুর মনে তির্যক বিরূপতা বেশ স্পষ্ট। জীবনবিচ্ছিন্ন স্লোগানধর্মী কিছু কথা আলোচনা হতো জেলে—'গোরে সিং বক্তৃতা দিতেছে সব জিনিস অবজেক্টলি দেখিতে হইবে।...প্রতি মার্কসিস্টের

কর্তব্য ····আরো কত কী।' বিলু গোরার বক্তৃতা যে যুক্তিহীন থাপছাড়া তা পাঠককে জানিয়েছে উদ্ধৃতির অসংলগ্নতাকে উদ্ধার করে। এরপর বিলু নীলুর সাক্ষী প্রদান এবং রাজনৈতিক বিরোধের খবর দিয়েছে। নীলু একরোখা। নিজের মতবাদ ভ্রান্ত হলেও অটল। জেল-ওয়ার্ডে দাদার সঙ্গে অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বিরোধে নেমেছে। প্যারেড করার সময় নির্দেশের পরিভাষা নীলু ইংরেজীতে রাথার পক্ষে—'স্ট্যাণ্ড এ্যাট ঈজ বললে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া কি দুর্ঘট হয়ে যেত নাকি?' বিলু কিন্তু হিন্দীতে রাখার পক্ষপাতী; অর্থাৎ স্বরাজ সম্পর্কে মানসিক বিশ্বাসের স্তরে বিলু ও নীলুর মধ্যে কৌণিক দূরত্ব আছে। নীলুর সামগ্রিক আচরণের সঙ্গে বিলুর মেলে না। রাজনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিলু মৃদু, নীলু সোচ্চার—'সারা পৃথিবী নীলুর বিরুদ্ধে যাক, নীলু কখনই নিজের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না।'—এই মানসিক অবস্থা থেকেই নীলু ও বিলুর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে।

কিন্তু বিলুর সুপ্তচেতনা নীলুকে না ভালবেসেও পারে না। কেননা বিলু মানবিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখেনি। সারাক্ষণ ফাঁসির সেলের মধ্যে তার সমগ্রসত্তার চিন্তন-বিন্দু নীলু। বারবার নীলুর কথা মনে পড়ে—'নিজের পার্টির প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য সহোদর ভাইয়ের ফাঁসির পথ সুগম করিয়া দেওয়া হৃদয়ের সততার প্রমাণ, না রুগ্ন মনের শুচিবাইয়ের পরিচয়?'

বিলু এই প্রশ্ন তুলেও স্বীকার করেছে—'বোধ হয় নীলুর ব্যবহার আমার ভিতরের আসল আমি।' দেখা যাচ্ছে নীলু এবং বিলু বহিরঙ্গে পৃথক হলেও অন্তরঙ্গে কোথায় যেন রাজনৈতিক মিল রয়েছে। বিলু নিঃশব্দে এই মিল অনুভব করে। তার মূল বিরোধ নীলুর বর্তমান রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। উপন্যাসে বিলু একনাগাড়ে নানা স্বগতোক্তি করেছে; তার থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে সে নীলুর মতো 'মার্কসবাদী হতে চায় না। উপন্যাসে তার ভাষাব্যবহার কম্যুনিজম সম্পর্কে যথেষ্ট কঠিন এবং তির্যক। ফাঁসিকাঠে ওঠার আগেও সে ভাবছে লটারীর টাকা পেলে গ্রামে গ্রমে মার্কসবাদের প্রচার করবে। বিরাট কম্যুানিস্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে—

'বিলু বাবুকা সড়ক' 'বিলু আশ্রম'—না বোধ হয় আমার ভালনামই ব্যবহার করিবে, পূর্ণ আশ্রম····হয়তো পুর্ণিয়ার নাম হইয়া যাইবে পূর্ণনগর—স্ট্যালিনগ্রাড বা গোর্কি শহরের মতো।'

নিজের সম্পর্কে কম্যুনিস্ট নেতা হবার এই যে ধারনা, এটি একটি কপট ধারণা; আসলে এ কথার উদ্দেশ্য নীলুর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করা।

এভাবে ফাঁসির আসামী বিলু দণ্ডের পূর্বরাতে অবচেতনে নীলুকে ভালবাসলেও তার রাজনৈতিক মতবাদকে ঘৃণা করেছে। উৎকণ্ঠিত শংকিত উত্তেজিত অনিদ্রিত উৎকর্ণ বিলু ক্রমাগত সঞ্চরণ করেছে অতীতে। বিশেষতঃ সেই অতীত যেখানে তার আপন ভাই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিলুর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

এই পূর্ণিয়া জেলেই বন্দী আছে বিলুর বাবা। তিনি প্রৌঢ় শান্ত এবং স্থিতধী। গান্ধীবাদে তিনি পরিপূর্ণ আস্থাশীল।—'একাগ্র মনে চরকা কাটিলে দেখিয়াছি স্নায়ুর উত্তেজনা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে। ডাক্তাররা হাসুক, সোশালিস্টরা অবিশ্বাস করুক, আমার যে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।' তিনি বিশ্বাস করেন—'রামরাজ্য হইবে প্রেমের রাজ্য, গৌরাঙ্গের রাজ্য, লোকে হিংসা দ্বেষ ভুলিবে।' বাবার কাছে সোসালিস্ট হওয়া একটা ফ্যাশান। জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ওপর সোশালিস্টদের অনীহা তিনি মেনে নিতে পারেন না। তাঁর অন্তর্জগতের একটিই বেদনা—দুই ছেলেরই সোশালিস্ট হওয়া। ' নিজের দেশের বেদ পুরাণ, মুনি ঋষি, ইতিহাস সব গেল—সকলের নজর রুশের উপর।'

তিনি পাশ্চাত্য ইতিহাস ও আদর্শের স্বীকরণে বিশ্বাসী কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্য ও চেতনা রাজনীতির মৌলপ্রেরণা হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন—
'কিন্তু তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরব কথা ভুলিয়া যাই নাই। বিবেকানন্দের বাণী ছাড়িয়া মার্কসের বুলির ফাঁদে পড়ি নাই। মহাত্মাজী অপেক্ষা স্ট্যালিনকে বড়ো বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।' তাঁর ধারণা বিলুর কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে নীলু কম্যুনিস্ট হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। তাঁর কাছে স্বরাজের একটি স্বদেশী মডেল আছে, যেটি তৈরি করেছেন মহাত্মা গান্ধী—দীর্ঘ বছরের নির্যাতন ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বিলু ও নীলু এই মডেলকে অস্বীকার করছে। এটি বাবার অন্তরে বাজছে। জেলের মধ্যে সোশালিস্টদের চারিত্রিক অবনতি তিনি লক্ষ্য করেছেন। পর্দা টানিয়ে সোশালিস্টরা 'ক্যাপিটাল' পড়ে আর সিগারেট খায়—আজকাল ছেলেদের এই অদ্ভুত আচরণ তাঁর চারিত্রিক শুদ্ধতায় ধাক্কা লাগে—

'ওদের দলের কমরেড বাণারসী—বিলুর চাইতে কত ছোট, বিলুর ছাত্র—আমারই সংগে বিলুর সম্বন্ধে আসিয়া গল্প করে—মুখের কোণে একটি সিগারেট।' তাদের প্রতিটি ব্যক্তিগত আচরণ তাঁর সযত্ন লালিত রাজনৈতিক আদর্শ, নিষ্ঠা এবং চারিত্রনীতির ওপর আঘাত করে। অন্য দিকে পিতা হিসেবে বিলুর সম্পর্কে তাঁর উচ্চধারণা—বিলু মিলিট্যান্ট না হলেও সে যে এই কারাকক্ষে সোশালিস্টদের ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ পড়াবার দায়িত্ব পাবে এ বিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ়। তাঁর রাজনৈতিক সত্তা পিতৃসত্তাকে গ্রাস করেনি। এক্ষেত্রে তিনি বিলু ও নীলুর থেকে স্বতন্ত্র। তিনি লক্ষ্য করেছেন বিলু সোশালিস্ট হলেও তার মধ্যে অস্বাভাবিক সাম্যবাদী আচরণ নেই। পিতা হিসাবে তা তাঁর গর্বের বিষয়। সম্ভবতঃ তাঁর মনের অন্তঃস্থলে একটা বিশ্বাস আছে যে, বিলু আর যাই হোক সে তো রাজনীতির প্রারম্ভিক শিক্ষা পেয়েছে তাঁরই আদর্শের ওপর। তিনি নীলু বিলুর রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে তাঁর আদর্শের পাথক্যটুকু বুঝেছেন। একটির ভিত্তি সাময়িক অপরটির ভিত্তি 'মানুষের মনে আজ যেমন আছে তাহারই উপর, আর আমাদের কার্যক্রমের ভিত্তি, হিংসালোভহীন আদর্শ মানব মনের উপর। সেইজন্য সাধারণ লোককে উহাদের পথই আকর্ষণ করে বেশী।'

বিলুর বাবা নিজের বাড়িতে আশ্রম তৈরি করেছিলেন—বিশ্বাস ছিল এই আশ্রম গান্ধীজী নির্দেশিত পথে স্বদেশী আদর্শের প্রতীক হিসাবে গ্রামকে সংগঠিত করবে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু জেলজীবনে এসে দেখলেন স্বাদেশিকতাবর্জিত একধরণের রাজনৈতিক নষ্টামি কারাগৃহগুলিকে কলুষিত করেছে। এবং যাতে অংশগ্রহণ করেছে তাঁর নিজেরই দুই ছেলে।

বিলুর মা আদর্শনিষ্ঠ পতিব্রতা রমনী। তিনি স্বামীর নির্দেশিত পথে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় ও নিষ্ঠায়। তাঁর অন্তর থেকে গান্ধীবাদের আদর্শ গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছে স্বামীর আদর্শ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। ফলে, দুই পুত্র এবং স্বামীসঙ্গ ও সাহচর্য বঞ্চিত হয়ে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে নিদারুণ কষ্ট অনুভব করেন। তাই বর্তমানে তিনি গান্ধীর প্রতিটি কাজকর্মের বিরুদ্ধতা করছেন। এই অসম্ভব কষ্টের লক্ষ্যবিন্দু হলেন গান্ধীজী, তাঁর আদর্শ এবং সেই আদর্শে সর্বস্বান্ত হওয়া তাঁর স্বামী—

'গান্ধীজী তুমি আমার একি করলে? তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরী করে ছেড়েছ।'

স্বামীর স্বদেশী করার হাজার ঝক্কি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এ সবই তিনি করেছেন সংসারের মুখ চেয়ে, গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়ে—
'মেথরকে হরিজন বলেছি, তার হ্যাটাং ছেলেটাকে নীলু-বিলুর সঙ্গে রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়ে খাইয়েছি,—পাড়ার লোক হেসেছে।'
মা-এর দৃঢ় বিশ্বাস গান্ধী নির্দেশিত পথে 'স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না, বাপ ছেলেতে ভালবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাই-এর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়।' বিলুর মা আসলে মাতৃমমতায় ভরা একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু নারী, তাঁর কাছে সবার আগে স্বামী-পুত্র-পরিবার। তাঁদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় যা যা করণীয় তা করতে গিয়ে তিনি তাদের বিপদে এগিয়ে দিয়েছেন। এই যন্ত্রণাবোধই তাঁর মাতৃসত্তাকে বিক্ষত করেছে।

জেল গেটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে নীলু—বিলুর ভাই। সম্ভবতঃ এই জেলগেট নীলুর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক। যে আদর্শের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাকে মুখোমুখি হতে হবে। দাদার স্নেহ, মমতা, ভালবাসা স্মরণ করছে সে বারবার। টুকরো টুকরো কত স্মৃতি তাকে ঘিরে ধরেছে। রাজনৈতিক জীবনের বাইরে একটি নিটোল বিবেকের স্তর আছে যে স্তরে প্রবেশ করলে নীলু বুঝতে পারে তার দাদা 'ধরমবেটা'। দাদার বিরুদ্ধে জনমত তৈরির পিছনে রাজনৈতিক প্রিন্সিপল্ দেখানোর ধৃষ্টতা এবং ব্যক্তিগত জেদের প্রশ্ন এসে পড়েছিল। দাদার ফাঁসির প্রাক্-মুহূর্তে নীলুও আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমীক্ষার মধ্যদিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পারিবারিক সম্পর্কের অন্তঃজগতে প্রবেশ করেছে এবং অনুভব করেছে দাদা ও তার পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে রাজনৈতিক ঝড় কীভাবে ফাটল ধরিয়েছে—
'রাজনীতিক্ষেত্রে, আমি নীলু, আর সে দাদা নয়। এখানে যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়িয়া, যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রত্যেক কার্যপদ্ধতি যাচাই করিতে হইবে, দাদার পক্ষপুটে থাকিয়া যে ভঙ্গীতে রাজনীতিক্ষেত্র দেখিতাম, তাহা রুগ্ন jaundiced ভ্রান্ত, উহা সুবিধাবাদী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসমাত্র। যথার্থ সর্বহারার সাবলীল উদ্দামতার স্থান সেখানে নাই, জাতীয়তার বাহিরে দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই।'
এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী শেষ পর্যন্ত নীলুকে ফাঁসির মোকদ্দমায় দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে প্ররোচিত করেছে। আমরা প্ররোচিত বললাম এই কারণে যে, নীলু স্বীকার করেছে— 'অথচ মনে মনে অনুভব করিতেছিলাম দাদার যুক্তি ভালো।'

বাবার কংগ্রেস মতাদর্শে হতাশ হয়ে ১৯৩০ সালে ক্যাম্পজেলে দাদা ও ভাই একসঙ্গে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিল। ১৯৪২ সালে এসে নীলু লক্ষ্য করল দু'ভায়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য রাজনৈতিক ব্যবধান তৈরি হয়েছে। দাদা ও ভাইয়ের পারিবারিক বন্ধুত্বের স্তর অতিক্রম করে এখন সর্বহারার জাতশত্রু ফ্যাসিবাদের পক্ষে দাদার অংশগ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। জেলগেটের মুখোমুখি হয়ে নীলু চাইছে আর একবার দাদার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় বসতে। দাদার সঙ্গে আলোচনায় সে প্রশ্ন তুলবে কেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে কিভাবে উৎসাহী হতে হবে, স্পেনের বিপ্লবীদের বীরত্ব, মাও-সেতুং-এর শৌর্য ও একনিষ্ঠতা এ সমস্ত ঘটনাবলী থেকে দাদা কত বিচ্ছিন্ন সেকথা নীলু জানাবে। কেননা সে নিজে কারামুক্তির পর অনুভব করেছিলে—'সেখানে লোকে (তাদের জেলায়) মহাত্মাজী আর মাস্টার সাহেব ছাড়া আর কাহাকেও জানে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীলু তার সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনার বাইরে বুঝতে পারে—'সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর কোথায় যেন খচ্ খচ্ করিয়া কি একটা বিঁধিতেছে। বোধহয় যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতার অহেতুক অনুতাপ।' দাদাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার পর তার মনে হয়েছে যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাত্রাতিরিক্ত একগুঁয়েমি তাকে বিপথগামী করেছে। একদিকে মানবিক সংবেদন অন্যদিকে রাজনৈতিক ভুলের অনুশোচনা—এই দুয়ের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে। আত্মপক্ষ সমর্থনে সে দাদার রাজনৈতিক কাজের সংকীর্ণতা, ভ্রান্তি এই সমস্ত ছোট খাট ব্যাপারগুলিকে নিজের বিবেকের চারপাশে বৃত্তাকারে সাজিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি ভূমির ওপর এসে দাঁড়িয়েছে যা আসলে তলহীন, অবয়বহীন একটি শূন্যতা—

'আমার কর্তব্য করিয়াছি মাত্র। আর আমি সাক্ষ্য না দিলেও, অন্য লোক দিত। গভর্ণমেন্টের লোকের অভাব নাই।'

এরপরই নীলুর কাছে দাদার ফাঁসি, বাবার আদর্শ, সাধারণ মানুষের পর্বত প্রমাণ দুঃখ এগুলি একটি নতুন রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় ভাবরূপ লাভ করেছে। সে বুঝতে পারলো ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪২ সালের ঘটনাবলী এবং পরিণতি আসলে রাষ্ট্র নামক একটি যন্ত্রের ক্রমাগত সঞ্চালন। যেখানে কোন পুনরাবৃত্তি নেই, কোন স্বপ্ন নেই, কোন মানবতা নেই, 'আছে কোরাহা থামা, বেংকটেশ্বর দারোগা, ফৌজদারী, সেসনস্ কোর্ট, সরকারী উকিল, জজসাহেব,

সরকারী সাক্ষী নীলু, জেলকর্মচারীগণ'। এরা সকলে মিলে একের পর এক নিপীড়ন, অত্যাচার এবং ব্রিটিশ বর্বরতার রসদ জুগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্র-নামক এই শোষণযন্ত্রের অংশীদার হিসেবে তাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব এসে যায়। আসলে দীর্ঘ বছর ব্যাপী এই বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি রাষ্ট্রনামক দানবের গোপন ক্রিয়াকলাপ—'জগন্নাথের রথ, নিজ গতির গর্বে চলিতেই থাকিবে। চাকার নীচে নিশির ডাকে আবিষ্ট কোনো হতভাগা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল কিনা তাহা জানিবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।' এবং এই নতুন রাজনৈতিক চিন্তার জগতে প্রবেশের পর জেল-ওয়ার্ডারের কাছ থেকে জানতে পারলো তার দাদা সমেত সকল ফাঁসির আসামীদের সরকারী নির্দেশে ফাঁসির হুকুম অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত হয়েছে। যে জেল গেট নীলুর সামনে বিবেক, আত্মজিজ্ঞাসা এবং চেতনার গভীর রন্ধ্রগুলিকে এতদিন উত্তেজিত করেছিল, এখন তাতে—'হঠাৎ ঊষার আরক্তিম আলোর মধুর ঝলক লাগে।'

সতীনাথ ভাদুড়ী ফাঁসির আসামী বিলুকে কেন্দ্র করে বিলু, নীলু, বাবা ও মায়ের যে রাজনৈতিক রেখাচিত্র এঁকেছেন তাতে তিনি নিজে নিরাসক্ত থেকেছেন শৈল্পিক সচেতনতায়। উপন্যাসের ঘটনাকাল ফাঁসির আগের রাত হলেও চরিত্রগুলি চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়ে অনেক বছর পরিক্রমা করেছে। ঘটনার সুরু রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে, পরিণতি ঘটেছে রাজনৈতিক বিরোধে। সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্য পরিবারের এই রাজনৈতিক তরঙ্গ-বিক্ষোভকে সমর্থন করবে। কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী বিরোধ, গান্ধীজীর আইনঅমান্য আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি, লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক, সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল স্বদেশী লিগ প্রতিষ্ঠা, সোশালিস্ট ও কম্যুনিস্ট দলের চিন্তার আত্মপ্রকাশ—এগুলি ইতিহাস সমর্থিত সত্য। সতীনাথ ভাদুড়ী ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং এই উপাদানের উপরই উপন্যাসের রাজনৈতিক উপরিকাঠামো তৈরি করেছেন। এই উপন্যাসে একমাত্র বাবার চরিত্রে কোনো রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। বাবার মুখ দিয়ে সতীনাথ বারবার উচ্চারণ করিয়েছেন স্বদেশ প্রেম এবং নৈতিকতার জাতীয়তাবাদী চিন্তাগুলিকে। নীলু ও বিলুর উৎকেন্দ্রিক আচরণ বাবা সমর্থন করেননি। অন্য দিকে বিলু এবং নীলু তাদের ফেলে আসা রাজনৈতিক জগতে শুধু বিচরণ করেনি, আত্মিক আকর্ষণ অনুভব করেছে। দাদার বিরুদ্ধে নীলুর সাক্ষ্য প্রদান শেষ পর্যন্ত তীব্র অনুশোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। বিলু ক্রমাগত ঘৃণা করেছে নীলুর রাজনৈতিক

মতাদর্শকে। সতীনাথ পারিবারিক ভাঙনের মূলে যে বিলু ও নীলুর সোশালিস্ট ও কম্যুনিস্ট চিন্তাধারা তা বলেননি, কিন্তু এ দুটি চরিত্রের ক্রমাগত আত্ম-জিজ্ঞাসা ঐ কথাকে সমর্থন করেছে। গান্ধী আন্দোলনের প্রতি অনীহা ও অবিশ্বাস নীলু ও বিলুর মধ্যে জাগ্রত থাকলেও আসলে তাদের শেষ শ্রদ্ধা যেন প্রকাশ পেয়েছে বাবার আদর্শের প্রতি, তাঁর কর্মায়োজনের প্রতি, যিনি গান্ধী-মতাদর্শের মূর্ত প্রতীক। সতীনাথ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেও শেষ পর্যন্ত যেন তাঁর মানসিক দুর্বলতা এই পরিবারের সূচনা পর্বের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে—অর্থাৎ গান্ধীবাদে, তাতে সন্দেহ নেই।

পরাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনেব ইতিহাসে 'অগ্নিদিনের কথা'[৩৮] একটি ঐতিহাসিক দলিল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সতীশ পাকড়াশী এমন একজন বিপ্লবী যিনি ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২ বছর বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, তার উত্থান-পতন, বৈপ্লবিক সংগ্রামের নানা পরিস্থিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও পথের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিজমের ভাবাদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। 'অগ্নিযুগের কথা' প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস নয়, এটি বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এক বিশিষ্ট বিপ্লবীর পরিণতি ও লক্ষ্যে পৌছানোর কথা। যার সূত্রপাত অগ্নিযুগে এবং তা ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ, কংগ্রেসী আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং রুশ বলশেভিক পার্টির গণ-আন্দোলন ও গণ-বিপ্লবের আদর্শে।

সমগ্র পুস্তক জুড়ে রয়েছে এমন একজন লেখক ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল যুগ ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নন বরং সর্বোপরি একটি পরাধীন জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং আত্মিক অবস্থা সম্পর্কেও সচেতন।

লেখক প্রথম পর্যায়ে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষ থেকে বিভিন্ন গুপ্তসমিতির কর্মধারার দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতার একটি ছবি তুলে ধরেছেন সমকালীন ইতিহাস ও তথ্যের ভিত্তিতে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অহিংস আন্দোলনের অনিবার্যতাকে দেখিয়েছেন। এবং শেষ পর্যায়ে মার্কসবাদী চিন্তার আলোকে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি রাজনৈতিক বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশে প্রাথমিক স্তরে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

(১) অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপ, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিক ও শারীরিক অনুশীলন ;

(২) 'আনন্দমঠে'র সন্তানদলের প্রেরণা ;

(৩) নবযুগের অগ্নিময়ী বাণীর প্রতীক 'যুগান্তর' ;

(৪) রুশ-জাপান যুদ্ধে জারের পরাজয় এবং জাপানীদের ত্যাগ, বীরত্ব এবং স্বদেশ হিতৈষণার চমকপ্রদ গল্প ;

(৫) শিবাজীর বীরত্ব, মহারাষ্ট্রীয় নেতা তিলকের বৈপ্লবিক প্রবন্ধ :—

এইগুলি তাঁর জীবনে বৈপ্লবিকচেতনা বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

'স্বদেশী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানলাভের জন্য পড়াশোনায় মন দিলাম। সখারামের দেশের কথা, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখজাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডীর কথা, বিবেকানন্দের বই, রবি ঠাকুরের কবিতা ও সাহিত্য—এই সব ধরণের বই দিয়ে লাইব্রেরী করা হল সাটিরপাড়া গ্রামে।'[৩]

১৯০২ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের মূলতঃ চারটি স্তর :—

ক. ১৯০২ থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ—ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের প্রসার এবং কার্জনের তীব্র ভারত-বিদ্বেষ।

খ. ১৯০৫-১৯০৮ খৃষ্টাব্দ—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, কংগ্রেস থেকে চরম পন্থীদের বহিষ্কার, সন্ত্রাসবাদের প্রাথমিক সাফল্য।

গ. ১৯০৯-১৯১৪ খৃষ্টাব্দ—সন্ত্রাসবাদে ভাঁটা, নিস্তেজ কংগ্রেস আন্দোলন, সাধারণ মানুষের জীবন ভয় ও আশাভঙ্গ এবং এই সময়েই ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত।

ঘ. ১৯১৪-১৯১৮ খৃষ্টাব্দ—যুদ্ধ ও বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তখন ব্রিটিশ সরকারের দুঃসময়, আমেরিকার গদর পার্টির সংগে বাঙালী বিপ্লবীদের যোগাযোগ, কংগ্রেসের বিপ্লবী পরিকল্পনার অভাব এই সব ঘটনাগুলি একজন দূরদর্শী রাজনীতিকের মত লক্ষ্য করেছিলেন সতীশ পাকড়াশী। বাংলাদেশে তখন প্রকৃত আন্দোলনের চেহারা কী তার একটি সুন্দর সারসংক্ষেপ করেছেন লেখক :—

'স্বদেশী-ডাকাতি, পুলিশ ও বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা, বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণ, সর্বোপরি গুপ্ত-সমিতি গঠন—এ সবই ছিল সে দিনের জাতীয় আন্দোলন। জনসাধারণ এ সবের সাফল্য দেখলে উৎফুল্ল হত—মনে মনে অনেকখানি আশা করত। কংগ্রেস তখন মডারেট নেতাদের বাৎসরিক অধিবেশন মাত্রে পরিণত হয়েছে—পূর্বেও তাই ছিল। মাঝখানে স্বদেশী

আন্দোলনের জোয়ারে কংগ্রেস একটা ব্যাপক জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র।'[৪০] ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে ভারতরক্ষা আইন পাস হয়। এর ফলে বহু কংগ্রেসকর্মী, সন্ত্রাসবাদী এবং স্বদেশপ্রেমিক ধৃত হন। ক্রমশঃ বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যর্থতা নেমে আসে। সন্ত্রাসবাদীরা ক্রমশঃ শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেন। এই অবস্থায় আন্দোলনের উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব লেখক উপলব্ধি করেছিলেন। এই সময়ের ইতিহাসটি 'বাঙালী যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ত রঞ্জিত ইতিহাস' যদিও 'গণশক্তি হতচেতন, শিক্ষিতেরা ভীরুপায় ঈর্ষায় ও স্বার্থপরতায় মগ্ন।' সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতার পরেই তিনি ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের বিপ্লবী রাজনীতির বিশ্লেষণে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে বিপ্লব' কথাটির রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'বিপ্লব বলতে আমরা রাষ্ট্রবিপ্লব বুঝি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন উচ্ছেদ করে, স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করার কাজই বিপ্লব।'[৪১] এই সময় তিনি নৈরাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, নিহিলিজম্ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ইতিহাস চর্চা করেছিলেন। সতীশ বাবু বাকুনিনের 'গড এণ্ড দি স্টেট' গ্রন্থটি পড়ে আকৃষ্ট হন। তিনি স্বীকার করেছেন এই সময় তিনি ও সন্ত্রাসবাদীরা গণসংগঠনের বিপ্লবী ঐতিহ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি—

'আমরা বিপ্লব চাই। কিন্তু বিপ্লব যে কী সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তখনো আসেনি। সন্ত্রাসবাদের দ্বারা যে স্বাধীনতা আসবে না—তাতে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম।'[৪২]

জেলে অবস্থানকালে তিনি নতুন ভাবাদর্শের সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা এই সময় 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'র পর থেকে (১৯২৯) ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি জনগণের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি করে। অসহযোগ আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পর তাঁর চেতনায় আরো বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের জোয়ার এলো। কেননা বিগত বছরগুলির মধ্যে তিনি বলশেভিক আন্দোলন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ইস্টার বিদ্রোহের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৯২৮ সালে একদিন অ্যালবার্ট হলের একটি সভায় মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। এরপর যখন তিনি মেছুয়াবাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হন, সেই সময় থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির দেশী বিদেশী পুস্তিকা, নানা রকম মাসিকপত্র তিনি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন—'তখন থেকেই আমাদের কম্যুনিস্ট হওয়ার ইচ্ছার উন্মেষ হয়'। এই সময় তিনি জেলে

সীমান্ত গান্ধী, নিবারণ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিভিন্ন বন্দীর সঙ্গে হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ, মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ এবং গান্ধীবাদের আলোচনা করতেন। ঐ সময় জেলে একটি কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় যার কেন্দ্রে ছিলেন সতীশবাবু। লেখক কম্যুনিস্ট হওয়ার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এই ভাবে—
'আমি অতীত নীতি-পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে সমাজ বিপ্লবের যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কম্যুনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছি।'[৪৩] ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দেশেবিদেশে যে ইতিহাসের রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটে গেছে তার উপর ভিত্তি করে 'আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কমিউনিজমের প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।'[৪৪] এই সময় তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা, গণ সংগঠনের পরিকল্পনা এবং বিপ্লবের বাস্তবলক্ষ্যে পৌছনোর জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ। ক্রমশঃ তিনি মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক, শোষণের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা, শ্রেণী সংগ্রাম প্রভৃতির মার্কসীয় চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাগারে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর কাটিয়েছিলেন।[৪৫] অনুশীলন সমিতির আদর্শ, নির্ভীকতা, স্বাজাত্যবোধ সর্বোপরি স্বাদেশিকতার দীক্ষায় এক ব্যাপক ও গভীরতর অর্থে তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত প্রাণ। তাঁর আদর্শবাদের উৎস বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশিত অনুশীলন পন্থা। দৈহিক, আত্মিক এবং সামাজিক দিক থেকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে জাতির পরাধীন আত্মাকে মুক্ত ও স্বাধীন করাই ছিল তাঁর ব্রত। মহারাজ সারাজীবন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শে সর্বপ্রকার নিপীড়ন ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়—'আমার দেশের মানুষ অনুশীলনের দ্বারা পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিবে, থাকিবে না কোন স্বার্থচেতনা, দুর্নীতি, বঞ্চনা, বৈষম্য ও শোষণ এই স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম।'

তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুশীলন সমিতির যথার্থ আদর্শ ও ত্যাগের মধ্যে গড়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থে ত্রৈলোক্যবাবু কোন্ রাজনৈতিক পটভূমিতে অনুশীলন সমিতির জন্ম, এর নীতি-আদর্শ ও কর্মপন্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ, বিপ্লবীদের ব্যর্থতার কারণ, গান্ধীবাদের মূল্যায়ন, জাতীয় কংগ্রেসে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও দুর্বলতা প্রভৃতির বিস্তৃত তত্ত্বালোচনা করেছেন। পরাধীন ভারতের ওপর ব্রিটিশ সরকারের নানা ধরণের কালা-কানুন, অত্যাচার, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সংগ্রাম এবং সর্বোপরি অনুশীলন সমিতির বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের ইতিহাস এই পর্যালোচনার মধ্যে আছে।

সমগ্র গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনায় অনুশীলন দলকে তিনি জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন একটি সন্ত্রাসবাদী দল হিসাবে চিহ্নিত করার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুশীলন দলের লক্ষ্য ছিল গণ-আন্দোলন, কেননা গণ-আন্দোলনই সশস্ত্র বিপ্লবে রূপ নেয়—

'অনুশীলন-সমিতির নেতারা ভাবিয়াছিলেন, দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরু করিতে করিতে সময়ে ইহাকেই সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে পরিণত করা যাইবে'। অনুশীলন দলের বিপ্লবী কর্মপন্থার ঐতিহ্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন গান্ধীবাদ ও কম্যুনিস্ট ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেব ব্যাপকতা, গণসংযোগ এবং ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর বিচ্ছিন্নতাব বিকল্প হিসাবে মহাত্মাজীর ঐক্য আন্দোলনের গুরুত্বকে তিনি স্বীকাব কবেছেন। অন্যদিকে তীব্র সমালোচনা করেছেন কম্যুনিস্ট পার্টির শিকড়-ভ্রষ্ট স্বভাব ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে—

'স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন কমুনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলিয়া প্রচার কবিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত কবার চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহাবা ভারতের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয় নাই, রুশিয়ার বন্ধু বলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই তখন কার্যত সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ ভারতবাসীর জনযুদ্ধ ছিল না।'[১৬] সুভাষচন্দ্রের বিদেশী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা কম্যুনিস্টদের চোখে ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার বিপদজনক দিক হিসাবে সমালোচিত হতো। ত্রৈলোক্যনাথ ইতিহাসের ঘটনাবলী উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক পরাধীন জাতি জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে বৈদেশিক সাহায্য আবশ্যিকভাবেই গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক লেনিন, সান ইয়াৎ সেন, জর্জ ওয়াশিংটন কীভাবে স্বদেশে জাতীয় মুক্তি প্রশ্নে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি স্বদেশীযুগে প্রতিটি আত্মত্যাগী বীর বিপ্লবীদের মতো ত্রৈলোক্যনাথের কাছে সবকিছুর উর্ধ্বে ছিল দেশপ্রেম। পরাধীন জাতির মুক্তির প্রশ্নকে তাঁরা চরম বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে ব্রিটিশ শক্তিব অর্থ নৈতিক শোষণ মুখ্য ছিল না, তাঁদের প্রধান প্রশ্ন একটি জাতিকে আত্মিক দিক থেকে সব ধরণেব দেশী ও বিদেশী পীড়ন ও শোষণ মুক্ত হতে হবে। এজন্যই ব্রিটিশ সরকারের প্রগতিশীল ক্রিয়াকলাপকে তাঁরা জাতীয় উন্নতির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী মনে করতেন না। তাঁদের শ্লোগান ছিল 'ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ানস্'। দেশপ্রেমের এই জরুরী প্রশ্ন

থেকেই ত্রৈলোক্যনাথের রাজনৈতিক চেতনা সংগঠিত হয়েছে। এবং এই স্বাদেশিকতার চেতনা থেকেই বাংলায় বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সুরু হয়। রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রশ্নে তিনি কিছু মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন :—

ক সিপাই বিদ্রোহের সময় বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ছিল রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

খ স্বদেশী আন্দোলনের পর বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

গ যেহেতু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একটি পরাধীন জাতির প্রশ্ন তাই স্বাধীনতার পথ একটি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ

ঘ অনুশীলন নেতারা জানতেন বিপ্লব শুধু কল্পনার বস্তু নয়, কারখানায় ফরমায়েশ করলে বিপ্লব তৈরি হয় না। বিপ্লবের জন্য চাই বৈপ্লবিক আবহাওয়া।

ঙ কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংকল্প গ্রহণ করার ২৪ বছর আগে অনুশীলন দল পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের আয়োজন করেছিল।

চ 'বিপ্লবী'র 'বিপথগামী' ভ্রান্ত সন্ত্রাসবাদী নয়—এটি ব্রিটিশ সরকারের অপপ্রচার

ছ ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদের জনক ব্রিটিশ সরকার।

জ. অনুশীলন সমিতির কাঠামো বলশেভিক পার্টির মতো। বলশেভিক পার্টির মতো বিপ্লবীরা দ্বিস্তর কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। একটি গোপন ক্রিয়াকলাপের স্তর অপরটি জন-সংযোগ ও জনসংগঠনের স্তর।

অনুশীলন দলের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথের সিদ্ধান্তগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে দল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তগুলি বিবৃত করেছেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের কাছে তা গভীরভাবে অনুভব করবার, আলোচনা করবার বিষয় তাতে সন্দেহ নেই।

বিপ্লবীদের ব্যর্থতার আলোচনায় তিনি যুগের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশকে দায়ী করেছেন, বিপ্লবীদের নয়

'স্বদেশী যুগের ফলেই বিপ্লব যুগ, বিপ্লব যুগের ফলেই সত্যাগ্রহ যুগ, সত্যাগ্রহ যুগের ফলেই অসহযোগ যুগ অসহযোগ যুগের ফলেই আইন অমান্য যুগ, এবং আইন অমান্য যুগের ফলেই আগস্ট বিপ্লব।'[৭৭]

বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন একটি বিশেষ রাজনৈতিক যুগস্রষ্টির স্তরে এসে পৌঁছেছে, সেই সময় সরকারের দমন-নীতি বিপ্লবীদের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ থেকে

ব ছুন্ন করে, কারারুদ্ধ করে। এই শূন্যতার স্তরে, নৈরাশ্য ও অবসাদের স্তরে মহাত্মাজীর অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত। নেতৃবৃন্দের কারাবরণ, মহাত্মাগান্ধীর মতো প্রভাবশালী নেতার আবির্ভাব, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজ দাবী প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির জন্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিপ্লবীদের হাত থেকে জাতীয় কংগ্রেসের হাতে আসে। বিপ্লব আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রশ্নে ত্রৈলোক্যনাথের এই ইতিহাস সচেতনতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনা ত্রৈলোক্যনাথের পক্ষেই সম্ভব। কেননা 'তাঁহার জীবনের কাহিনী জ্বলন্ত ও নিষ্কাম দেশপ্রেমের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজিকার পেশাদারী দেশপ্রেমের দিনে, যেখানে চতুর্দিকে স্বার্থান্বেষী ভণ্ড তথাকথিত ত্যাগীদিগের চক্রান্তে দেশ ডুবিতে বসিয়াছে সেই বাংলাদেশে ত্রৈলোক্যবাবুর এই কারাকাহিনী প্রকাশ অতিশয় সময়োপযোগী হইয়াছে।'—১৩৫৫ সালের প্রবাসী পত্রিকার 'পুস্তক পরিচয়' থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হল, গ্রন্থটির সমকালীন গুরুত্ব ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করার জন্য।

'শৃঙ্খল ঝংকার'[৪৮]—এর লেখিকা বীণা দাস মনে প্রাণে খাঁটি বিপ্লবী। তিনিও অগ্নিযুগের অন্যান্য বিপ্লবীদের মতো ভারতবর্ষের এক দুর্যোগের নিশীথে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু খাঁটি বিপ্লবীর মত তাঁরও লক্ষ্য ছিল দেশের গণ-চেতনাকে মুক্তির উপকূলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করা, সেজন্য আগাগোড়া তিনি মুক্তি লাভের বিভিন্ন মত ও পথের মধ্যে বিচরণ করেছেন। পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন 'স্নেহের গভীর আতিশয্য আর উদ্বেগ মেশানো অবাধ স্বাধীনতার ঐশ্বর্য।' তাঁর বিপ্লবীচেতনায় স্বাদেশিকতার সূত্রপাত হয়েছিল শৈশবকালের অসহযোগ আর সত্যাগ্রহের আন্দোলনের যুগে। এই সময় বঙ্গভঙ্গের স্মৃতি, সাইমন কমিশন বয়কটের যুগে সুভাষচন্দ্রের সক্রিয় আন্দোলন, ক্রমাগত ছাত্র আন্দোলন তাঁকে শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষবাবুর কাছে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে। তিনি ক্রমাগত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছেন। কখনও দ্বিধা, কখনও দ্বন্দ্ব, কখনও প্রশ্ন বা কখনও উত্তর খুঁজে পাওয়া। কিন্তু কখনই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে যাননি। তিনি মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনকে শ্রদ্ধা করেন আবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, নেতাজীর ইম্ফল অভিযান ইত্যাদি সশস্ত্র গৌরবময় অভ্যুত্থানকে কোনো মতেই অস্বীকার করেন না—

'তাঁর (মহাত্মাজীর) অসহযোগ অস্ত্রের উপযোগিতা এই নিরস্ত্র দেশে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করবে কে?……কিন্তু ভারতবর্ষের মুক্তি ইতিহাসে……থাকতে হবে বাঘা যতীনের কথা, থাকবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গৌরবময় অধ্যায়, নেতাজীর ইম্ফল অভিযানের কাহিনী।'[৪৯] এই রাজনৈতিক চেতনার টানা-পোড়েনের মধ্যেই তিনি বিপ্লবী গুপ্তসমিতিগুলির অন্যতম নায়িকা হয়ে ওঠেন। এরই মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নতুন মতবাদের অনুপ্রবেশ—কম্যুনিজমে। তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেহারা বদলাতে সুরু করে। কম্যুনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিকতার চিন্তা পরাধীন জাতির বিপ্লবী শক্তিকে প্রভাবিত করে। ফলে বিচ্ছিন্ন স্বদেশী আন্দোলনগুলির মধ্যে কম্যুনিস্ট মতাদর্শ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষ ১৯৩২ সালের পর থেকে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির মধ্যে আসে মার্কসীয় সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু বীণা দাসের প্রশ্ন প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে যেহেতু গ্রেটব্রিটেন ফ্যাসিবাদ বিরোধ মিত্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই সময় থেকে সোভিয়েত রাশিয়া বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নগুলিকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে। ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ শক্তির স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী, রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীতে তখন তারা প্রগতিশীল। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষের বিপ্লবী সংস্থাগুলিকে ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে সরিয়ে রাখার রাজনীতি গ্রহণ করে। যুদ্ধ সম্পর্কে কম্যুনিস্টদের মনোভাব রাতারাতি বদলে যায়। তারা ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধের মঞ্চে সকলকে একত্রিত হতে বলে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নকে গৌণ করে। ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিবাদের বিপদ ছিল না; অথচ ফ্যাসিবাদের বিপদকে মুখ্য করে তোলা হলো। তখন 'কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়েও কমিউনিজমকে গ্রহণ করা যায় কি না·· এখানকার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কনিউনিজমকে এদেশের মাটিতে রোপন করা যায় কিনা, অনেকেই এ প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলেন।' বীণা দাস—'রাশিয়ার মাছিমারা অনুকরণ' করতে রাজী ছিলেন না। ঐ সময় মানবেন্দ্র রায় কম্যুনিজমকে ভারতীয় কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে গণপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আনতে হবে—'আমাদের দেশে সোভিয়েত নেই কিন্তু অনুরূপ গণপ্রতিষ্ঠান রয়েছে গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি কংগ্রেসগুলি। সেই কংগ্রেসগুলিকেই আমাদের প্রাণবন্ত করতে হবে। 'এ্যকৃটিভাইজ দি প্রাইমারি

কংগ্রেস কমিটিস্'—এই হওয়া উচিত আমাদের স্লোগান।'[৫০] কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি এমত গ্রহণ করেনি বা কংগ্রেসের মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তারও অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ক্রমান্বয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়লো এবং মানবেন্দ্র নাথ রায়ের বক্তব্যই সত্যি হলো। বীণা দাস কম্যুনিস্ট পার্টি'র মধ্যকার এই সমস্ত মারাত্মক ভ্রান্তিগুলিকে তুলে ধরেছেন 'শৃঙ্খল-ঝংকারে'। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে কংগ্রেসকে কাজে লাগানোর এম. এন. রায় কৃত ফর্মুলা কম্যুনিস্টরা গ্রহণ করেননি। কম্যুনিস্ট পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয় বিপ্লবী শক্তি-গুলির মধ্যে যে কর্মসূচী গ্রহণের প্রশ্নে রাজনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল 'শৃঙ্খল-ঝংকারে' লেখিকা তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেনিনের সঙ্গে তার একটি স্বপ্ন দেখার ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেখানে লেনিন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধিতার গুরুত্ব সর্বাধিক তা বলেছেন। এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি'র রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানহীনতার নিন্দা করেছেন—

'তোমাদের গণবিপ্লবের আদর্শ অনেকটা পুঁথিগত, বুদ্ধি দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছ, জীবন থেকে রেখে দিয়েছ বহুদূরে। কে জানে কতদিনে, কতযুগ পরে, এদেশের মাটিতে সত্যিকারের কর্মীর দল গড়ে উঠবে। ভেবেছিলাম রাশিয়ার পর বুঝি ভারতবর্ষ—কিন্তু এই যদি হয় এদেশের কর্মীর নিদর্শন।'[৫১]

আলোচ্য গ্রন্থে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে লেখিকার যে রাজনৈতিক ভাষ্য লক্ষ্য করা গেল তা থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে কম্যুনিস্ট মতাদর্শ থেকে কংগ্রেসী মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্য তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনা করেছেন। এমন কি তিনি সেই সময়কার কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনগুলির সাফল্য-ব্যর্থতার আলোচনা আলোচ্য গ্রন্থে করেননি। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক তাৎপর্যের অনুসন্ধানও এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। তাঁর আলোচনার লক্ষ্যকেন্দ্র কম্যুনিস্ট পার্টি। কিন্তু একথাঠিক তিনি বিচারশীল এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতাসম্পন্না লেখিকা। শুধু তাত্ত্বিক নন, যথার্থ অর্থেই বীণাদাস ছিলেন বিপ্লবী।

কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর কিশোরী ছাত্রী শান্তি দাশের নাম অগ্নি-যুগের ইতিহাসে আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরীর সঙ্গে তিনি ১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে

হত্যা করেন। উভয়েই বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এরই সাহিত্যিক ফল 'অরুণ-বহ্নি'।[৭২]

সশস্ত্র বিপ্লববাদের সক্রিয় কর্মী তিনি। ইংরেজীতে যাকে 'মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিস্ট' বলে শান্তি দাশ যথার্থ অর্থে তাই। এইজন্ম আলোচ্য গ্রন্থে একটি স্পষ্ট, স্বচ্ছ রাজনৈতিক আদর্শ বিদ্যমান। তত্ত্বের কুয়াশা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদকে আচ্ছন্ন করেনি। সমগ্র গ্রন্থে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মূলতঃ তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন।

প্রথম পর্বের নাম দেওয়া যেতে পারে বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব। এই পর্বে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে একটি কিশোরী নিজেকে প্রস্তুত করেছেন আগামীদিনের সম্ভাব্য ঝড়ের জন্ম। স্বদেশী গান, দেশ-বিদেশের মুক্ত জীবনচেতনার বিভিন্ন গ্রন্থ, গীতার ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্মানুষ্ঠানের তত্ত্ব, অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবী স্বদেশানুরাগের ফল্গুধারা, জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের দাবী, মহাত্মাজীর আইনঅমান্য আন্দোলন এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি লেখিকার রাজনৈতিক চেতনাকে বিপ্লববাদের পথে সহযাত্রী করেছে। আলোচ্য পর্বে গান্ধীজীর অহিংস গণআন্দোলনের তত্ত্বে সমকালীন তরুণ বিপ্লবীদের মন যে সংশয় মুক্ত ছিল না সেকথা তিনি স্বীকার করেছেন।

কংগ্রেসকে অহিংস গণ-আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাওয়া আবার আন্দোলন প্রত্যাহার করা এই নীতিকে তরুণ বিপ্লবীরা হতাশা ও ক্ষোভের চোখে দেখতেন। গান্ধীজীর আন্দোলনে অহিংস তত্ত্বের যে ভিত্তিভূমি তা গান্ধীজীর কাছে ছিল একটি শাশ্বত সত্যের প্রতীক। অহিংস নীতিকে বিপ্লবীরা এতখানি দার্শনিক প্রত্যয় সহকারে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন না।

দ্বিতীয় অর্থাৎ কারাবাস পর্বে শান্তি দাশ প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সমীক্ষা করেছিলেন। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের একাংশের গান্ধী বিরোধিতা, কংগ্রেসের ভাঙন, ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান, মুসোলিনী ও হিটলারের নানা ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত ঘটনাবলীর খবর রাখতেন তিনি। বিপ্লববাদের দীক্ষিতা নায়িকা হিসাবে তিনি কোনদিনই গান্ধী মতাদর্শকে স্বীকার করেননি। এমন কি, কারাবাসের দিনগুলিতেও তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে—নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সশস্ত্র বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন—'গান্ধীবাদে আমরা কখনই বিশ্বাস করিনি, বিপ্লববাদের প্রসারের জন্তে গান্ধীজী পরিচালিত গণ-আন্দোলনের সুযোগ অবশ্য

আমরা গ্রহণ করেছি।' জেলে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্র মতবাদকে ক্রমশঃ প্রাধান্য দিচ্ছেন। কেননা নেহরু বুঝেছিলেন কংগ্রেসের ভাঙন রোধ করতে গেলে সমাজতন্ত্রের মতবাদ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। এই পর্বের শেষে তিনি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীকে। বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন কলকাতায় ১৯৩৮ সালে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রশান্ত দিব্যদৃষ্টি লেখিকার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে— মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আর মহাত্মা গান্ধী নবজাগ্রত ভারত আত্মার দুটি হিরণ্ময় দিব্যচক্ষু।' আলোচনার শেষে গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন—'তোমাদের মুক্তি আমি অর্জন করবোই, তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করবো স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে।'

শেষ পর্যায় ঘরের ফেরার পালা।

'শাসকের আর শোষকের অত্যাচার থেকে আমার সমাজ আর আমার দেশের মানুষকে চিরকালের জন্য মুক্ত করার শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে নতুন অরুণোদয়ের স্বর্ণদিগন্তে।'[৫৩] এই বিপ্লবীআশা নিয়ে লেখিকা শান্তি দাশ তাঁর গ্রন্থের ইতি টেনেছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' গ্রন্থটির[৫৪] গুরুত্ব সম্পর্কে বিপ্লবী অরুণ চন্দ্র গুহ ভূমিকায় জানিয়েছেন—'গোপন ষড়যন্ত্র থেকে গণ-আন্দোলনের পথ, বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবের পথ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বরাজ লাভের পথ গ্রহণের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করা, এই হ'ল এ গ্রন্থের দার্শনিক তত্ত্ব—এই গ্রন্থের মধ্যমণি।' শুধু তাই নয়, কোনো কোনো বিপ্লবী দলের প্রতি কটাক্ষপাত এবং তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি তিনি। মোটামুটিভাবে এই গ্রন্থে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪৬ খ্রীসাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বিপ্লব-যজ্ঞের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন।

১৩৬১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকার 'পুস্তক-পরিচয়' অংশে আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল—'পুস্তকখানিতে নিজ স্মৃতি-কথা প্রসঙ্গে বিপ্লব-প্রচেষ্টার আদর্শ, গতি প্রকৃতি, বিভিন্ন দলের কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন।'

১৯১৬ সালে বাংলাদেশে জুলাই বিপ্লবের সময় লেখক গ্রেপ্তার হন। এরপর দীর্ঘ কয়েকবছর তিনি বিভিন্ন জেলে কারাবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। জেলে

রাজনৈতিক বন্দীদের দাবী আন্দোলন এবং কারা-সংস্কারের জন্য তিনি দীর্ঘকাল অনশন করে ছিলেন বিলাসপুরের জেলে। রাজশাহী জেলে থাকাকালীন লেখক গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। বিপ্লবের স্বরূপ এবং পন্থা সম্পর্কে কারাবাসকালে লেখকের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ বিপ্লব আন্দোলনের ব্যর্থতার দিকটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বিপ্লবের সঠিক পন্থা সম্পর্কে তিনি যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখনই তাঁর চিন্তার পরিবর্তন ঘটল। এর কারণ ১৯১৮ সালের যুদ্ধ বিরোধীনীতি ঘোষণা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির নীতি ঘোষণা, মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার নিয়ে আন্দোলন, রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব, জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি।

ভূপেনবাবু কারাবাসকালে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। জেলে তিনি যুগান্তর ও অনুশীলন দলকে একত্র করার চেষ্টা করেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়—

'অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরই এত তফাৎ যে, মিলমিশ ওদের সঙ্গে আমাদের হতে পারে না, বরং সে চেষ্টায় অনিষ্ট হবে, একথা বুঝেও তখনও বুঝিনি, বারবারই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পেয়ে বসেছে, আর মিলমিশের কথা বলেছি।'৫৫

লেখক এই সময়কার স্বদেশীচিন্তা, সমাজ পুনর্গঠন এবং ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কারাবাসে লেখক ছিলেন এক অক্লান্ত বিপ্লবী। নিম্নমানের খাদ্য, ওষুধ এবং পোষাক সরবরাহের জন্য তাঁরা জেলে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন। জেল-জীবনে তিনি সুভাষবাবুর নির্দেশে দুর্গাপূজা শুরু করার জন্য হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার মত পরিবর্তন করায় অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

কারামুক্তির পর লেখককে অন্তরীণ করা হয়। ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র মুক্তি লাভ করেন। প্রসঙ্গত তিনি কংগ্রেসের বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। ১৯২২ সাল নাগাদ লেখক কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। দেশবন্ধুর মৃত্যু, স্বরাজ পার্টির পতন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভারতবর্ষের বাইরে কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ প্রসঙ্গে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। লেখক ভূপেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কংগ্রেসের মত কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও মতাদর্শগত বিভিন্ন দ্বন্দ্ব শুরু হয়। লেখক যেহেতু তাঁর স্মৃতি কাহিনীকে

স্বাধীনতার আন্দোলনের কাল পর্বে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আলোচনা করেছেন এইজন্য তাঁর আলোচনায় কম্যুনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী দল এবং গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তার গুরুত্ব সব থেকে বেশি। গ্রন্থটিতে নানা বিরোধীমতের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন কি ভাবে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে তার আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে লেখকের উক্তি—

'এবারেও অন্তরীণে বসে দেখছি, দেশময় একটা যুব-আন্দোলনের সূচনা দেখা দিচ্ছে। এর ভিতর ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে সদ্য রাশিয়া প্রত্যাগত জওহরলালের এবং সদ্য জেল থেকে মুক্ত সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা। এঁরাও প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন দেশের একটা অশান্ত উত্তেজনা থেকে। আমরা ভাবছি, একে আরও উন্মত্ত করে তোলা যায় কী ক'রে। দেখছি আর ভাবছি, ভাবছি আর দেখছি। এই ক'রেই অন্তরীণের দিনগুলো আমার কাটছে।'[৪৬] ভূপেন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিকগ্রন্থটি প্রকৃত অর্থেই জেলখানা ও কারাজীবনের কথা। আলোচনার সূত্রপাতে আমরা জেনেছি যে ১৯১১ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে তিনি প্রায় পঁচিশ বছর কারাবাস করেছেন। ঐ কারাবাসেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। দেশপ্রেমিকের সততা ও ত্যাগ নিয়ে যে কিশোরের রাজনৈতিক পদযাত্রা শুরু তা আলিপুর জেল, রাজশাহী জেল, হুগলী জেল, মেদিনীপুর জেল এবং বর্মার বেসিন, মান্দালয়, ইনসিন জেলের মধ্য দিয়ে স্বর্ণকান্তি হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালে।'আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সবিস্তারে জানিয়েছেন অনুশীলন দলে যোগদান ও তার আদর্শের কথা, মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কীভাবে যুক্ত হলেন এবং সহিংস বিপ্লবী পন্থা কীভাবে অহিংস বিপ্লবী পন্থার অন্তরায় হয়ে উঠছিল তার কথা। গান্ধীমতবাদে (প্রথমে কৌশলগত টেকনিক পরে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ) উত্তরণের বিস্ময়কর কাহিনী, স্বরাজ পার্টির আবির্ভাব এবং তার প্রতি নৈতিক সমর্থন এবং শেষপর্যন্ত মার্কসবাদে বিশ্বাসী হওয়া। তিনি ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ ইংরেজী 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধাবলী 'ইণ্ডিয়ান রেভোলিউশান এণ্ড দি কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম' নামক গ্রন্থে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দেশপ্রেম, রাজনৈতিক চিন্তা এবং জেলে থাকাকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থের কোন কোন অংশ উদ্ধার করে আমরা বিপ্লবী

ভূপেন্দ্রনাথের কারাজীবনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিকটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি—

(১) কার্বেট সাহেবের অনর্গল জেরার মুখে দাঁড়িয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'From Robert Clive down to yourself I don't know whom to call more dishonest.'

(২) জেলে থাকাকালীন বিপ্লবীরা ডারউইন, হাক্সলি, উড্রো উইলসন, লাওয়েল প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র এবং রাজনীতি বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতি বিষয়ে কয়েদীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চলতো। 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', ইবসেন, বার্নার্ড শ, তুর্গেনিভ মেটারলিংক এঁরা কেউই বাদ পড়তেন না। রাজশাহী জেলে ১৬ নং সেলের দেওয়ালে এক ফরাসীভাষা জানা রাজবন্দী লিখেছিলেন "হে মোর ভগবান উন্নততর জীবন কী?" (Ah mon Dieu, qui est une meilleure vie ?) এই প্রশ্ন থেকেই লেখকের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছিল যে জীবনে কোনটি গ্রহণীয় আদর্শ হবে? রাজনৈতিক জীবন ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে আত্ম সমর্পণ না স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিবেদন? লেখকের তাই আত্মজিজ্ঞাসা— 'নিজের পড়াশুনো ছাড়া আদর্শের চিন্তা, পথের চিন্তাতেই দিনটি কেটেছে, অসংগতি ততটুকুই মাত্র এসেছে সমাজের সঙ্গে সংগতি রাখতে যতটুকু প্রয়োজন ... দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছি, দেশকে, স্বাধীনতাকে যদি তোমার আসনে বসাই যতনে, সে কি একটা অপরাধ?'

(৩) রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিংসা ও অহিংসার গ্রহণ প্রশ্নে লেখক রাজশাহী জেলে কীভাবে গান্ধীপন্থা অনুসরণ করলেন সে প্রসঙ্গে বলেছেন—

'বিপ্লবের প্রথম ও প্রধান শক্তি জাগ্রত জনগণের স্বাধীন হবার মরিয়া আগ্রহ, অস্ত্র নয়। যে জাতের (সেদিন পর্যন্ত) সেই আগ্রহই জাগে নাই, সে অস্ত্র পেয়েই বা কী করবে? তা ছাড়া, জাতকে জাগাবার কালে, একথা প্রচার করে বেড়ান চলে না যে, জাগ্রত জাত অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অহিংসাকে তাই আমরা নীতি বা পলিসি হিসাবে গ্রহণ করি, গান্ধীজির মতো ধর্ম হিসাবে নয়। ...অনুশীলনের সঙ্গে পার্থক্য আমাদের এইবারে পাকা হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরা হয়তো গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে সমরায়োজনের

উপায়ই তখনও ভাবছেন। কাজেই তাঁদের কাছে অর্থের সমস্যাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। তাঁরা ভিন্ন পথ ধরলেন।'

(৪) ইংরেজ পুলিশ ১৯২৩ সালে মিহির ঘোষ নামক এক যুবককে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলো। এই মীরজাফরকে তিনি রাশিয়ার জার পুলিশের গুপ্তচর আজেভের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স (২৫ শে 'অকটোবর' ১৯২৪) জারির মধ্যে দিয়েই স্বরাজ পার্টি'র বিনাশ এবং কংগ্রেস ও স্বরাজীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। বর্মার জেলে স্বরাজীরা যে গোপন ক্রিয়া-কলাপের দলিল তৈরি করেছিল তা গোপন পথে গান্ধীজীর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই দলিলে স্বরাজ ও কংগ্রেস পার্টির ভাঙনে মিহির ঘোষের ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়। গান্ধীজী বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে স্বরাজ পার্টি'র নিধন তা মানেননি। এজন্য দেশবন্ধু এই গোপন মেমোরিয়ালকে কলকাতার রুদ্ধদ্বার এ. আই. সি. সির অধিবেশনে গান্ধীজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে—অধিবেশন থেকে স্টেশনে যাবার পথে গাড়িতে গান্ধীজী তা পাঠ করেছিলেন এবং স্টেশনে গান্ধীজী প্রেসকে বললেন—

'আমি বিশ্বাস করি যে স্বরাজ দলের প্রতি আঘাত হানবার উদ্দেশ্যেই এ অর্ডিনান্স হয়েছে।'

(৫) বর্মার জেলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গে হিংসা ও অহিংসা নিয়ে দার্শনিক আলোচনা চলতো। লেখকের কাছে মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলো—রক্ত মাংসের মানুষ এবং রক্তমাংস ছাড়া তার দেবত্বটুকু। মনুষ্যত্বের আলোচনায় ওনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও গান্ধীজীর দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা হতো—

'গান্ধীজীর সঙ্গে নাগপুরে তিনদিন ধ'রে হিংসা অহিংসার যে আলোচনা, তারও ভিতরে পেলাম, তাঁর অহিংস সমাজ আর অরবিন্দের দেবসমাজ—লক্ষ্যে, আদর্শে এক। উপায়েই মাত্র পৃথক।'

কমলা দাশগুপ্তের 'রক্তের অক্ষরে'[৫৭] গ্রন্থে পরিচিত অংশে বলা হয়েছে "রক্তের অক্ষরে" বিপ্লবযুগের কোন অংশের ইতিহাস নয়, এ কতকটা আত্ম-কাহিনী। অবশ্য শ্রীযুক্তা দাশগুপ্ত বাংলার বিপ্লবযুগের বীরাঙ্গনা, তিনি কিশোর বয়সেই বিপ্লববাদে পরিণত-মনস্ক ছিলেন। 'রক্তের অক্ষরে'র লেখিকা তাঁর বিপ্লবীজীবনের ধারাবাহিক ইতিকথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। যেহেতু লেখিকা

অগ্নিযুগের বিপ্লবী সেইহেতু আলোচ্য আত্মকথামূলক স্মৃতি আখ্যানে বিপ্লবী আদর্শ, দেশানুরাগ, আত্মত্যাগ, বিপ্লবীজীবনের সমকালীন ইতিহাস এসমস্ত প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। এইজন্য আত্মকাহিনীতে ইতিহাসও আছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে তিনি বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা-প্রস্তুতির সংবাদ দিয়েছেন। মহাত্মাগান্ধীর নজীরহীন অহিংস গণ-আন্দোলন, গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির মরণ-পণ লড়াই, তাদের সততা, ত্যাগ এবং কষ্টসহিষ্ণুতা লেখিকাকে স্বদেশমন্ত্রে ব্রতী হবার প্রেরণা দিয়েছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ-রাজের চরম নিষ্ঠুরতা, মনুষ্যত্বের অবমাননা ক্রমশঃ তাঁকে একটি সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য ব্যাকুল করেছে। শুরুতে তাঁর বিপ্লবানুসন্ধান গান্ধীবাদের আদর্শকে সামনে রেখে। অন্যদিক ১৯২৯ সালে বোটানিক্যাল গার্ডেনস্-এ—'দীনেশবাবু চুপি চুপি বললেন আমাদের দলের নাম 'যুগান্তর'। ঐ ক্ষুদিরাম, ঐ যতীন মুখার্জীদের যা কিছু কর্মসাধনা সবই যুগান্তরের যাত্রা'। তিনি আরও বললেন,

'এটা কিন্তু একটা খেয়াল বা খুশি নয়, দু-দিনের হুজুগ বা উত্তেজনা নয়। বিপ্লবীদের হচ্ছে সারাজীবন ব্যাপী সাধনা, এটা একটা ব্রত। এই সাধনায় একবার ব্রতী হ'লে সুখ নেই কোথাও, শান্তি নেই, শুধু নিরাশার অন্ধকা' কেটে-কেটে পথ চলা। কেবলি আসবে আঘাত আর নৈরাশ্য।···· পারবেন তো?'[৫৮]

লেখিকার প্রত্যয়নিষ্ঠ উত্তর—'পারবো'। এবং এখান থেকেই বহু নির্যাতন আর কষ্ট স্বীকারের দীক্ষা গ্রহণ। এরপর বারো অধ্যায়ে তিনি ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের যে রূপ ছিল তা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীজীর ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একবছরে স্বরাজ আসবে এই রাজনৈতিক ভাষ্যকে বিপ্লবীরা অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। তাঁরা ঠিক করেন বিপ্লবী আন্দোলনকে এক বছরের জন্য স্থগিত রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করবেন।[৫৯]

১৯৩০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর লেখিকা নিজের হোষ্টেল থেকে গ্রেপ্তার হন, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল হোস্টেলে গোপন আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং বিভিন্ন গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ থেকে শুরু হল তাঁর প্রকৃত কারাবাস। কারামুক্তির পর তিনি ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের নির্দেশে 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকার দায়িত্ব

গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিপ্লবীরা কীভাবে সমস্ত দেশকে নতুন প্রেরণা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু। গান্ধীজী চাইছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদলগুলিকে একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একত্রিত করতে। স্বাধীনতা লাভের প্রশ্নে রাজনৈতিক ঐক্যের গুরুত্বটি সে সময় সকলেই স্বীকার করলেন। গান্ধীজী পরোক্ষে আত্মনিবেদিত বিপ্লবী তরুণগুলির আদর্শ ও ত্যাগকে স্বীকার করে ঘোষণা করলেন যে, স্বাধীনতার জন্য চাই সর্বাধিক লোকের চরম ত্যাগ। এই চরম ত্যাগেরই আদর্শ ছিল বিপ্লবীদের। বিপ্লবীরা তাদের গুপ্ত দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করল। কমলাও কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এরপর আঠারো অধ্যায়ে তিনি গান্ধীজীর সংগ্রাম-ক্রিয়ার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন চূড়ান্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রস্তুত করা এবং গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে গণ-আন্দোলনের বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রশ্নে গান্ধীজী বললেন—'আমরা ব্রিটিশ এবং জাপান দু'জনকেই আটকাতে চাই'।[৬০] গান্ধীজী ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে চাইছেন কংগ্রেসও বিপ্লববাদী শক্তিগুলিকে 'ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করো' এই শ্লোগানের ভিতর দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করা।—এ'ভাবেই লেখিকা আলোচ্য গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে মহাত্মা গান্ধী অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের নীতিকে কেমন করে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এবং ঐ প্রসঙ্গে কমলা'র আলোচনার মধ্যে থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্তসংগঠনগুলি কেমন করে গান্ধীজীর সর্বভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হ'ল। গান্ধীজী জানতেন পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রেও চিরাচরিত হিংসার পথে জন-মন সহজে সাড়া দেয়। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলিও হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন। হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নকে আন্দোলনের সামনে তুলে ধরলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নেবে। এজন্য লেখিকা আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন গান্ধীজী কত গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে ভারত-ছাড় আন্দোলনের একটি ঐক্যভূমি তৈরি করলেন।

লেখিকার রাজনৈতিক চিন্তাধারার নতুনত্ব এ'খানেই যে, তিনি সমকালীন

রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন—নিজস্ব উপলব্ধি ও আদর্শের উর্ধ্বে থেকে।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'[৬১] গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক চিন্তার উপাদান যথেষ্ট। লেখক স্বাধীনতা আন্দোলনের যুক্তিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

বৈপ্লবিক আদর্শের বিভিন্নতা কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিপুষ্ট ও বিকশিত করেছিল তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় লেখক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। বিপ্লবী জীবন এবং কারাবাস তাঁর কাছে অতীত স্মৃতি অথচ যুগের ব্যাখ্যায় স্মৃতি যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেনি—

'মানুষ ইতিহাসের প্রয়োজনে সৃষ্ট, আবার ইতিহাস সৃষ্টির উপাদান এই মানুষই যুগিয়ে দেয়। কোন এক প্রকার দার্শনিক মতের উপর এদেশের বিপ্লব আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, তার কারণ, বিদ্রোহের ও বিপ্লবের প্রস্তুতিতেও ক্রমবিকাশ আছে। এই ছোট ভূমিকার উদ্দেশ্য হল এই যে, বিপ্লবীজীবনের স্মৃতির কথাগুলি যেন এই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকরা গ্রহণ করেন।'[৬২] তবে যাদুবাবুর এই স্মৃতি-রোমন্থন পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট বলে কেউ মনে করেন।[৬৩]

আধুনিক যুগে বিপ্লবের সংজ্ঞা বিভিন্ন রাজনীতিক ও দার্শনিকদের কাছে বিভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হওয়ায় ক্রমশ সংজ্ঞাটি জটিল হয়ে উঠেছে। লেখক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্লবের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এগিয়ে চলে। শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টি কেন যে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সেই দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়েই যে বিপ্লবের ব্যাখ্যা করেছেন এই যুক্তিটি তিনি সরাসরি রাখেননি—
'বিপ্লব মানে প্রগতি বা অগ্রগতি। এ গতি সমাজের দ্বন্দ্ব সংযুক্ত অবস্থার ফলে ঘটে। যে অবস্থা বর্তমান তাকে বলা যাক 'বাদ'। তা সংসারে, অর্থাৎ যা চলমান বা সরে সরে যাচ্ছে তার ভিতরে, সৃষ্টি করে বিরোধের ভাব বা বিসম্বাদ। দুটোর সংঘর্ষে হয় অগ্রগতি। কিন্তু প্রত্যেক গতির একটা লক্ষ্য হচ্ছে স্থিতি। সেই স্থিতি অবশ্য আপেক্ষিক, চিরস্থায়ী নয়। তবু তাকে বলা যায় সম্বাদ, অর্থাৎ বাদ-বিসম্বাদের সংঘর্ষে উৎপন্ন একটা সাম্য অবস্থা। এইভাবে চলতে চলতে প্রথম প্রচেষ্টার ফল বা সংগঠন আত্মলোপী হয়। কিন্তু তার থেকে উৎপন্ন প্রেরণাযুক্ত তার সন্তান স্থানীয় রূপান্তরিত গতি সম্পন্ন আর একটা সংস্থা গড়ে ওঠে। কিছুকাল পরে তার অবদান দিয়ে সেও পায় লোপ। এই দৃষ্টি দিয়ে ভারতের

বপ্লবী আন্দোলনকে দেখা উচিত।'[৬৪] বিপ্লবের প্রস্তুতির পথ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বারীন্দ্রের মতবিরোধ ছিল।[৬৫]

'উন্মেষ' অধ্যায়ে তিনি দেশবন্ধু এবং বিপিনচন্দ্র পালের স্বরাজ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কী ছিল তার আলোচনা করেছেন। বিপিন পালের মতে স্বরাজ একটি ডোমিনিয়ান স্টেটাস বা ব্রিটিশের অধীনে স্বায়ত্বশাসন। চিত্তরঞ্জন স্বরাজের ধারণাকে তাঁরই পরিচালিত ফরওয়ার্ড পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ফরওয়ার্ড পত্রিকার নামকরণ যে লেনিনের সম্পাদিত ফরওয়ার্ড পত্রিকার অনুসরণ একথা লেখক জানাতে ভোলেননি। কিন্তু তিনি চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় যাননি। ১৯১৮ সালে লেখক গ্রেপ্তার হন। তাঁর সঙ্গে স্বরাজ পন্থী ও অনুশীলন দলের অনেকে ছিলেন। এই গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে কারাগারের বাইরে চিত্তরঞ্জনের আন্দোলন এবং কারাগারে লেখকদের অনশন ব্রত শুরু হয়। জেলে লেখকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ লাটসাহেবের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক সুরু হয়। লেখক ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করতে কিছুমাত্র ভয় পাননি। জেল জীবন তাঁর কাছে বিপ্লবীজীবনের কষ্টি পাথর। লেখকের মতে রাজনৈতিক জীবনে কারাবাস একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিপ্লবীদের কাছে জেল রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়—

'রাজনীতিকের জীবনে স্বাভাবিক একটা অঙ্গ হচ্ছে কারাবাস। এটা যেন রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা।'[৬৬]

কারাবাসকালেই লেখক এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা জেলের মধ্যে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম স্থির করেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম একটি কর্মসূচী ছিল সামরিক ধাঁচে দেশজোড়া স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলা -।

'ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে যা যা ঠিক হল, তার মধ্যে রইল সামরিক ধাঁচে একটা দেশজোড়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা' হবে প্রথম ও প্রধান কাজ। দ্বিতীয় ধারণা ছিল—এই সরকারকে মানি না" (নন-রেকগনিশন অফ দি স্টেট —এই আন্দোলন। শেষের পরিকল্পনা জীবন চট্টোর মস্তিষ্ক প্রসূত। ১৯২৭ ২৮ সালে সবাই মুক্তি লাভ করি।'[৬৭] অস্ত্র-সংগ্রহের ব্যাপারে এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।[৬৮]

কারাবাস কালে লেখকের চিন্তা ছিল স্বচ্ছ, আত্মপ্রত্যয় ছিল গভীর। যে বিপ্লবী আদর্শ কোনো বিপ্লবীকে বা তার রাজনৈতিক সত্তাকে ঘিরে থাকে এবং বিবর্তিত করে, কারাবাসের প্রতিকূলতা লেখকের সেই আদর্শ ও সত্তাকে পথভ্রষ্ট

করতে পারেনি। আলিপুর জেলের প্রধান কর্তা হাচিংস সাহেব লেখককে কারাবাসের শৃঙ্খলাভঙ্গের আইনানুগ শাস্তির বিভিন্ন দিক পড়ে শুনিয়েছিলেন। লেখক তার উত্তরে জানিয়েছিলেন—

'মনে হল এই সেই জেল, যেখানে ১৯০৮ ১৯০৯ সালে রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত ইংরেজের রাজ্যোচ্ছেদের অভিযোগে একত্রে বাসকরে স্থানটিকে পবিত্র করে গেছে। এর প্রতি ধূলিকণাটা যেন পবিত্র। স্বাধীনতার পথে মুক্তিকামীদে এটি একটি তীর্থক্ষেত্র।

'উন্মেষ' অধ্যায়ের শেষে স্বরাজ পার্টির ভাঙনের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য আছে। গান্ধীজী ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে নিজেই পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব পেশ করায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে স্বরাজ পার্টির রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যায়। গান্ধীজীর 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রস্তাব পূর্বেকার স্বরাজ নামের ইমেজ নষ্ট করে।* ঐ সময় সংযুক্ত বিপ্লবী সংঘে ভাঙন শুরু হয় এবং লেখকও রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বড়লাট চেমসফোর্ডকে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সেই চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথ কারাজীবনে যাদুবাবুকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ পত্র উল্লেখের পর লেখক আমেরিকা-জার্মানের বিরোধ, বিভিন্ন প্রবাসী ভারতীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমেরিকায় 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশ, বার্লিনে ভূপেন দত্ত ও এম. এন. রায়ের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা, লেনিন ট্রট্স্কি বিরোধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বলশেভিক পার্টির ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

প্রথম জীবনে অনুশীলন দলের সমর্থক হলেও যাদুগোপালের রাজনৈতিক চেতনার ভিতটি ছিল মার্কসবাদী। তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রকৃতিকে জয়ের মধ্য দিয়েই সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই বিকাশের একটি পর্যায়ে প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্বে বর্তেছে মানুষের শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে। পুঁজির উদ্ভবের যুগ থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদভোগ ও রক্ষার দিন থেকে যে নতুনতর দ্বন্দ্বের শুরু সেই দ্বন্দ্বই বর্তমানে ভারতবর্ষে রয়েছে। যেহেতু ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য সাম্রাজ্যগ্রাসী লক্ষ্যে এসে পৌঁছোয় তাই ভারতবর্ষের খোলা শ্রেণীদ্বন্দ্বের ওপর এসে

দাঁড়িয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। যাদু গোপালবাবু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যাখ্যা করে বলেছেন এখানে লড়াইয়ের দুটি স্তর—আভ্যন্তরীণ স্তরে রয়েছে কৃষক ও শ্রমিকের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি এবং জাতীয় পুঁজির লড়াই। তার ওপরে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের লড়াই। যেহেতু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় লড়াইয়ের ক্ষেত্রটিকে গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বিকশিত করে তুলেছে তাই জনসমর্থন-হীন সন্ত্রাসবাদী দলগুলির উচিত জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ফ্রন্টে যোগ দেওয়া। অর্থাৎ কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করা। এ সম্পর্কে তাঁর মার্কসীয় বক্তব্য এই যে, প্রত্যেকটি জাতির অন্তরপ্রবাহে সভ্যতার বিকাশ ও বিবোধে নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঝোঁক থাকে। সেই ঝোঁক ঐ জাতির তাত্ত্বিক পটভূমি তৈরি করে। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কংগ্রেসকে গান্ধীবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণ-আন্দোলনের জগতে পৌঁছে দেয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি রাজনীতির দিক থেকে ভারতবর্ষ এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, এখানে কৃষি সভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। কিন্তু যেহেতু জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন সেজন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কংগ্রেস শিবিরে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ঐক্যমতে আসতে হবে। কেননা মার্কসবাদ সর্বদাই শ্রেণীসংগ্রামের পদ্ধতিকে জাতীয় অবস্থার যথানুপাতিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে। সর্বহারা শ্রেণীর কে শত্রু, কে মিত্র তা বিচার হবে সেই সময়কার জাতীয় পরিস্থিতির ওপর। এবং এ জন্যেই 'যুগান্তর' দলকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলেছেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হতে হবে এবং বিপ্লবী দলগুলির বক্তব্য কী হবে সেই সম্পর্কে শ্রীকালীচরণ ঘোষ তাঁর 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন।[৭০]

১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে বসে লেখক 'ভারতের সমর সংকট' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। এই পুস্তিকায় তিনি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য ইঙ্গিত দিয়েছেন। এরও কিছুকাল বাদে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক-পর্ব সম্পর্কে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি যুক্তি ও চিন্তার আলোকে শুধু উজ্জ্বল নয়,

এর থেকে প্রমাণিত হয় কারাবাস প্রকৃতপক্ষেই তাঁর কাছে 'রাজনৈতিক বিশ্ব-বিদ্যালয়' হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালের প্রাপ্ত স্বাধীনতা যে আসলে ব্রিটিশের দেওয়া ডোমিনিয়ান স্টেটাস তার আলোচনায় লেখক স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণামটিকে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে এভাবে স্বাধীনতা পাওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে কংগ্রেসের এক বিরাট রাজনৈতিক পরাজয়।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত তাঁর রচিত 'বিপ্লবের পথে'[৭১] গ্রন্থটিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস বলেননি, বলেছেন 'সৈনিকের ডায়েরীর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে রেখে-ছিলাম' ('লেখকের কথা' অধ্যায়)। লেখক অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সভ্য হিসাবে আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা ও টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। কারাগারের অন্তরালে ছিলেন তেইশ বছর। গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন- 'সেটা ছিল পথ তৈরির যুগ। যারা পথ তৈরি করতে এলো তারা অবিশ্বাস, উপেক্ষা, বিরোধিতা, দেশবাসীর উদাসীনতা, সব তুচ্ছ করে স্বাধীনতার শিখরে পৌঁছবার জন্য পথ রচনা করতে লেগে গেল।

লেখক ১৯ ৪ সালের শেষের দিকে বেঙ্গল অর্ডিনান্স এ বিনা বিচারে প্রথম আটক হন। ১৯২৭ সালে মুক্তি পান। আবার ১৯৩০ সালের ৮ই এপ্রিল বিহার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেল, তারপর রাজশাহী সেন্ট্রল জেল, আবার প্রেসিডেন্সী জেল, সেখান থেকে দেউলী বন্দী নিবাস এবং শেষে আসেন আলিপুর সেন্টলজেলে। এবং এই জেল থেকেই আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয়। এই জেলগুলিতে তিনি কয়েক বছর কাটান। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন।

১৯৩৪ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৩৫ সালে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত এই মামলার ব্যাপ্তি কাল। লেখক পরিবেশিত ঘটনা পঞ্জীর সঙ্গে কালীচরণ ঘোষ প্রদত্ত ঘটনাপঞ্জীয়তে সমর্থন মেলে না।[৭২] টিটাগড় মামলার আপীলের সময় থেকেই বিপ্লবীজীবনের আদর্শ, সংঘাত, আত্মসমালোচনা নতুনতর আদর্শের দিকে বন্দীদের এগিয়ে নিয়ে যায়—'জাতীয়তাবাদের আদর্শের গণ্ডীর বাইরে অনেকের মন ছুটে চলেছে মার্কসীয় দর্শনে, লেনিনবাদে বা স্টালিন পন্থায়।' জাতীয়তাবাদী আদর্শের সমান্তরালে মার্কসবাদী আদর্শ বিপ্লবীচেতনায় স্থান গ্রহণ করে।

ফলে বিপ্লবীদের কাছে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কার্যকরী আদর্শের বিকল্প পন্থা আলোচিতব্য হয়ে ওঠে। জাতীয় মুক্তির দাবী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় বন্দীদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিভূমিতে জাতীয়তাবাদের পুরাতন ভিত খসে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখকের মৌলিক রাজনৈতিক বক্তব্য অনুপস্থিত: জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণের সংবাদটুকু পরিবেশিত হয়েছে।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবের সন্ধানে'[৭৩] গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'নিবেদন' অংশে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সেই সংগ্রাম ও যুগের পূর্বাপর সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন বলে দাবী করেছেন তিনি।

'বিপ্লবের সন্ধানে' কোনো রাজনৈতিক বন্দীর কারাকাহিনী নয়। কারাবাসের অভিজ্ঞতা কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে থাকলেও তৎকালীন যুগের রাজনৈতিক কাহিনী লেখার আগ্রহই তাঁর বেশি। এই সুবৃহৎ গ্রন্থে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন দল ও নেতৃবৃন্দের মত ও পথের পার্থক্য কীভাবে এগিয়ে বেড়ে চলেছিলো তার বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। লেখক 'নিবেদনে' বিষয়বিন্যাস কী কী তা উল্লেখ করেছেন—'এ বইটার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে একদিকে যেমন স্বদেশী আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা, কংগ্রেসের অহিংস স্বাধীনতার সংগ্রাম, কম্যুনিস্ট গণবিপ্লবের আন্দোলন, নিছক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, আজাদহিন্দ আন্দোলন ও বিপ্লব প্রচেষ্টা, 'আগস্ট বিপ্লব' ও আপোষপন্থী সংগ্রাম, পাকিস্তান আন্দোলন ও দেশবিভাগ, স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন, ব্রিটিশ আইনসিদ্ধ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ধারা দেখানো হয়েছে,—সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হয়েছে এর সমান্তরাল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিকাশের ধারা, এবং এই দুই ধারার ঘাত-প্রতিঘাত।'

লেখকের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে স্বাধীনতা অর্জনের ন্যায়সংগত পথ নির্ধারণে ভারতবর্ষে বহুমুখী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালে এই বহুধা বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলিকে কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করার জন্য এদেশের নেতৃবৃন্দ কোনো সংগঠিত ফ্রন্ট গঠনে অসমর্থ ছিলেন।

আন্দোলনের এই দুর্বলতাকে ব্রিটিশ সরকার বারবার কাজে লাগিয়েছে। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল এই সময়ের মধ্যে নানা দল, উপদল বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে। কিন্তু বিপ্লবী দলগুলির বা কংগ্রেসের তরফ থেকে ফ্রন্ট গঠনের কোনো উৎসাহ ছিল না। সেই সময় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষে লেখক শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ফ্রন্ট তৈরি করেছিল। অথচ ব্রিটিশ বিরোধী কোনো ফ্রন্ট গড়ে ওঠেনি। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে তিনি অনুশীলন দলের মতো বিপ্লবী পার্টি, স্বরাজ পার্টি, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কম্যুনিস্ট পার্টি ইত্যাদি দলগুলির এবং গান্ধীজী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক বিরোধিতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বিরোধিতা স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতখানি ক্ষতিকর হয়েছিল তারও ছবি তুলে ধরেছেন। লেখক ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে তিন বার কারাবরণ করেন। পৈত্রিক সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে কলকাতার বরানগরে এসে বসবাস শুরু করেন এবং স্বদেশী কাজে লিপ্ত হন।

আলিপুর সেন্টাল জেলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা ও শিবপুর ডাকাতি মামলার আসামীদের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার রায়-বাহাদুরের সঙ্গে এঁদের একদিন সংঘর্ষে ঐ ওয়ার্ডার নিহত হন এবং এঁদের ফাঁসির হুকুম হয়। লেখক এবং অন্যান্য স্বদেশীরা এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁরা জেলচত্বরে ফাঁসি দেবার বিরোধিতা করলেন। এই ফাঁসিকে কেন্দ্র করে ঐ সময় জেলে স্বদেশী-চেতনার ঝড় বয়ে যায়। লেখক এরপর অল্প কিছুদিনের জন্য শান্তিপুরে অন্তরীণ হয়েছিলেন। অন্তরীণ থাকাকালে লেখকের মনোবল ভেঙে পড়েছিলো। বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রাথমিক আয়োজন ব্যর্থ হওয়ায় অন্যান্য স্বদেশীরাও সে সময় ভবিষ্যৎ আন্দোলন সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত এবং জিজ্ঞাসু ছিলেন—

'এক অংক শেষ হয়েছে প্রথম ব্যর্থতায়, এখনও যবনিকাপাতের অনেক দেরী, নতুন অংকে নতুন সাজে আবার বিপ্লবের শুভসূচনার উদ্‌বোধন করতে হবে, কেমন করে, জানিনা।' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের স্বরূপ কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে ১৯১৯ সাল থেকেই তীব্র মতবিরোধ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে নারায়ণবাবু পরবর্তীকালে নাগপুর কংগ্রেসে বিপিন পাল, জিন্না সাহেব ও মহাত্মা গান্ধীর

পারস্পরিক বিরোধিতার চিত্র তুলে ধরেছেন। 'Attainment of self-Government within British Empire by Constitutional means' কংগ্রেসের এই পূর্ববর্তী প্রস্তাবের বদলে নতুন প্রস্তাব হল 'Attainment of Swaraj by peaceful and legitimate means.' পরিবর্তন যে কতখানি তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এইসঙ্গে অহিংস আন্দোলনের আদর্শ হিসাবে 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' শব্দটি যুক্ত হল। গান্ধীজী কনষ্টিট্যুশানাল' শব্দের জায়গায় গণ-আন্দোলনকে ব্যাপক করা যাবে চিন্তা করে 'লেজিটিমেট' শব্দটি বসালেন। বিপিনচন্দ্র এই সংশোধনীকে কংগ্রেসের বিপদ বলে বর্ণনা করলেন। মহাত্মা গান্ধী বললেন—

'আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকব কি না সেটা একটা খোলা প্রশ্ন থাক। তার মীমাংসা নির্ভর করুক সরকারের ব্যবহারের উপর।'

জিন্না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত স্বরাজ প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—'কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে স্বরাজকে নিয়ে যেতে পারে না। সময় এলে তা জনগণ ঠিক করবে, কংগ্রেস নয়।' লেখক কেবলমাত্র স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন না তিনি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সবকিছুকে সচেতনভাবে লক্ষ্য করতেন। কংগ্রেসের মধ্যে নতুনতর উত্তেজনা, জওহরলাল নেহরুর সোসালিজমের প্রস্তাব, রাজনৈতিক মঞ্চে সুভাষবাবুর আবির্ভাব, সাইমন কমিশনের নীতি-নির্ধারণ, কমিংটার্ণ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বহিষ্কার, ১৯২৭ সালে চীনে প্রথম কম্যুনিস্ট বিপ্লব প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ইত্যাদি ঘটনাগুলির বিক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এই ঘটনাগুলির আলোচনার অবকাশ কম। আলোচ্য গ্রন্থের একটি ত্রুটি হল এই যে, তিনি জাতীয় আন্দোলনের ধারাগুলি এবং সমকালীন বৈদেশিক ঘটনাবলীকে সন তারিখের নিরিখে সজ্জিত করেন নি। আলোচনার কোনো বৈজ্ঞানিক সূচী নেই এবং ইতিহাস বর্ণনায় ক্রমবিন্যাস অনুপস্থিত। লেখক স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে থেকে কীভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ঝুঁকলেন তার একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ১৯৩২ সালে যখন প্রেসিডেন্সি জেলে কারারুদ্ধ হন তখন থেকে কম্যুনিস্ট ধ্যানধারণায় তিনি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। অবশ্য এর আগে তাঁকে রুশ বলশেভিক মতবাদ এবং চীনের কম্যুনিস্ট ক্রিয়াকলাপ প্রভাবিত করেছিল। এখানে একটি ঘটনা লক্ষণীয় যে, লেখক সাম্যবাদী পড়াশুনার সূত্রপাত প্রথমে না করে নৈরাজ্যবাদের ওপর পড়াশুনা করেছিলেন।

order to avoid all complications, in my proposal I have confined myself only to India. If India becomes free the rest must follow, if it does not happen simultaneously.'[৭৫]

অর্থাৎ যে ব্রিটিশ জার্মানীর সঙ্গে প্রাণপণে লড়ছে তখন আমরা স্বাধীনতার দাবী করতে পারি কি? এ জাতীয় নৈতিকতার প্রশ্ন তুললেন গান্ধীজী। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি এই সময় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গৌণ বলে মনে করলেন। এবং এখান থেকেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির নতুন করে বিরোধিতার সূত্রপাত। ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচারে কেন গৌণ হয়ে গেল এ প্রশ্ন নিয়ে আজও তর্কের অবকাশ আছে। অথচ ঐ সময় চীনের কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরা ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করলেও দেশের বুর্জোয়া কাঠামোকে আঘাত করার প্রশ্নে সক্রিয় ছিল। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ঐ সময় চীন ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক ছিল না, কিন্তু এ কথা ঐতিহাসিক সত্য জাপ বিরোধী আন্দোলনে মাও-সে-তুঙ্ চীয়াং কাইশেক সরকারের সঙ্গে ফ্রন্ট তৈরি করেছিলেন।

কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনা করে লেখক মন্তব্য করছেন—

'কিন্তু ভারতে যখন বিপ্লবের অবস্থা এবং সুযোগ এল, তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গিরনি কামগর ইউনিয়নের সমাবেশ এবং প্রস্তাব দেখিয়ে প্রলেটারিয়ান পথের বচন দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা ঘোষণা করে গান্ধী কংগ্রেসের ঐ মহান দার্শনিক সংগ্রাম হজম করে ফেললে। মোটকথা বিপ্লবের অবস্থা সব দিক দিয়ে অনুকূল হয়েছিল, পেকে ছিল, কিন্তু গান্ধীচক্রের কারসাজিতে সে সুযোগ বানচাল হয়ে গেল।'[৭৬]

এবং এরপর থেকেই দেখা যায় লেখকের কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শেই আর আস্থা নেই। লেখক প্রত্যক্ষ রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরে এসে ক্রমাগত তাঁর আলোচনাকে গান্ধীবাদ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনায় সীমাবদ্ধ করলেন। এবং সেই প্রশ্নেই সম্ভবতঃ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'বিপ্লবের সন্ধানে।'

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের যথার্থ মূল্যায়ন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজও হয়নি। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, রণকৌশল ইত্যাদি এক শ্রেণীর ভারতীয় রাজনীতিকদের কাছে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবীসত্তা যে আজাদ হিন্দ

সরকারের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকার তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল এও ঐতিহাসিক ঘটনা।[৭৭] সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা একটি রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করেছি যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে যে-কোনো মূল্যেই ঔপনিবেশিকবাদের বিরোধিতা করতে হবে। এবং এই মূল্যেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিতর্ক থেকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক চরিত্র হয়ে ওঠেন।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত চিত্তরঞ্জন দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণের মধ্যে গড়ে উঠলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব-পর্ব হরিপুরা কংগ্রেস থেকে (১৯৩৮) সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট গঠনের (১৯৪৩) কাল পর্যন্ত।[৭৮] ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন এই সময়কালে একটি রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-প্রস্তুতি এবং ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে বিশ্বের রাজনৈতিক শিবিরগুলির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হওয়া। য়ুরোপে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা যতখানি জরুরী প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা ছিল না। অথচ ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার প্রশ্নে এবং সেইসূত্রে ফ্যাসি বিরোধী ব্রিটিশকে সাহায্য করার প্রশ্নে কংগ্রেসের একাংশ, জওহরলাল নেহরু এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে আপোষ ও বন্ধুত্বের প্রশ্নে এক ছিল। একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু রাজনৈতিক সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন এবং এই কাল-পর্বে (১৯৩৮-৪৩) আপোষহীন ব্রিটিশ বিরোধিতায় সোচ্চার ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তদানীন্তন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, ফ্যাসিবাদ ভারতবর্ষের পক্ষেও বিপদজনক। সুতরাং এই মুহূর্তে কংগ্রেসের উচিত ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করা এবং ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করা।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরোধের কারণগুলির বিশ্লেষণ আজও গভীর ঐতিহাসিক সমীক্ষার দাবী রাখে। এবং সেই সূত্রে সুভাষচন্দ্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২' গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথাকথিত কারাসাহিত্যের মানদণ্ডে গ্রন্থটি গৃহীত না হলেও বিভিন্ন সময়ে সুভাষচন্দ্রের কারাবাস কালের অভিজ্ঞতা গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ। এই বিশেষ অংশটির প্রতি আমাদের আগ্রহও আলোচনা। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত।

সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তির

নিরেখে বিশ্লেষণ করা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী কত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৪ সালের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন—'বিদেশী পর্যবেক্ষকের নিকট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করিতে (এই গ্রন্থ) সাহায্য করিবে। যদি এই উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সফল হয় তাহা হইলে আমার শ্রম ব্যর্থ হইবে না'। এই গ্রন্থের অনূদিত বাংলা সংস্করণের 'নিবেদন' অংশে শিশির কুমার বসু জানিয়েছেন—

'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ও ১৯২০ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে মূল গ্রন্থের বাকি দশটি অধ্যায় ও পরিশিষ্টে ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত নেতাজীর বহু গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা, অন্যান্য রচনা, পত্র ও সমকালীন কূটনৈতিক দলিল ইত্যাদির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।'

নেতাজীর ভারত-চিন্তা, স্বাধীনতার প্রশ্নে নীতিগত ও কৌশলগত পদক্ষেপ, কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতা, মহাত্মাজীর রাজনৈতিক চরিত্র ইত্যাদি যাবতীয় কূটনৈতিক প্রশ্ন সুভাষচন্দ্র আলোচ্য গ্রন্থে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। যেহেতু আমাদের আলোচ্যবিষয় কারা-জীবনে বন্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার নানা দিক পর্যালোচনা করা সেজন্য আমরা আলোচ্য গ্রন্থের (১ম/২য় খণ্ড) সামগ্রিক বিশ্লেষণে প্রবেশ করবো না।

ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন বিষয়ে জাতীয় নেতৃত্বে মতবিরোধ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মন্তব্য আমরা এই প্রসঙ্গে সামান্য অংশ উদ্ধার করছি :—

"১৯৪০ সালের ২০ শে মে পণ্ডিত নেহরু যে বিবৃতি দেন উহাতে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ব্রিটেন যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে রত সেই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করা ভারতের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হইবে।" অনুরূপভাবে মহাত্মা বলেন, "ব্রিটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়া আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাহি না। উহা অহিংসার পথ নহে।" স্পষ্টই বুঝা গেল যে, ব্রিটেনের সহিত কোন এক মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য 'গান্ধীবাদীদল সম্ভাব্য সব কিছুই করিতেছে।"[৭৯]

সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে তিনবার কারারুদ্ধ হন। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রথমে যখন বন্দী হন সে সময় তাঁর রাজনৈতিক চেতনা

উন্মুখ ছিল সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার পর্যালোচনায়। জেলে দিনের পর দিন আইন সভায় কেন কংগ্রেস যোগদান করবে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলত। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর চিন্তা মেনে নিয়েছিলেন যে কংগ্রেস আইনসভা বর্জন করলে ব্রিটিশ সমর্থক ভারতীয়রা আইন সভা দখল করবে। এবং আইন সভার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস জনগণের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠবে। এই সময় আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে দুটি দল দানা বেঁধে ওঠে। সুভাষচন্দ্র মনে করেন এই জেল থেকে ভবিষ্যতে স্বরাজপন্থী এবং পরিবর্তন বিরোধী গ্রুপের সূত্রপাত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশবন্ধু প্রস্তাবিত কংগ্রেসের কার্যসূচীর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধীজী কংগ্রেসকে শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। দেশবন্ধু এবং সুভাষচন্দ্র এর বিরোধিতা করেছিলেন।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জন দাসের মধ্যে কংগ্রেসের কর্মসূচী বিষয়ে যে সমস্ত মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা একজন বন্দীর চোখে পর্যালোচিত হয়েছে। এরপর নেতাজী ১৯২৪ সালের ২৫ শে অক্টোবর গ্রেপ্তার হন এবং ব্রহ্মের মান্দালয় জেলে কারারুদ্ধ হন। এই জেল জীবনে তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিশী অত্যাচারের কথা উপস্থাপিত করেন 'এ্যাসিটান্ট ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ' লোম্যানের কাছে। লোম্যান স্বীকার করেছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচারের অভিযোগ যথার্থ। বর্মায় বন্দী থাকাকালীন তিনি ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, অপরাধীদের মনস্তত্ব, কারা-সংস্কারের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে গভীরভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন। ব্রহ্মদেশের হারানো উজ্জ্বল দিনগুলির এবং তার বর্তমান দৈন্য ও পরাধীনতা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

এরপর জেলে থাকাকালীন তিনি কিভাবে বঙ্গীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য উদারপন্থী দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ বসুর বিপক্ষে জয়লাভ করলেন. তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই মান্দালয় জেল থেকে তাঁকে ইনসিন জেল ও আলমোড়া জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং শেষ পর্যন্ত আলমোড়া যাবার পথে শারীরিক কারণে তিনি ১৯২৭ সালের ১৬ই মে মুক্তি লাভ করেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার স্বরূপ কী এই প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ব্রিটিশ

ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় পর্যায়ে একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তোলা তাঁর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল। এই সামরিক সংগঠনকে তিনি পরিপুষ্ট করতে চেয়েছিলেন শ্রমিক এবং কৃষককে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে একতাবদ্ধ করে। জেলে অবস্থানকালীন তিনি মালিক-শ্রমিকের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, জমিদারীতন্ত্র উচ্ছেদ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি নানা সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সূত্র আলোচনার প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তরে বারবার উল্লেখ করেছেন। বন্দীদশার দিনগুলিতে তিনি ক্রমাগত অনুশীলন করেছেন সেই সমস্ত গ্রন্থ যার মধ্যে দিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি তাঁর কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ১৯২৫ সালের ২৫ শে জুন মান্দালয় জেল থেকে তিনি একটি চিঠিতে লিখছেন ব্রার্টাণ্ড রাসেলের 'প্রসপেকটস্ অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেসন' তিনি এবং অন্যান্য বন্দীরা পড়ছেন, চেয়ে পাঠাচ্ছেন 'ফ্রি থট এণ্ড অফিসিয়াল প্রোপাগাণ্ডা' নামক বইটি।[৮০]

ইনসিন জেল থেকে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র লিখছেন—'১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পূর্বেই তাঁহারা (ব্রিটিশ গোয়েন্দা) আমাকে একজন বড়ো বলশেভিক নেতা বলিয়া জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরকালের মত রুদ্ধ হইয়া যাইবে কারণ ইউরোপের লোক বর্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না।' ইনসিন জেলে থাকাকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিদেশে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের অছিলায় নির্বাসিত করতে চেয়েছিল; সুভাষচন্দ্র এই চালাকি ধরতে পেরেছিলেন। এবং উপরোক্ত চিঠিতে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের নির্বাসিত করার 'ধাপ্পাবাজি'টি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। অপর একটি চিঠিতে (৫ই এপ্রিল, ১৯২৭) তিনি লিখছেন—'জাতীয়তার ভিত্তি স্বরূপ কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধানের জন্য লেখাপড়া ও গবেষণা করিয়াছিলাম—আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে।' অর্থাৎ জেলে থাকাকালীন সুভাষবাবু জাতীয়তার স্বরূপ নির্ধারণে নিরলস অধ্যয়ন করেছিলেন। ৬ই মে ১৯২৭ সালে আর একটি চিঠিতে লিখছেন—'জীবন সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ, সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ......এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে, ক্রিয়াশীল সক্রিয়াত্মক।' এই প্রসঙ্গে তিনি হেগেলের 'এবসলিউট আইডিয়া,' সোপেন হাওয়ারের 'অন্ধ ইচ্ছা শক্তি' এবং বার্গসনের 'এলান ভাইটাল' ইত্যাদির মানবেতিহাসের অনির্দিষ্ট গতিশীলতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের প্রশ্নে বলেছেন সংগ্রাম রক্তমাংসের বিরুদ্ধে নয়, সংগ্রাম অন্ধকারের নায়কের বিরুদ্ধে, উচ্চ পদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জেলে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র লিখিত পত্রগুলি রাজনৈতিক চিন্তা, দর্শন চিন্তা, স্বাধীনতার বিভিন্ন প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়ে সুভাষচন্দ্রকে জানা এবং বোঝার একমাত্র বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল। তাঁর চিন্তা ও চেতনার মূল্যায়ন উপসংহারে তাঁর ভাষাতেই ব্যক্ত করছি—

"আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের মনোবৃত্তি জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।"

'শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের'[৮১] লেখক নিজে কারাবাস করেননি। এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের একজন হিসেবে তিনি যতীন দাসের সঙ্গে ভারতের মুক্তি সংগ্রামেও অংশ গ্রহণ করেননি। তিনি এমন একজন মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে চিত্রিত করেছেন যিনি দেশকে জননী বলে মনে করতেন এবং সেই জননীর মুক্তি সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

যতীন দাস ১৯০৪ সালের ২৭ শে অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন কলকাতার শিকদার বাগানে মাতুলালয়ে। তাঁর বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে এমন একটি রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে যখন বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। তাঁর কৈশোর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯১৯ সালের ব্রিটিশ সরকার মণ্টেগু প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার বিল ও সেই সঙ্গে কুখ্যাত রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন। যতীন দাস তখন কলেজে পড়েন। গান্ধীজীর আহ্বান শুনলেন 'Education can wait, but swaraj cannot'; ফলে যতীন দাসের ছ'মাসের জেল। ১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট উত্তরপ্রদেশে কাকোরী রেলস্টেশনের কাছে দুঃসাহসীক ট্রেন ডাকাতি হয়। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হিসাবে যতীন্দ্রনাথকে মেদিনীপুর জেলে পাঠান হয়। এখান থেকে মৈমনসিংহ জেলে। এই জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আচরণের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করেন। জেল-কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা ২২ দিন অনশন করেন। তদানীন্তন ডি· আই· জি লোম্যানের হস্তক্ষেপে এই বিপ্লবীরা অনশন ত্যাগ করেন। এরপর যতীন্দ্রনাথ মুক্তি লাভ করেন।

পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বাংলা ও বিহার জড়িয়ে এক আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক হিসাবে যতীন দাসকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হল ১৪ই জুন, ১৯২৯ সালে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল স্যানডার্সকে হত্যা। লাহোর জেলে বিপ্লবীরা রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার জন্য ৬ দফা দাবী পেশ করেন। দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় তাঁরা অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। সমবেত অনশনের প্রশ্নে একমাত্র যতীন দাস আপত্তি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গভর্মেণ্টের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করাতে গেলে অন্ততঃ দু-একজন কে শেষ পর্যন্ত অনশনে প্রাণ দিতে হবে। তিনি বলেছিলেন অনশন ধর্মঘট কোন মতেই যেন ছেলেখেলায় পর্যবসিত না হয়। ১৯২৯ সালের ১৩ই জুলাই যখন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের ২৯ দিন অনশন চলছে সেই দিন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণের দাবীতে যতীন দাস আমৃত্যু অনশন ধর্মঘটের শপথ গ্রহণ করলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের মর্যাদাকে সরকার ও সাধারণের চোখে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ১৯২৯ সালের ১১ই আগস্ট লিবার্টি পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হলো "The spirit of freedom must be kept alive at any cost if the nation is to live again and these youngmen offer their own bodies as fuel that the sacred fire may be kept burning from generation to generation".

ক্রমশঃ যতীনদাস অসুস্থ হয়ে পড়লেন গুরুতরভাবে। গায়ে ভীষণ উত্তাপ এবং নাড়ীর গতি রুদ্ধ হয়ে এল। ১৭ই আগস্টের (১৯২৯) মেডিক্যাল রিপোর্ট গায়ের তাপ ১০৩ ডিগ্রি। অবস্থা সংকটজনক, তবু অনশনভঙ্গের কোন প্রবৃত্তিই তাঁর নেই। ডাঃ গোপীচাঁদ তাঁকে বললেন সরকারের নীতির পরিবর্তন দেখার জন্য যতীন দাসের বেঁচে থাকা প্রয়োজন, ঔষুধ খাওয়া প্রয়োজন। তিনি জানালেন, 'এই গভর্নমেণ্টকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না।......ওষুধ খাওয়ার মানে এই নির্যাতনের মেয়াদ বৃদ্ধি মাত্র।' আচ্ছন্ন যতীন দাস কোন কথা বলছেন না, সকলেই চাইছেন তিনি শান্তিতে শেষ ক'দিন অতিবাহিত করুন। ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর মৃত দেহ দক্ষিণ কলকাতার কালীবাড়ির সামনে আনা হবে। তখন তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কণ্ঠ রুদ্ধ, শরীর অবশ। হঠাৎ দিব্যচেতনা লাভ করলেন তিনি। ভাই কিরণচন্দ্রের কানে কানে বললেন—তাঁর দেহ যেন কালীবাড়ির সামনে না নেওয়া হয়—'আমি আগে ভারতীয় তারপর বাঙালী'। ২রা আগস্ট ডাঃ গোপীচাঁদের সঙ্গে যতীনদাসের যে কথোপকথন হয়েছিল

সেখানে যতীন দাসের আত্মত্যাগ এবং দেশ প্রেমের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত চিরঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছে তা আমরা তুলে ধরলাম :—

"ডাঃ গোপীচাঁদ—সুপ্রভাত মিঃ দাস

মিঃ দাস—সুপ্রাভত (গলার স্বর অতি মৃদু)

ডাঃ গোপীচাঁদ—আপনি জল ও ওষুধপত্র কিছু খাচ্ছেন না কেন ?

মিঃ দাস—আমি মরতে চাই

ডাঃ গোপীচাঁদ—কেন ?

মিঃ দাস—কারণ আমার দেশ। কারণ আমি রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদাকে তুলে ধরতে চাই।"

২রা সেপ্টেম্বর যতীনদাসের অবস্থা সংকটজনক দেখে এবং পাঞ্জাব জেল এনকোয়ারী কমিটির সদস্যদের অনুরোধে ভগৎ সিং ও অন্যান্য সহযোগীরা অনশন ভঙ্গ করেন। কিন্তু এই সংবাদ যতীন দাসকে জানোনো হল না পাছে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আদর্শে অবিচল যতীন দাস স্বেচ্ছামৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আদর্শচ্যুতির কষ্টে ব্যথিত হন। এর কিছুদিন পর ১৯২৯-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর সেই ঐতিহাসিক দিন—যেদিন 'বাংলার দধীচি' যতীন দাস মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন এবং তার ফলে এই শহীদত্বই রাজনৈতিক ও অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে সরকার এ, বি ও সি ক্লাস প্রবর্তন করেন।

যতীনদাসের রাজনৈতিক জীবন এবং এই মৃত্যুবরণ আপাত দৃষ্টিতে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য বহন করে না। এমন কি কারাবাসে তিনি এমন কোনো গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি রেখে যাননি যা থেকে যতীন দাসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু তিনি এই মহান আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পাতায় নতুন একটি অলিখিত রাজনৈতিক পাণ্ডুলিপি সংযোজন করেছেন তা হল এক নির্ভীক দেশপ্রেমিক কীভাবে চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশকে, জাতিকে সংগ্রাম ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। প্রকৃত অর্থে তিনি একটি 'মৃত্যুহীন প্রাণকে' ত্যাগের আদর্শ হিসেবে দেশবাসীকে দান করেছেন। তাঁর মৃত্যু বাংলা দেশের স্বদেশী বিপ্লবী আন্দোলনের রাজনৈতিক আদর্শটিকে নতুন করে তুলে ধরেছে। মৃত্যুর এই অমরতা পরবর্তীকালে দেশপ্রেমিকদের মুখে মুখে হয়েছে প্রতিধ্বনিত 'ডু অর ডাই' এই বাণীর মধ্য দিয়ে।

শহীদ যতীন দাসের মৃত্যুর পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা-সভার কাজ মুলতুবি রাখেন। তিনি সভায় স্বরাষ্ট্রসচিবের উদ্দেশ্যে বলেন—

"Unfortunately, as we all know, Jatin Das is no more...... It is said, Sir, that Nero fiddled while Rome was burning. Our benign Government has gone one better than Nero. It is fiddling on the death beds of these young men, misguided they may be, but patriots they are all the same. They are watching their precious lives pass away inch by inch..."[৮২]

রবীন্দ্রনাথ যতীনদাসের মৃত্যু সংবাদে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে তখন 'তপতী' নাটকের মহড়া বন্ধ করে দেন। সেই রাত্রেই তিনি এই বেদনাকে অন্তরের তীব্রতা দিয়ে প্রকাশ করলেন—

"সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহ ॥
দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥
দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হ'তে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত ॥
তব দীপ্ত রৌদ্রতেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে,
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥"

যতীন দাস মোট ৬২ দিন অনশনরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর এই অনশনব্রত দেশপ্রেমের যে রাজনৈতিক বাণী বহন করে তা তুলে ধরবার জন্যই এই আলোচনায় আলোচ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্তি। এখানে অনশন জেল-জীবনের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এমন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে যতীন দাস অত্যাচারিত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর বিদ্রোহের ভাষা আলাদা, এজন্য আমরাও সেই ভিন্ন ভাষাকে রাজনৈতিক চিন্তার মানদণ্ডে আলোচনা করলাম।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রণীত 'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা' [৮৩] এক প্রধান বিপ্লবীর আত্মজিজ্ঞাসার কাহিনী। ফেলে আসা রাজনৈতিক মঞ্চটিকে তিনি নতুন করে পরিক্রমা করেছেন। সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন কীভাবে তাঁর বৈপ্লবিক সচেতনতা একটির পর একটি রাজনৈতিক উত্তরণে সাহায্য করেছে। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসার প্রথম পর্বটি জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের কাহিনী।' তিনি একটি রাজনৈতিক যুগের পটভূমি

ও পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন ধারাবাহিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের চিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। আলোচ্যগ্রন্থে তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার তিনটি স্তর ;— প্রথম স্তরে এক তরুণের জাতীয়তাবোধ স্ফুরণের কাহিনী। এই পর্বে তিনি নিজেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চেতনায় কীভাবে গড়ে তুললেন তার সমীক্ষা রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ইতিহাস। এই পর্বেও তাঁর একটি মানসিক তর্ক ছিল। একদিকে বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সচেতনতা অন্যদিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের নীতি—এ'দুয়ের মধ্যে তিনি যুক্তি ও তর্কের মধ্যে দিয়ে প্রথমটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে বলা চলে, মতাদর্শগত সংগ্রামের স্তর। শেষ পর্বে তিনি কম্যুনিষ্ট ভাবধারায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী। এবং এই শেষ পর্বটির পরিপূর্ণতা ঘটেছিল কারাগারে বন্দীদশায়। আলোচ্য গ্রন্থটিতে দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রচলিত একটি চীনা প্রবাদকে নস্যাৎ করা হয়েছে। চীনা প্রবাদটির মর্মার্থ হল জানা সোজা, করাই কঠিন। বস্তুত কর্মের দ্বারা কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না, পালটানো যায় না নিয়তির কোন বিধান। কিন্তু এই যুক্তি খণ্ডন করে সান ইয়াৎ সেন প্রতিষ্ঠিত করেছেন—করা সহজ, জ্ঞানলাভ কঠিন। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থটির গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্বে পঠন-পাঠন ও চিন্তার মধ্য দিয়ে তিনি এসময় একজন যথার্থ তাত্ত্বিক বিপ্লবী হয়ে উঠলেন।

দ্বিতীয় পর্বে লেখক সমাজসেবক সংঘ, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল প্রভৃতি গুপ্ত সমিতির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হন। ঐ সময় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং গান্ধীর আইনঅমান্য আন্দোলন তাঁকে সক্রিয় বিপ্লবপন্থায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। এরই সমান্তরালে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস লেখককে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে—'গোপন পথে কয়েকখানা বইও হাতে পেয়েছি। ম্যাকসিম গোর্কীর 'মাদার' বইটিও মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।' লেখকের কাছে নবজাত সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা ও সমান মর্যাদা অধিকারের শ্লোগান নতুন ধরণের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা। এই পর্বে তিনি কংগ্রেসের নরম ও চরমপন্থী গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।[৮৪] লেখকের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের মূল দ্বন্দ্ব ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন বনাম পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য করে নয়—দ্বন্দ্ব স্বাধীনতার

স্বরূপ বিশ্লেষণে। স্বাধীনতার পর জনজীবনে কী কী মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে সে সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী নেতারা নীরব ছিলেন। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের এনার্কিষ্ট বা টেরোরিষ্ট বলা হতো। লেখক যেহেতু বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছেন সেইজন্য তিনি হিন্দু রিপাবলিকান এসোসিয়েশন পরিচালিত 'দি রিভোলিউশানারি' নামক ইস্তাহারটির রাজনৈতিক ভাষ্যে মুগ্ধ হন। এতে বলা হয়েছিল—'সন্ত্রাসবাদ বা নৈরাজ্যবাদ আমাদের লক্ষ্য কখনই নয়। আমাদের উদ্দেশ্য সংগঠিত ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।' তিনি তখন রাজনৈতিক চিন্তায় আরও পরিণত হয়ে ওঠেন—'আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে দেখতে শিখি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পটভূমিতে।' এই পর্বে তিনি বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলন, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন মত ও পথের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার সারসংক্ষেপ করলে বোঝা যাবে মার্কসীয় গণ-আন্দোলনের তত্ত্বগত ও কৌশলগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লেখক সত্যেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাসী।

'৩২ সালে সত্যেন্দ্রনারায়ণ ছাত্র আন্দোলনের নেতা হিসেবে বন্দী হন। বন্দীজীবনে তিনি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মার্কসীয় পন্থায় সংগ্রাম চালানোর ইস্তাহার প্রকাশ করেন। তিনি প্রচার করেন অহিংস পন্থায় পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে পারে না। সেলুলার জেলে তিনি কম্যুনিস্ট কনসোলিডেশন্ গঠন করেন। যার উদ্দেশ্য—"সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন গঠন ছিল পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদী উত্তরণের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।"[৮৫] জেলখানায় কৃষকশ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবের পাদপীঠে তত্ত্বগতভাবে আনার চেষ্টা করে এই কনসোলিডেশন। ক্রমাগত কম্যুনিস্ট বিপ্লবে রণনীতি ও রণকৌশলের দিকগুলি আয়ত্ব করেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে 'মুক্তির নবদিগন্ত' অধ্যায়ে হেগেল, মার্কস ও এঙ্গেলস্—এঁদের রচনাবলী থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি উদ্ধার করে তিনি কম্যুনিস্ট মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় স্মর্তব্য। লেখক 'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা'র প্রথম পর্বে কীভাবে কম্যুনিস্ট হয়ে উঠলেন তার যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে লেখকের এবং অন্যান্য কম্যুনিস্টদের কীভাবে রাজনৈতিক মতান্তর ঘটলো এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদের ত্রুটিগুলি কী তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেননি। কারাজীবনে প্রবেশের পর থেকেই কম্যুনিস্ট আদর্শ, ভাবধারা ও

আন্দোলনে তিনি সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। কারাসাহিত্যের ইতিহাসে এ-জাতীয় গ্রন্থ একারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে, এখানে একজন পরিণত তাত্ত্বিক মার্কসবাদী যৌবনে কীভাবে মার্কসীয় চিন্তাধারায় ক্রম-পরিণত হয়ে ওঠেন তার তত্ত্ববহুল আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার একদিকে রয়েছে প্রাক্-কারাজীবনের রাজনৈতিক চেতনা অন্যপ্রান্তে কারাজীবনে অবস্থানকালীন রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রয়োগের সংবাদ।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল—এই পর্ব ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক চরিত্র দ্রুত পরিবর্তনের কাল। ভাইসরয় লিনলিথগো যখন ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষ জার্মানির সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তখন থেকেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃতি এবং কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। লাহোর কংগ্রেসে মুসলিম লিগ ভারত ভাগ করবার প্রস্তাব দেয়। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস শুরু করে আইনঅমান্য আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র বসুর ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে অন্তর্ধান সংবাদ প্রচারিত হয়। গান্ধীজী ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে ব্রিটিশ জার্মান বিরোধী হয়ে ওঠে এবং মিত্রশক্তি গঠন করে। এইরকম একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার কালে বোম্বাইয়ে নৌ বিদ্রোহের সূত্রপাত।

এই নৌ-বিদ্রোহের একটি তথ্যনিষ্ঠ ইতিকথা লিখেছেন ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, যিনি বিদ্রোহের একজন সংগ্রামী নাবিক। লেখক ইতিকথা লিখেছেন, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেননি।[৮৬] তা না করলেও গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে ভূমিকায় ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন—'যদি এইভাবে তাঁদের নিজ নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে সরকারী কেন্দ্রীয় ইতিহাস সংস্থায় পাঠিয়ে দেন বা প্রকাশ করেন, তাহলে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক অলিখিত অধ্যায়ের প্রকাশ ঘটবে।'

কেন জানি না সিপাই বিদ্রোহ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং ঐতিহাসিক-গণ প্রবন্ধাদি ও গ্রন্থরচনায় যতখানি সচেষ্ট ছিলেন নৌ-বিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় তাঁরা ততখানি নীরব। ফণিভূষণ এই নীরবতা ভঙ্গ করেছেন তাঁর ইতিকথায়। তিনি ইতিহাসের একটি অলিখিত অংশকে সুস্পষ্ট করেছেন। নৌ-বিদ্রোহের ব্যাপ্তিকাল ১৯৪৩ সালের ৯ই আগস্ট থেকে ১৯৪৬ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। তিন বছর সময়সীমার ঘটনা হলেও এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের

বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রায় দু'শ বছরের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

লেখক জেল-জীবনের অভিজ্ঞতার সংবাদ আলোচ্যগ্রন্থে মুখ্য করে তোলেননি। তাঁর উদ্দেশ্য নৌ বিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমিকে তুলে ধরা। তবে একথা সত্য যে, তাঁর কারাবাস এই বিদ্রোহকালের একটি মধ্যবর্তী পর্বের ঘটনা। এবং এ-জন্যই গ্রন্থটি আলোচিত হবার দাবী রাখে।

ভারতবর্ষে নৌ-বিদ্রোহ সংগঠনের কারণগুলি বহুমুখী—(১) তাঁদের চেতনায় সিপাই বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ছিল। (২) ভারত জুড়ে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল নৌ-সৈন্যবাহিনী সেই আন্দোলনের শরিক হতে চেয়েছিলেন। (৩) নৌ-সেনাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘ দিনের অবহেলা এবং অবমাননা তাঁদের বিদ্রোহী করে তোলে। (৪) সুভাষচন্দ্র বসুর সামরিক প্রস্তুতি সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য আনে। (৫) ১৯৪২ সালের ক্রিপস্ মিশনের সুপারিশগুলি কার্যতঃ ব্রিটিশ সরকার অগ্রাহ্য করায় নৌ-সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। (৬) ভারতীয় নৌ-সেনা ও য়ুরোপীয় নৌ-সেনাদের মধ্যে মর্যাদাগত বিস্তর তফাৎ ছিল।[৮৭]

বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় নৌ-সেনারা একটি পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম অংশীদার হতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতীয়সৈন্যরা বেশি অংশগ্রহণ করে বিদ্রোহ সৃষ্টি করুক-এই নীতি কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ এবং কম্যুনিস্ট পার্টি'ও গ্রহণ করেছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক স্তরে ১৯৪৩ সালের ১লা মে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা সমগ্র সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহাত্মক কর্মসূচী প্রেরণ করে। তার মূলকথা ছিল লাগাতার গোপনে প্রচার কাজ করা। সৈন্যবাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য তারা ব্রিটিশ অবিচারের বিভিন্ন চিত্র চুপি চুপি প্রচার করতে থাকে। ১৯৪৩ সালের ৯ই আগস্ট সশস্ত্র লড়াই-এর জন্য স্থল-জল ও বিমান বাহিনীতে অ্যাকশন কমিটি তৈরি হয়। ১৯৪৪ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের দিন ধার্য হয়। বিদ্রোহের উপাদান হিসেবে তারা গ্রহন করে নিম্নমানের খাদ্যসরবরাহ, ব্রিটিশ সরকারের একদেশদর্শিতা এবং ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি অমর্যাদাকর ব্যবহার। ১৯৪৪ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নৌ-সেনারা সকালে চা-পান থেকে খাদ্যগ্রহণ বর্জন করে। সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন সুযোগ নেই বলেই রেটিংরা

ব্যক্তিগত দাবী-দাওয়ার কূটনৈতিক চাল গ্রহণ করেছিল। লেখক নিজে বিদ্রোহীদের অন্যতম ছিলেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জেল জীবনে লেখককে ভয়ানক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। কিন্তু ফণিভূষণ সমস্ত নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং একবারের জন্যও বিপ্লবী চিন্তা থেকে পথভ্রষ্ট হননি। ক্রমশঃ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল স্থলবাহিনীতে— ১৯৪৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ দেখা দিল। জেল থেকে কারামুক্ত হয়েও লেখক এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিদ্রোহী সত্তা জেল-কক্ষের অন্ধকারে মৃত্যু বরণ করেনি—'আমি তো মৃত্যু জেনেই এপথে পা দিয়েছিলাম।' এই বিদ্রোহ চেতনা তাঁর কারাবাসে দীর্ঘসময় অত্যন্ত সক্রিয় ছিল।

শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহী নৌ-সেনারা ১৯৪৬ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী আত্মসমর্পণ করে। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মিশ্র-প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিভিন্ন স্বদেশী নেতৃবৃন্দের কাছে এই বিদ্রোহ স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়।

লেখক একদিকে যেমন নৌ বিদ্রোহ উৎস, উন্মেষ ও ব্যাপ্তির সংবাদ দিয়েছেন অন্যদিকে কারাবাসকালে রেটিংদের প্রতি ইংরেজের অত্যাচার এবং বিদ্রোহী নাবিকদের অনমনীয় আত্মশক্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বিদ্রোহ মহাত্মা গান্ধীর কাছে গ্রহণীয় ছিল না, তিনি ৪২ 'এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে পরোক্ষে মেনে নিলেও নৌ-বিদ্রোহকে মেনে নেননি। গান্ধীজী ১৯৪৬ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী পুণা থেকে এক বিবৃতিতে বলেন—

"অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি। নৌবাহিনীতে বর্তমানে এই যে বিদ্রোহ চলেছে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যত্র যেসব ঘটনা ঘটছে তাকে কোনমতেই অহিংসা বলা যায় না। যখন কাউকে জোর করে 'জয়হিন্দ' বলানো হয়, অথবা অন্য যেকোন জনপ্রিয় শ্লোগান বলতে বাধ্য করা হয়, লক্ষ-কোটি জনসাধারণের স্বরাজ বলতে যা বোঝায় তার কবর সৃষ্টি করার পক্ষে সেগুলি সবই মর্মান্তিক আঘাত হয়ে ওঠে। .... আমার সমর্থিত অহিংসা তো দূরের কথা, কংগ্রেস সমর্থিত অহিংসাও সেটা নয়।..... যদি নৌ-বাহিনীর সৈনিকরা অহিংসার তাৎপর্য বোঝেন তো অহিংস প্রতিরোধের পথ গৌরবময় পুরুষোচিত ও সমবেতভাবে প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হতে পারে।" লেখক উদ্ধৃত গান্ধীর এই মন্তব্য থেকে আমরা নৌ-বিদ্রোহের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করছি—

এক। গান্ধীজী এই বিদ্রোহের আভ্যন্তরীণ কারণগুলিকে গুরুত্ব দেননি।

দুই। তিনি জোর করে 'জয়হিন্দ' বলানোকে স্বরাজের পক্ষে মর্মান্তিক আঘাত বলেছেন। অর্থাৎ আজাদ-হিন্দ্ ফৌজকে কটাক্ষ করেছেন। কেননা ঐসময় সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে নৌ-সেনাদের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়েছিলো। অথচ তিনি যখন ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, চরকা কাটা, বুনিয়াদী শিক্ষা এগুলিকে স্বরাজের পক্ষে রাতারাতি আবশ্যিক বলে ঘোষণা করেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেন। রমাঁ রোঁলা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে, কালিদাস নাগকে লেখা ১৯২২ সালের যে মাসে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি তিনি পেয়েছেন।[৮৮] সেই চিঠির প্রয়োজনীয় অংশগুলি আমরা উল্লেখ করছি—

ক. "ভারতবর্ষে ফেরার পর এমন আবহাওয়ার গন্ধ পেলাম যা আমাকে হতচকিত করেছে। প্রথম রোগটি যা আমার কাছে ধরা পড়েছে, তা হচ্ছে, জনসাধারণের মনের উপরে স্বৈরাচার।"

খ. "আমি দেখেছি যে রাজনৈতিক স্রোত স্বাধীনতার প্রতিকূল। সম্ভবত সেই কারণেই পুরুষ নারী ও শিশুর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই অবিশ্বাস্য ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করছে যে, চরকার মাধ্যমে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে স্বরাজ অবশ্যই লাভ হবে, এবং সেই অনুসারে সমস্ত চিন্তা, সমস্ত আলোচনা বর্জন করতে হবে। কারুরই এই ইচ্ছা নেই, সম্ভবত সৎ সাহস নেই, পরিষ্কার ভাবে জিজ্ঞাসা করে: 'এই স্বরাজ বস্তুটি কী?"

গ. "পূর্ণ অহিংসা তখনই সম্ভব, যখন বিরুদ্ধ চিন্তার মূল উপড়ে ফেলা হয়। এইখানেই প্রকৃত সত্য। নিছক নৈতিক শুচিকাভরণে তা লাভ করা যায় না, এমনকি গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এলেও না।"

ঘ. "ভারতবর্ষে এসে আমি আবিষ্কার করলাম যে, মহৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও গান্ধী জাঁকালো আদর্শটিকে—যার মধ্যে বস্তু আছে—ভারতীয় রাজনীতির সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করেছেন।"

ঙ. "আমি দেখেছি যে আমাদের দেশের মানুষের মন গুরুর নির্দেশ এবং চরকার অলীক কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।"

এই চিঠির প্রতিধ্বনি আমরা 'সত্যের আহ্বান'—নামক প্রবন্ধে পেয়েছি।

তিন। এই বিবৃতিতে গান্ধীজী নৌ-বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে স্বীকার করেছেন।

চা'র। গান্ধীজী অহিংসাকে কংগ্রেস-সমর্থিত নীতি এবং নিজস্ব নীতি এই দু' ভাগে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের অহিংসার ধারণা যে গান্ধীজী থেকে পৃথক একথা গান্ধীজী স্বীকার করলেন।

লেখক আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন নৌ-বিদ্রোহকে গোপনে নীতিগত-ভাবে সমর্থন করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই বিদ্রোহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিল—বিদ্রোহের কারণ জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দারিদ্র্য এবং কৃষিব্যবস্থায় সংকট। এই প্রসঙ্গে লেখক মস্কোর 'রেডস্লিট' কাগজের ১৯৪৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে সমগ্র গ্রন্থে লেখক বিদ্রোহের যে কারণগুলি বিশ্লেষিত করেছেন তা উক্ত পত্রিকার রাজনৈতিক মন্তব্যের সঙ্গে মেলে না। লেখকের মতে এই নৌ-বিদ্রোহের মূল কারণ ভারতবর্ষের ক্রমবিকশিত স্বাধীনতা আন্দোলন এবং নৌ-সেনাদের জাতীয়তাবোধ।

ভারতবর্ষের নৌ-বিদ্রোহের ইতিহাস আজও তথ্যনিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়নি। বিদ্রোহের উন্মেষ এবং ব্যর্থতা সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। ভবিষ্যতের সেই মূল্যায়নই নৌ-সেনাদের প্রকৃত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত করবে।

বিপ্লবীর জীবন দর্শন'[৮৯]-এর লেখক প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী মোট চারবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম পর্যায় ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সাল, দ্বিতীয় পর্যায় ১৯২৪-১৯২৮ সাল, তৃতীয় পর্যায় ১৯৩০-১৯৩৮ এবং শেষ পর্যায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই দীর্ঘ কারবাসের অভিজ্ঞতা আলোচ্য গ্রন্থে যথাযথভাবে স্থান পায়নি। তাঁর রাজনৈতিক সত্তায় কারাবাসের অভিজ্ঞতা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। অথচ অনেকটা আত্ম-কথনের সুরে প্রতুলবাবু বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের নানা সংবাদ পরিবেশন করেছেন একজন বিপ্লবী হিসাবে। গ্রন্থের নামকরণ 'বিপ্লবীর জীবনদর্শন'; এর থেকে ধারণা হতে পারে কোনো বিপ্লবীর রাজনৈতিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই অর্থে আলোচ্য গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ, গ্রন্থে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষপর্বের আলোচনা দীর্ঘ হলেও বিকাশ ও পরিণতির চিত্র প্রায় অনুপস্থিত। গ্রন্থের শেষ অংশে তিনি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত তুলনা করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা এবং লেখকের সেই ধারায় ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের বিস্তৃত ইতিহাস আছে। কিন্তু এই ইতিহাস অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিক—সন ও তারিখের নিয়মানুগ ধারাবাহিকতা নেই।

আমরা কারাবাসকালীন লেখকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার দিকগুলিকে তুলে ধরছি।

লেখক তাঁর বাবার নির্দেশ ও আদেশক্রমে নাবালক অবস্থায় ১৯০৬ সালে নারায়ণগঞ্জের অনুশীলন সমিতিতে সভ্যপদ লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯১০-১২ সালে অনুশীলন সমিতির বৈদেশিক নীতি কি ছিল জানিয়েছেন—
"আমাদের বৈদেশিক নীতি ছিল—বিদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যের জন্য কিছু করা যায় কিনা, পৃথিবীতে ইংরেজের প্রকৃত শত্রু কারা, কারাই বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস নিজেদের স্বার্থেই কামনা করে। ব্রিটিশের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতে পৃথিবীতে যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, তাতে ইংরেজের বিপক্ষে কোন্ কোন্ শক্তি থাকবে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কি ব্যবস্থা করা যায়, এককথায় বিদেশী শক্তিচয়ের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব বাধলে আমরা তার কি সুযোগ গ্রহণ করতে পারি—এসমস্ত কথা আমরা চিন্তা করতে লাগলাম। কেননা, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজের বিপদ আমাদের সুযোগ এনে দেবে।"

প্রসঙ্গত তিনি জার্মানী থেকে লেখা বিপ্লবী কেদার গুহের একটি চিঠির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন—
"জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ অনিবার্য ও তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে এবং আমাদেরও সুযোগ আসবে। কারণ জার্মানী নিজের স্বার্থেই ব্রিটিশের অধীনস্থ স্বাধীনতাপিপাসু জাতিসমূহকে সাহায্য করতে চাইবে যাতে ইংরেজ নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই ব্যস্ত থাকে, এবং তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিসমূহের সহায়তা না পায়।"

১৯১৩ সালে লেখকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছিল। ১৯১৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট জেলে কারারুদ্ধ হন। পরে আলিপুর জেলে থাকাকালীন 'প্রবাসী' পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'শক্ত মানুষ চাই' শিরোনামের প্রবন্ধগুলি গভীরভাবে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনি ঐ প্রবন্ধাবলী থেকে জানতে পেরেছিলেন

আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিকামী রাজবন্দীরা কারাবাসকালে অত্যাচার ও অবমাননার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই জেলেই রবীন্দ্রনাথের 'দিন আগত ঐ' গানটি ('প্রবাসী'তে প্রকাশিত) বিপ্লবীদের প্রভাবিত করেছিল। অনশন ধর্মঘট সংগঠনের বিস্তৃত ইতিহাসও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এবং লেখক বার বার জানিয়েছেন যে, বিপ্লবীরা আশা করেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত পরাধীন ভারতের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে। জার্মানীর ব্রিটিশবিরোধী যুদ্ধপ্রস্তুতি কারাবাসকালে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। লেখক দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের জেলজীবনের কোন সংবাদ দেননি। চতুর্থ পর্যায়ে কারাবাসকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে লেখকের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতে—সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নেই—'ফ্যাসিবাদকে বলা চলে সাম্রাজ্যবাদেরই নগ্ন জঘন্য বাস্তবরূপ।' এই জেলবাসে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তুলনামূলক চিন্তা করতেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বললেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপ্লবীদের জার্মানী সম্পর্কে রাজনৈতিক চেতনা বদলে গিয়েছে—

"এবার কিন্তু আমাদের কামনা—জার্মানীর পরাজয় এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বংস!"

লেখক দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন পর্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা, কংগ্রেসের সংগঠন ও বিপ্লবী আন্দোলন-রাজনৈতিক দিক থেকে যে কতখানি পরিবর্তিত তার আলোচনা করেছেন। লেখক স্বীকার করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সরকার ভারতীয় রাজবন্দীদের প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী-বন্দীরা পঠন-পাঠন, খেলাধুলা, মেলা-মেশার ও অনেক সুযোগ পেয়েছেন যা প্রথমযুগে ছিল অনুপস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন তিনি। বিপ্লবীদের রাজনৈতিক চেতনা পরিণত, বিচারশীল এবং বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপ্লবীদের ধ্যানধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মত এলোমেলো ছিল না। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দ্বিতীয় পর্বে প্রকট হয়েছে। মার্কসবাদী সাহিত্য, রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের ওপর গ্রন্থ, ফ্রয়েডের রচনাবলী, হ্যাভলক এলিসের যৌনতত্ত্ব, ম্যারি স্টোপসের জন্মনিয়ন্ত্রণ

সংক্রান্ত পুস্তক ইত্যাদি. বিষয়গুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জেলে বসে বিপ্লবীরা পাঠ করেছেন—যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ধরণের গ্রন্থপাঠ বন্দীদের কাছে অকল্পনীয় ছিল।

প্রতুলচন্দ্র বিপ্লবীদের রাজনৈতিক চেতনার পরিণতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে কেমন ছিল তার আলোচনা করলেও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চেতনায় কোনো সংবাদ দেননি। তিনি বলেছেন অধিকাংশ বিপ্লবী এক ব্যর্থতাবোধ, অবসাদ ও নৈরাজ্যের শীকার হয়েছিল। এর কারণ তিনি বলেছেন—সুস্পষ্ট মতবাদ, সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মপন্থা বা সুনিয়ন্ত্রিত দলের অভাব। লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ অস্পষ্ট, আমরা সূচনাতেই বলেছি লেখক বিপ্লবী জীবনদর্শনের যথাযথ রূপরেখা আঁকতে সমর্থ হননি। লেখকের রাজনৈতিক চেতনা তাঁর ভাষাতেই ব্যক্ত করা যেতে পারে—

"এঁরা সর্বত্যাগী, নির্ভীক, সংযতেন্দ্রিয় এবং নিরাসক্ত পুরুষ সিংহ। একটা অতীতকালের বিরাট স্তম্ভ-স্বরূপ এঁদের দেখলে আমাদের দেশে পদ্মায় অধুনালুপ্ত রাজবাড়ি মঠের কথা মনে পড়ে যায়। চাঁদ রায় কেদার রায়ের বিরাট কীর্তিস্তম্ভ সেই প্রকাণ্ড মঠ আজ জীর্ণ অবস্থায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মার খরস্রোতে মঠের ভিত্তিমূল অবক্ষয়ের মুখে। মঠটা বিরাট শব্দে ভেঙে পড়ল বলে।"

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে'

আহার্য স্বাস্থ্য শ্রম দণ্ড নির্বাসন……

বাংলা কারাসাহিত্যের পৃষ্ঠাগুলি থেকে আমরা সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারা, মত ও পথের বহু শাখায়িত বিস্তার, ঐক্য ও সংঘাত, ঘটনাবর্ত ও রাষ্ট্রতত্ত্বে সংযুক্ত একটি অতীত ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য ও উপকরণ পাই। সেই সঙ্গে বাংলার এইসব তথাকথিত কারাসাহিত্য থেকে ইংরাজ রাজত্বের ভয়াবহ কারাব্যবস্থার ভিতরকার যে ছবি পাই তা নানাকারণে গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের বিচারে এগুলি হয়ত শিল্পশ্রীমণ্ডিত নয়, কিন্তু সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মূলে অভিজ্ঞতার যে মৌলিক উপাদান নিহিত, এগুলি সেই উপাদান। তাছাড়া আমাদের বর্তমান আলোচনা তো রসসাহিত্যের নান্দনিক বিচারে নয়—আমরা সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় লেখা রাজবন্দীদের কারা-অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করতে চেয়েছি, সেই অভিজ্ঞতায় ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় কারাদণ্ড ও কারাগার-অভ্যন্তরস্থ শাসনপীড়নের রীতিপদ্ধতির তালিকা প্রণয়ন এবং কারা-জগতের অন্ধকার যে দুর্নীতির ছায়ামিছিল তার নেগেটিভ তুলে ধরতে চেয়েছি। তাই কারাবাসীদের আহার্য স্বাস্থ্য দণ্ডনীতি সব কিছুতেই আমাদের ঔৎসাহ ও কৌতূহল রয়েছে। কোনো প্রসঙ্গই আমরা উপেক্ষা করিনি। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কারাব্যবস্থায় সমালোচনার সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছি।

আহার

স্বাধীনতার ব্রতনিষ্ঠ সংগ্রামীগণ জেলজীবনের অনিঃশেষ দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে ভুখা-পেটে অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। আত্মনিবেদিত এই প্রাণগুলি দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। রাজশক্তির চূড়ান্ত অনাচার ও অপমান অসহনীয় অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করলেও মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচন সংকল্প এঁদেরকে প্রতি মুহূর্তে উজ্জ্বল করে তুলেছে। কারণ—
"রাজরোষ রক্ত অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার স্বর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে।"[১]

দেহ নামক বিশেষ যন্ত্রটিকে রক্ষার জন্য আহার নামক বিশেষ বস্তুটির প্রয়োজন। এই আহার বা খাদ্য যথার্থই আহার পদবাচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার পরিবর্তে যখন ভাতের মাড়, ঘাসসিদ্ধ-তরকারী, কুমড়োর ঘ্যাঁট, আটার সঙ্গে বালি মেশানো রুটি ইত্যাদি সুসভ্য ইংরেজ সরকারের জেলখানায় বন্দীদের কাছে পরিবেশিত হয়, তখন একটাই প্রশ্ন জাগে ভারতীয় বন্দীরা মানুষ না পশু? নির্দ্বিধায় বলা যায় এই বিপ্লবীরা এই দুর্দশায় হতাশাগ্রস্ত না হয়ে

তাদের—'চিত্ত প্রফুল্ল—তেজোদীপ্ত বদনমণ্ডল.সহাস্য' ; বরিত 'শৃঙ্খল নিপীড়িত-ভব্যতাবিহীন জীবদিগের সহিত নীচ কার্যে নিয়োজিত। কারণ আমরা জানি এই বন্দীরাই আমাদের 'স্বাধীনতার প্রথম বার্তাবহ।'[২] যথার্থ বীর, সত্যনিষ্ঠ এই স্বদেশপ্রেমিকদের কোন্ প্রবঞ্চনাই দুর্বল করতে পারেনি। উচ্চ আদর্শ ও ইচ্ছাশক্তি কর্মপথে একনিষ্ঠ থাকতে সাহায্য করেছে। মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস, এই দাসত্বে মানুষ অভ্যস্ত। যেখানে শরীরই কারাগৃহ সেখানে বাইরের এই কারাগার তাকে কী ভয় দেখাবে? 'কারণ এই কারবাস মনুষ্যজাতির চিরন্তন অবস্থা।'[৩] তবুও সুসভ্য ইংরেজ সরকার বাহাদুরের কয়েদখানায় কী ধরণের খাদ্য পরিবেশিত হতো এবং তাকে কী দৃষ্টিতে এই সংগ্রামীরা দেখেছেন তারই পর্যালোচনা করা হলো 'আহার' নামক অধ্যায়ে।

কারাজীবনের স্মৃতিচারণায়, বিভিন্ন অঞ্চলের কারাগারে বিভিন্ন সময়ে আহার সম্পর্কে যাঁর যেমন অভিজ্ঞতাই ঘটুক না কেন, দেখা যায়, কারাবাসে আহার ও আহার্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে কয়েকটি গভীর সাদৃশ্য আছে। কারাগারে আহার বলতে সাধারণত যা পরিবেশিত হয়েছে তা পশুখাদ্য হিসেবেও অপাংক্তেয়।

এই ধরণের খাদ্যের বিবরণ এইরূপ—

যোগীন্দ্রনাথ বসু আলিপুর জেলে থাকাকালীন আহার প্রসঙ্গে লিখেছেন—"...মূত্রত্যাগের যেরূপ টবটি দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ একটি টবে ভাতের তরল মণ্ড চল চল করিতেছে। অধিকারী কহিলেন—'ইহার নাম খিচুড়ী, মুসুরির ডেলে এবং চেলে ঘাঁটিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।'.. সে খিচুড়ী চুমুক দিয়াও খাওয়া যায়, হাতে করিয়া তুলিয়া হাপরাণও যায়। খিচুড়ীর আকার প্রকার বর্ণ-লাবণ্য ভাব-গন্ধ দেখিয়া শুনিয়া ঘ্রাণ লইয়া, আমার নানা অনির্বচনীয় উপমার কথা মনে হইতে লাগিল।"[৪]

১৯০৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সহ আরও কয়েকজন বন্দী ছিলেন আলিপুর জেলে। এখান থেকে হাড়ভাঙ্গা শীতের সকালে আন্দামান জেলে লেখককে পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার আহার সম্বন্ধে লেখক বলেছেন "টিনের কৌটায় (ভাবু) করিয়া এক কৌটা ভাত, অড়হরের ডাল আর দুইখানা রুটি। চারদিন খোট্টাই ধরণে চিঁড়া ও ছোলা সেবা করিবার পর সে যে কি অমৃত বোধ হইল তাহা বলিয়া বুঝানো দুষ্কর।..."

আলিপুর জেলের "লপ্সি" এখানেও (আন্দামানে) দেওয়া হত। কিন্তু

আলিপুরের 'লপ্সি'র স্বাদ আছে, কিন্তু আন্দামানের লপ্সিতে কোন স্বাদ নেই। এখানে 'লপ্সিতে' লবন পর্যন্ত দেওয়া হয় না।

বারীনবাবু 'দ্বীপান্তরের কথা' একটি তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কয়েদীরা আলুনি খাবার পেয়েছে; আর পেয়েছে অসম্ভব জল-কষ্ট। আবার তিনি 'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী' নামক গ্রন্থে বলেছেন—

"ঝোলটি মাছের বলিয়া বোধ হইল, কারণ গুঁড়া-গাঁড়া মাছ ঐ পূত জাহ্নবী ধারায় সন্তরণ দিয়া স্নান করিতেছিল, তরকারী অপেক্ষা হরেক রকম পাতাই এই মৎস পাচনের আস্বাদ ও রূপের খোলতাই করিয়াছিল।"—বর্ণনাটি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে হেমন্ত কুমার সরকার রাজবন্দী হয়ে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আসেন। লেখক ইউরোপীয়ান ডায়েট পেয়েছিলেন। আহারের বর্ণনায় দেখা যায় ভোরে এক মগ চা, আধখানা পাউরুটি ও মাখন।

ভাত খাওয়ার সময় লেখক "ব্রেকফাস্ট" কেন বলেছেন বোঝা যায় না।

মোটা চালের দুটি ভাত, আধসিদ্ধ দুটি ডিম, ডাল, চালকুমড়ার ঘ্যাঁট। চালকুমড়ার ঘ্যাঁটের এমন একটা গন্ধ ছিল যে লেখকের অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসত। ডালগুলি এমনভাবে সিদ্ধ করা হত যে মনে হত যেন হেসে ঠাট্টা করছে।[৫]

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিলী কারাগারে আহারের বর্ণনা প্রসঙ্গে কয়েদীদের খাবার হিসবে ঘোড়ার দানা আর ছাতু, জল, লংকা পরিবেশিত হত বলে জানিয়েছেন।[৬]

মদনমোহন ভৌমিকের অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত। আন্দামানের সেলুলার জেলে তাঁরা খেয়েছেন—

"তরকারী যে সকল দ্রব্যদ্বারা পাক হইত তাহা আমাদের দেশের গরুতেও খায় না। কোন কোনদিন শুধু কচুপাতা সিদ্ধ করিয়া দিত। কোন প্রকার উদরসাৎ করিলেই যে মুক্তি তাহা নহে, ইহার পর আবার গলা চুলকানী।"

নিয়মানের আহার্য থেকে মহিলা রাজবন্দী রাণী চন্দও বাদ পড়েননি। বিভিন্ন জেলে তাঁর অভিজ্ঞতা হল পুঁই, চ্যাড়শ ও পাকা ধুন্দুলের ঘ্যাঁট, ফিকে-হলদে রঙের জলের মত ডাল আর সেই সঙ্গে 'মাড়ি'।[৭]

বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্যের বর্ণনা থেকে জানা যায়—

"আমাদের খাবার বস্তু—তরকারীর মধ্যে গ্রীষ্মকালে দুর্গন্ধময় বাঁধাকপি— যখন জেলের কয়েদীরা ছাড়া আগ্রহ নিয়ে তা খাবার আর কেউ থাকে না, আর বর্ষাকালে বাঁশ ডাঁটা, শীতকালে গ্যাজওয়ালা মুলো আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। কোনটাতেই কোন মশলার বালাই নেই—নইলে বাড়ীর তরকারীর সঙ্গে জেলখানার তরকারীর পার্থক্য হইলো কোথায়? তাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নয়। অবশ্য বর্ণহীন ডাল খানিকটা ঢেলে দেওয়া হোত—বন্যার জলের মত তা ছড়িয়ে পড়তো চারিদিকে।"[৮]

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, মাছ মাংসের সংবাদও আছে—

"সপ্তাহে প্রত্যেককে দুদিন এক ছটাক মাছ, আর এক ছটাক মাংস দেওয়া হোত। মাংস যা দেওয়া হোত তাতে লোমের ভাগই বেশী। সাধারণ কয়েদীরাও মাংস পেত, তবে তার বেশীর ভাগই চুরি যেতো। আমরাও যে পরিমাণ মত পেতাম তা বলা চলে না।"

সুবোধ কুমার লাহিড়ী কোলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী হিসেবে ভাত, ডাল এবং তরকারীর বর্ণনা দিয়েছেন—

"ভাত দেখে তো আমার চক্ষু স্থির। ভাত যে এত বড হয় তা আমার কল্পনাতীত। তারপর পেলাম একমগ ডাল এবং নানা প্রকার লতাপাতা এবং কপির ডাটা দিয়ে তৈরী খানিকটা ঘ্যাঁট—পরে আমি যার নামকরণ করেছিলাম—"জঙ্গল"[৯]

দেউলি জেলের আহারের বর্ণনায় নিকুঞ্জ সেন লিখেছেন—

"লপ্‌সি নামক একটি অপূর্ব বস্তু, দুপুরবেলা ভাত, ডাল ও একটা তরকারী। এই তরকারীতে না থাকিত এমন জিনিষ নাই। শাকশব্জী লতাপাতা হইতে সুরু করিয়া কচুপাতা, বটপাতা কিছুই বাদ পড়িত না।"[১০] মানুষের কাছে যা খাদ্য হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং যে সমস্ত খাবার গবাদিপশুরা খেয়ে থাকে তাই এখানে মানুষের খাদ্য হিসেবে খেতে দেওয়া হয়েছে।

'নিঃসঙ্গ' গ্রন্থের লেখক সতীশচন্দ্র দে প্রেসিডেন্সি জেলে পেয়েছিলেন রুটি, ডাল আর প্রাতঃরাশ লপ্‌সি—

"লোহার বাটিতে প্রাতঃরাশ লপ্সি ঢেলে দিয়ে গেল। দেখলাম শুধু খুদ সিদ্ধ, তাও লবনের আস্বাদ নাই। ক্ষুধাই স্বাদ আনে, নহিলে কি করে সেই লপ্সি অমৃতের মত লাগল, জানি না।"

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সী জেলে সকাল, দুপুর এবং রাতের কয়েদীদের

খাদ্য সরবরাহের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। সে চিত্রের মধ্যে আমরা প্রাতঃরাশ হিসেবে চা, মাখন আর পাউরুটি পরিবেশিত হতে দেখেছি—

"প্রত্যুষে চা ও মাখন পাঁউরুটি। মাখন খাঁটি হইলেও উহাতে চুল ও ময়লা থাকে। উহা দেখিয়া খাইতে হয়। চা বালতিতে করিয়া লইয়া আসে এবং লোহার বাটীতে এক মগ ঢালিয়া দিয়া যায়। ২।৩ চুমুকের বেশী খাওয়া যায় না। কারণ উহা ঢালিতে ঢালিতেই কালো রং হইতে আরম্ভ হয়।

১০।১০॥. টায় ভাত, একরাশ শাক, ডাল, একটা ভা [illegible] কিম্বা ৫ মিশালী তরকারী—উহার মধ্যে কচুই বেশি। রুইমাছের ঝোলের সহিত ২ টুকরা মাছ যদিও প্রত্যেকের জন্য ৩ ছটাক বরাদ্দ, কথনও বা একটা ডিম অথবা ২ ছটাক পরিমাণ দই।

৩টা-৩॥. টায় চা, আর সন্ধ্যার মুখেই রাত্রের আহার—ভাত অথবা ২ খানা রুটি, ডাল, তরকারী ও মাংস, বরাদ্দ এক পোয়া করিয়া কিন্তু পরিমাণে কম মেলে।"[১১]

ঢাকা সেণ্টাল জেলের কয়েদী হয়ে সতীশ পাকড়াশীর প্রথম কয়েদ জীবন শুরু হয় ১৯০৮ সালে। এখানে কাঁকর ভরা মোটা চাল, ডালের জল, আর ঘাসমেসানো তরকারী খেয়ে লেখকের কয়েদী জীবন কাটে।[১২]

বেলগাঁও (কর্ণাটক) জেলের আহারে ব্যবস্থা একই রকম—'মানুষের অখাদ্য জোয়ারী রুটি, ঘাসের তরকারি, আর কলাইয়ের ডাল।'

জেলে আহার বা খাদ্যব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি তা বিভিন্ন রাজবন্দী বা স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ। সেই সব গ্রন্থই আমাদের আলোচনাভুক্ত হয়েছে যেগুলিতে প্রসঙ্গত কারাজীবনে প্রদত্ত বা প্রচলিত ইতস্তত সংবাদ আছে। এছাড়া ছোটখাটো তথ্য, মন্তব্য অন্যান্য গ্রন্থেও রয়েছে। সে সব প্রসঙ্গ অবশ্য গ্রহণ করা হয়নি। তবে এ আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না, কারণ—

(১) বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন জেলে বিভিন্ন সময়সীমায় বন্দী ছিলেন। যেহেতু তাঁরা স্মৃতি থেকে বিষয় বর্ণনায় গেছেন এজন্য তাঁরা ধারাবাহিকতার ক্রম সর্বক্ষেত্রে ঠিক ঠিক রাখতে পারেননি।

(২) কারা অভিজ্ঞতা ঘটলেও সকলেই খাদ্য ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দেননি। কেবল কেউ কেউ জেল জীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি চিত্রণে নানা প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্যপ্রসঙ্গ এনেছেন। তবুও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ও

আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কেননা এগুলি জেলপ্রশাসনের দেওয়া তথ্য নয়—লেখকের তথা বন্দীর তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই জাতীয় আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে ইংরেজ আমলে কারাগারে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সকালবেলায় জলখাবারের ব্যবস্থা শতকরা সত্তরটি জেলের ক্ষেত্রেই ছিল না। যেখানেও বা ছিল তা ভাতের ফ্যান, গুড়, লপ্‌সী, মকাই ইত্যাদি। বৈকালিক খাদ্যব্যবস্থার তথ্য একটি বা দুটি ক্ষেত্রে মেলে। নৈশ আহার সন্ধের সময়ই দেওয়া হত। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন অনেক লেখক শুধুমাত্র জেলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্য সরবরাহের বিভিন্ন আইটেম বা পদ কেমন তা বলেছেন, তা দিনের কোন অংশে দেওয়া হতো নির্দিষ্ট করে জানাননি। সেক্ষেত্রে আমরা তাকে মধ্যাহ্নকালীন ভোজন বলে উল্লেখ করেছি।

সুদীর্ঘ বছরের ধারাবাহিক এই বিবরণে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার সাধারণ বা রাজবন্দীদের জন্য খাদ্য সংস্কার কিছুই করেননি। তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতীয়দের সাধারণ কয়েদী হিসেবেও দেখতেন না। খাদ্য-ব্যবস্থায় শুধু যে উদাসীন তা নয়—সচেতনভাবে নিষ্ঠুর। নুনহীন লপ্‌সি, আধসেদ্ধ আলু ও ভাত, কাঁকর-মেশানো চাল, কেবল কচুশাকের তরকারী প্রভৃতি অখাদ্য জিনিস ইংরেজ কর্তৃপক্ষ একশো বছর ধরে খাদ্যবস্তু হিসেবে সরবরাহ করেছে। অন্য দিকে সাহেব কয়েদীরা পেয়েছেন রাজ সম্মান। দেশীয় বন্দীদের তরকারীর সঙ্গে ঘাস দেওয়া একটি স্বাভাবিক নিত্যকার ব্যাপার। আন্দামানের সেলুলার জেলে বছরের পর বছর জলকষ্ট নিদারুণ আকার নিয়েছে, ব্রিটিশ সরকার তাকিয়েও দেখেনি। বাসি জল দীর্ঘদিন ধরে জমা করা আছে—তাকেই পানীয় জল বলে বন্দীদের দেওয়া হয়েছে।[১৩]

কদাচিৎ দু' একটি ক্ষেত্রে সুস্থ-সুষম খাদ্য ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণ সেই জেলের জেলার সাহেব একজন ব্যতিক্রম। ফলে যাবতীয় বন্দীই রাজবন্দী বা সাহেব বন্দীর সম্মান পেয়েছেন। জেল কয়েদীদের কাছে খাদ্য পরিবেশনে এই বিকারহীন ব্রিটিশ রাজশক্তিই একসময় হিটলার বিরোধী মিত্রশক্তিতে যোগদান করেছিল ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে।

স্বাস্থ্য

জেলখানায় বন্দীর স্বাস্থ্য প্রযত্ন বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ডাক্তার

সার্জেন সকলেই আছেন—স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্যই। স্বাস্থ্য বিধি বলতে একটি সামগ্রিক স্বাস্থ্য আচরণবিধি বোঝায়। স্বাস্থ্যরক্ষার দুটি দিক—একটি প্রিভেন্টিভ অর্থাৎ প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক দিক অপরটি কিউরেটিভ অর্থাৎ চিকিৎসা বা নিরাময়ের দিক। আমরা আহার বা কয়েদঘর আলোচনায় যে ছবি পেয়েছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে জেলখানায় স্বাস্থ্যরক্ষার দিকটি অনুমান করতে পারি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলো-বাতাস, পানীয় জল, সুষম খাদ্য এগুলির কোনটিই যেখানে থাকে না সেখানে বিশেষ কোনো স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি খুঁজে পাওয়া নিরর্থক।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনায় দেখতে পাব যে সকলেই একটি করুণ অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। অসুস্থতাকে ডাক্তারবাবুরা 'মানসিক ব্যাধি' বলে মনে করেন। কয়েদঘরে বন্দীরুগী সারারাত ধরে লড়াই করেন মৃত্যুর সঙ্গে, তবুও চিকিৎসক আসেন না। বন্দীরা যেখানে কেবল সংখ্যা মাত্র—এরকম একটি নরককুণ্ডে স্বাস্থ্যবিধির কোনো সূত্রই মেনে চলা হবে না, এটাইতো স্বাভাবিক। আমরা নীচের আলোচনায় দেখতে পাব ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সেই অমানবিক আচারণ যা প্রতিটি বন্দীকে দিনের পর দিন একটু একটু করে স্বাস্থ্যভঙ্গের দিকে ঠেলে দিয়েছে—যার অনিবার্য পরিণতি হল মৃত্যু।

বিভিন্ন জেলে বন্দীরা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ—

"আমি বড়ি লইয়া, নাসারন্ধ্রে নির্দিষ্ট করিয়া অ ঘ্রাণ লইলাম, গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিবার উপক্রম হইল। মলমূত্রের গন্ধে 'আমি দৃকপাত করি নাই, কিন্তু একবার বটিকার গন্ধে বাস্তবিকই প্রাণ যেন যায় যায় হইল।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু, ঔষধ খাওয়ার বর্ণনা করছেন। প্রত্যেকদিন সকালে বাধ্যতামূলক ভাবে সুস্থ কিংবা অসুস্থ যেকোন বন্দীকেই রোগ প্রতিরোধক ('প্রিভেনটিভ') এক প্রকার ওষুধ দেওয়া হত। এই ওষুধের গন্ধের তীব্রতা সহজেই অনুমেয়। আমাদের অনুমান জেলখানায় যেভাবে ভাতের তরল মণ্ড ইত্যাদি দেওয়া হয় তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জেল পরিচালকেরা সচেতন। এবং এই জন্যই স্বাস্থ্যরক্ষার এমন সুন্দর আয়োজন।

জেলখানার অভ্যন্তরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের একইরকম বর্ণনা পাওয়া যায় ১৯০৬ সালে প্রকাশিত সুরথ কুমার বসু লিখিত 'স্বদেশীয় কারাবাস' গ্রন্থে।

সতীশ পাকাড়াশী দীর্ঘদিন কারাবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। লেখকের ঢাকা সেণ্টাল জেলে বসন্ত হয়েছিল। রোগকালীন অবস্থায় তাঁকে যেভাবে চিকিৎসা করা হয়েছিল, সে নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা লেখক ভুলতে পারেননি—

"জেলে আমার বসন্ত হ'ল, গোটা উঠা আমাকে জেলের প্রাঙ্গনে একটা বাগানের মধ্যে ক্যাম্পে শিকলে বেঁধে রাখে। একটা শক্ত খুঁটির চারদিকে অন্যান্য ন' জন চোর ডাকাতের সঙ্গে আমাকেও এক পায়ে পাঁচ সের ওজনের মোটা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ল। জেল সেপাইরা দয়া করে দুটো কম্বলও দিয়েছিল বটে। কিন্তু ১০৩।৪ ডিগ্রী জ্বর—সর্বাঙ্গে বসন্তের গোটা, এ-অবস্থায় জেলের কয়েদীদের খসখসে কম্বল যে কী পীড়াদায়ক, তা আজও ভুলিনি।"

সেলুলার জেলেও লেখক বন্দী হয়েছিলেন, আলো বাতাসহীন ছোট একটি ঘরে জেলখানার স্বাস্থ্যবিধি প্রসঙ্গে লেখক জানাচ্ছেন, "মশা আছে মশারী নাই। ম্যালেরিয়া আছে। বিষাক্ত পোকা মাকড, বিচ্ছু, তেঁতুল বিছেতে সেলগুলি ভরা, তার উপর আছে আন্দামানের এক বিখ্যাত জলকষ্ট। এরপর তো রোগীদের খাদ্য ও পথ্য হিসাবে দেওয়া হয় ফেনের মত ভাত, ঘাসের তরকারী, অসিদ্ধ বিস্বাদ ডাল, তেঁত আটার রুটি"—

এজন্যই ১৯৩৩ সালের মে মাসে সেলুলার জেলের জলাভাব, খাদ্যাভাব এই সবের প্রতিবাদ করে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন রাজবন্দীরা। ফলে নিষ্ঠুরতা বেড়ে গিয়েছিল, জোর করে চেপে ধরে নাকে ও মুখে নল পরিয়ে দুধ খাওয়ান চেষ্টা হয়েছিল. এমন কি ডাক্তারের তাড়াহুড়তে কয়েকজনের নাকে ঘা হয়ে গিয়েছিল।

অতীন্দ্রনাথ বসু সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি জেলখানায় ডাক্তারের দুর্নীতিপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন "ডাক্তারবাবু বিক্রমপুরের কায়েত। জেলের ওষুধ গোপনে বাইরে যায়, এ বাজারে দু-পয়সা আনে। কাজেই আমাদের চিকিৎসার কাজ যথাসম্ভব সারতে হয় আশ্বাস-বাণী ও বিশুদ্ধ জলবায়ু দিয়ে।" ডাক্তারবাবু রোগের উপসর্গ শোনেন না, 'যুদ্ধের বক্তৃতা' সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে লেখক একটি মর্মান্তিক ঘটনা জানিয়েছেন। একজন অসুস্থ কয়েদীকে (যার নাম এরফান) ডাক্তারবাবু লিখে দিয়েছিলেন 'ডিসচার্জ ফিটফর অয়েল প্রেস।' এর পরেই তার মৃত্যু হয়—সেই বেদনাদায়ক বর্ণনা লেখকের ভাষায় আমরা তুলে ধরেছি—'এর দুদিনের দিন এরফান ম'রে গেল। ঘানি ঠেলতে

ঠেলতে প'ড়ে গেল, পাহারা ছুটো চড় চাপড় দিলে—'শালা ঢং দেখাতে আছিস ওঠ' এরফান উঠল না। ওকে ধরাধরি ক'রে আবার হাসপাতালে তুলতে হোল, তার কয়েক ঘণ্টা পরে মাটিতে। একটা ঢংই দেখিয়ে দিল বটে এরফান।' আরও দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে মৃত এরফানকে রাতারাতি খালাসের টিকিট দেওয়া হলো। কয়েকদিনের রেমিশন আর খালাস লেখা হোল টিকিটে, মৃত্যুর কথা লেখা হলো না।[১৪]

আন্দামানের সেলুলার জেল সমস্ত বন্দীদের কাছেই একটি জীবন্ত নরককুণ্ড। আন্দামান মানেই রোগ, স্বাস্থ্য ভংগ। স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি কিছুই মানা হয় না এখানে। 'বন্দী জীবনে'র লেখক সতেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার লিখছেন—"আমরা গণ্ডীর ভেতর বন্দী, খাদ্য যা তাতে জীবন ধারণ করে চলে কিন্তু পুষ্টির কোন প্রশ্ন ওঠে না। সমুদ্রের লবনাক্ত জল খাওয়া চলে না, তাই বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে বড় বড় ট্যাঙ্কে। কত বছর সেগুলি পরিষ্কার হয়নি জানি না।" এখানে জল শোধনের কোন ব্যবস্থা নেই। ধরে রাখা জল মাসের পর মাস পানীয় জল বলে চালানো হয়। জলের মধ্যে পোকা, তলানি সব আছে। ফলে নানা ধরনের পেটের অসুখ সেখানে লেগেই আছে। জেলখানায় প্রবাদ আছে, "সাত বছর জেল খাটলে একখানা আস্তো কম্বল হজম করা যায়।"

কল্যাণী ভট্টাচার্য জেলখানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নির্মমতা ও অবহেলা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। বন্দীদের অসুস্থতার কথা কর্তৃপক্ষ কখনই বিশ্বাস করতেন না। "রাত্রে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে গরাদ ধরে আমাদের সমস্বরে চিৎকার করতে হোত—জমাদারনী—ডাক্তারবাবুকে খবর দাও। ঠিক সেই সময় আমরা যে বন্দী সেটা যেরকম ভাবে অনুভব করতাম—বোধ হয় তেমন আর কোন সময়েই করতাম না।" একদিকে অসুস্থ বন্দী কয়েদী অন্যদিকে ঘুমন্ত কারাগার মাঝখানে লৌহকপাট। এরপর শুরু হত কয়েদীদের আর্ত চিৎকার, জমাদারের ঘুম ভাঙত ধীরে ধীরে, সে ডেপুটি জেলার বা জেলারকে খুঁজতে যেত, তারপর শুরু হবে ডাক্তারবাবুর সন্ধান যিনি কারাপ্রাচীর থেকে দুই-তিন মাইল দূরে বাস করেন। জেলখানায় মেডিক্যাল এথিক্স বলে যে কিছু নেই তার বড় প্রমাণ লেখিকা কল্যাণীদেবীর নিদারুণ অভিজ্ঞতা।

তাঁর বিবরণ থেকে আমরা আরো জানতে পারি ডাক্তাররা বন্দীর

অসুস্থতাকে মানসিক পীড়া বলে মনে করেন—"বহরমপুর জেলে দেখিছি কোন বন্দীর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ডাক্তারবাবুকে—সিভিল সার্জেনকে কত অনুরোধ করেছি চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি সোজা বলে দিলেন—"এত ওঁর মনের অসুখ"।[১৫]

জেল-কম্পাউণ্ড

জেল-কম্পাউণ্ডের বর্ণনায় বিভিন্ন লেখক-লেখিকা তাঁদের উপলব্ধিকে মানসিক অবস্থানের দিক থেকে বর্ণনা করলেও ইংরেজ সরকারের নিগ্রহ ও অবহেলার দিকটিকে সকলেই তিক্ত অভিজ্ঞতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বন্দীমনের উপর জেল-কম্পাউণ্ড এক বিশেষধরণের মানসিক চাপ সৃষ্টি করলেও অনেকেই এর মধ্যে সৌন্দর্য, বিষন্নতা, বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্ব এবং নির্জনতা উপলব্ধি করেছেন। কারাপ্রাচীরের অন্তর্দৃশ্যের বর্ণনায় বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মূলত তিনটি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়—(১) কেউ কেউ ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন (২) অনেকে জেল-কম্পাউণ্ডের তথাকথিত সৌন্দর্য ও শোভায় বেশি মনোযোগী হয়েছেন এবং (৩) কেউ কেউ এর নির্জনতা ও বিচ্ছিন্নতার বিমূর্ত স্বরূপটিকে উপলব্ধি করেছেন।

আলোচনার সমর্থনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারাসাহিত্য থেকে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

যোগীন্দ্রনাথ বসু 'আমাদের হাজত' গ্রন্থে জেল-কম্পাউণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—"হাজত স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি মাত্র, কিন্তু কারাগার-অমরাবতী। কারাগারে নন্দনকানন আছে, পারিজাত পুষ্প আছে, এখানে বসন্ত বারমাস বিরাজিত।" অথবা—

"লঙ্কায় লোহা পাওয়া যায় না, সমস্তই সোনা ; হাজতে গন্ধ নাই, কেবল পদ্ম"
—এই নির্মম রসিকতার অন্তরালে হাজতের আসল রূপটি হল—

"যেমন লোহার সিন্দুকের ভিতর একটি কাঠের বাক্স, সেইরূপ কারাগারের ভিতর হাজত।"

পরিহাস-রসিক সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ কল'মর এক খোঁচায় জেলের সামগ্রিক চিত্রটি নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

ভারতভূখণ্ডে আন্দামান যেন বিচ্ছিন্ন আসামী। এজন্য দ্বীপান্তরের সাজা প্রাপ্ত কয়েদীদের কাছে তা এক নির্মম শব্দবিশেষ। আন্দামানের সেলুলারজেল সমেত সমগ্র পরিবেশটি কেমন, তা প্রথম আমরা জানতে পারি দ্বীপান্তরে

নির্বাসিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর জবানবন্দী থেকে। এর আগে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছে আন্দামানের কোনো চিত্রই গোচরে ছিল না। প্রকৃত-পক্ষে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ দ্বীপান্তরিত বন্দীদের কাছ থেকে আমরা প্রথম জানতে পারি সেলুলার জেলের বিবরণ। তিনি 'দ্বীপান্তরের কথা' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

"জেলের রূপটী কতকটা এইরূপ :—মানচিত্রের মাঝখানে একটী বিন্দু, সেটী একটী তিনতলা গুম্বজ বা মিনার—তাহাকে সেন্ট্রাল টাওয়ার বা গুমটি বলে। সেই গুমটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে যদি বৃত্ত বা মণ্ডল আঁকা যায়, তাহা হইলে সেইটিকে মোটামুটি হিসাবে জেলের বহিঃপ্রাচীর বলা যাইতে পারে। কেন্দ্রস্থ গুম্বজ হইতে সাতটি ঋজুরেখা বা ব্যাসার্দ্ধ সাত দিকে গিয়া মণ্ডলটীকে ছুঁইয়াছে,—এই সপ্ত রেখাই সাতটি মহল বা block, ইহারই নাম সেলুলার জেল। গুম্বজটি যেমন তিনতলা, তেমনি প্রত্যেক মহলটি তিনতলা। প্রত্যেক তলে এক লাইনে পাশাপাশি বিশ ত্রিশটি করিয়া কুঠুরি; কুঠুরিতে একটি করিয়া লোহার গরাদে আঁটা দরজা আছে, কবাট বা বন্ধ door leaf নাই; পিছনে সাড়ে চার হাত উঁচে যে ছোট জানালাটী আছে তাহাও দুই ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক গরাদে আঁটা। ঘরে আসবাবের মধ্যে দেড় হাত চওড়া এক একখানি নীচু তক্তপোস, আর ঘরের কোণে এক একখানি আলকাতরা মাখা মাটির ভাঁড। এই খাটে ঘুম হয় খুব সজাগ, কারণ একটু অসাবধানে পাশ ফিরিলেই ধপ্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া গিয়া অকস্মাৎ ভুমিশয্যা লইতে হইবে। আর ঐ আল্‌কাতরা মাখা ভাঁড়টি জীবের বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান আনিবার অপূর্ব যন্ত্র, কারণ ঐটিই রাত্রের শৌচাগার, এবং তাহা লইয়া সুঘ্রাণে কুতুহলে রাত্রি বাস করিতে হয়। আর বসিবার সময় চুরাশী রকম আসনের অনেকগুলি এই ভাঁড়টির সাহায্যে অভ্যাস হইয়া যায়। এগুলি জেল বন্ধ হইবার কিছু আগে বৈকালে মেথর ঘরে দিয়া যায়, আর সকালে নিয়মিত সরাইয়া লয়।

আগেই বলিয়াছি কুঠুরিগুলি এক সারে, আর তাহাদের সম্মুখ দিয়া একটি তিন চারি হাত চওড়া বারাণ্ডা চলিয়া গিয়াছে। বারাণ্ডাটিও গরাদে ঘেরা; তাহার মাঝে মাঝে থাম এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার শিকের দরজা, এ দরজা খুলিবার নয়, খিলানে আঁটা। সব দালান গুলির মুখ মাঝের গুম্বজ বা গুমটিতে গিয়া যুক্ত হইয়াছে, এইখানে লাইনে বা corridor এ প্রবেশ করিবার ফটক। রাত্রে এ ফটক বন্ধ হইয়া যায়। কুঠ্‌রীগুলি বন্ধ হয়

জোড়ায় হুড়কায়; তালা দিবার স্থান বাহিরে দেয়ালের গায়ে; ভিতর হইতে তালা বা হুড়কায় মুখ হাতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্লক ত্রিতল; উপর তলের নাম উপর লাইন বা Upper Corridor মাঝের তল বীচ লাইন বা Middle Corridor এবং নীচের তল নীচে লাইন বা Lower Corridor"।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মত মদনমোহন ভৌমিক 'আন্দামানে দশ বৎসর' গ্রন্থে জেল—কম্পাউণ্ডের বিস্তৃত ছবি এঁকেছেন এবং মন্তব্য করেছেন—

"জাহাজ হইতে জেলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে আনন্দ হইয়াছিল এখানে অহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা যে খাঁটি মাকালের ন্যায় উহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না।"

'ডোটনিউ'-এর লেখক অমলেন্দু দাসগুপ্ত বুদ্ধিমান, রসিক এবং ভাবুক। ফরিদপুর জেল-কম্পাউণ্ডের বর্ণনায় তিনি একাধারে কবি এবং নাগরিক—

"একতলা একটি বিল্ডিং-এ আমরা নয়জন থাকিতাম। দক্ষিণ-মুখী ঘর, খোলা লম্বা টানাবারন্দা। রেলিং-এর ও-ধারে জেলের পুকুর। তার পাড় ঘেঁষিয়া দক্ষিণে জেলের প্রাচীর।··· আমাদের বিল্ডিংটিকে বাংলো বাড়ীর মত মনে হইত। জেলখানায় এটি যেন কোন সৌখীন ধনীর স্বাস্থ্যনিবাস—সামনে একটু বাগান ও পরে পুকুরটি থাকায় এটি ঐরূপই দেখাইত।···

গ্রীষ্ম চলিয়া গেলে যখন বর্ষা আসিল, তখন সেই বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া চোখের ও মনের তৃপ্তি মিটাইতাম। · অন্ধকারে জেলের নর্দমায়, পুকুরের পাড়ে ব্যাঙ ডাকিত, রিমঝিম্ অবিরল পানি বরিষণ—শুনিতে শুনিতে যে কতরাত্রি জাগিয়াছি, তা বলে হাসি পায় না, ছেলেমানুষী মনে হয় না, বরং মন তৃষার্ত হইয়া উঠে সে-বর্ষারাত্রিগুলির জন্য। মনে করিতে আজও জলে-ভেজা বিহঙ্গীর মত একটুখানি ছোট ভীরু সুখ বুকের নীচে ডানা নাড়া দিয়ে উঠে, শেষ জল ফোঁটা ঝাড়িয়া ফেলিতে চঞ্চল হয়।"

লেখক সৌন্দর্যপ্রিয়, রোমান্টিক-কারাপ্রাচীর তাঁর কাছে নান্দনিক চেতনা বিকাশের একটি অনুষঙ্গ। এই জেলচত্বরেই তিনি পেয়েছেন মাটি, পৃথিবী, মেঘ, জল, পাখী এবং স্বপ্ন—যা সম্ভবত তাঁর ভাবনার জগৎ, অবকাশের জগৎ।

'আন্দামান বন্দী'র লেখক অনন্ত ভট্টাচার্য গ্রন্থের সূচনায় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের বিখ্যাত পূর্ব ও পশ্চিম ডিগ্রীর বর্ণনা করেছেন—

"অন্ধকার পাষাণপুরীর কোথাও এমন এতটুকু ছিদ্র নেই যে তার মধ্যে দিয়ে বাহির আকাশের সামান্য একটা আলোর রেখা প্রবেশ করে—জেলের ল' এও

অর্ডারের মর্যাদাহানি করে।" লেখকের অভিজ্ঞতা এখানে তিক্ত, 'ভেটিনিউ' এর মত এখানে আশা, আলো এবং কল্পনা নেই—

"ভুলে যেতে বসলাম বাইরের মুক্ত আলো বাতাসের কথা-ক্রমশঃ যেন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল, বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা— আমাদের যেন কেউ নেই, মা নয়, বাপ নয়, বন্ধু বান্ধব নয়-আমরা যেন নামহীন গোত্রহীন পরিচয়হীন—" প্রতি মুহূর্তের নিদারুণ অসহায়তায় দগ্ধ হয়ে তিনি কারাপ্রাচীরের বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছেন। এজন্যে দিনযাপনের গ্লানি তাঁর মনুষ্যত্বকে যন্ত্রণার চরমে নিয়ে গেছে।

রানী চন্দের 'জেনানা ফাটক' একটি স্মৃতিকথার মালা। যেহেতু বন্দী জীবনের স্মৃতি সেজন্য জ্বালা ও যন্ত্রণার সঙ্গে মিশেছে একটি নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা-প্রবাহ। রাজশাহী জেলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

"বেশ এই জেলটি। সিউড়ির চেয়ে বড়ো, গাছপালাও ঢের। চারকোনা সীমানা, পুবে দেয়ালঘেঁষা একখানা বড়ো ঘর—দু-দিকে লম্বা চওড়া বারান্দা ঘেরা। দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে খানিকটা ক'রে জমি—গাছে, ফুলে ছাওয়া। ফটক থেকে ঘর অবধি যাওয়া-আসার লাল রাস্তা। উত্তরে—জমির মাঝখানে একটি নিমগাছ; গাছের নিচে একটি পাতিলেবু ও হাস্নুহানার ঝোপ। তার চারদিক ঘিরে গাঁদা-বেলফুলের সবুজ গাছের সারি। পশ্চিম জমিতে দুটি আম গাছ, একটি কাঁঠাল গাছ, আর জায়গা নেই সেই আকাশটুকুতে। আম-কাঁঠালের পাতার শামিয়ানা মাথার উপরে; তলায় স্যাঁৎসেতে সবুজ শেওলার পতবর্কি পাতা। তারি একপাশে সরু একফালি পথ—পথের ধারে তারের জালের খাটুনি-ঘর। দক্ষিণে—ফলভরা দুটো পাতিলেবু গাছ—কাঁটাতারে ঘেরা। তার ও-পাশে—ক্যানার সারি, এ-পাশে লাল দোপাটি।

এ-ছাড়া সবুজ দেখতে পাই উঁচু দেয়ালের মাথার; নানা রকমের পাতা, ডাল; বট, পাকুড়, আম, জাম, শিরীষ, নিম—কত কী।"

বর্ণনাভঙ্গীতে কাব্যরস থাকলেও জেল-কম্পাউণ্ড যে আসলে একটি চিড়িয়াখানা তা লেখিকার বর্ণনাতেই আছে—'পথের ধারে তারের জালের খাটুনি-ঘর।'

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' কারাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আলিপুর জেলে এসে ভূপেন্দ্রবাবু জেলখানার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এই রকম—

"আলিপুর জেলের ভিতরের চেহারাটাই আলাদা। মাঝখানে চত্বর: লাল

রাস্তা জেলের ফটক থেকে অপর প্রান্তে গোশালা পর্যন্ত গেছে, দুইপাশে লাল লাল ব্যারাকগুলো, মাঝখানে ফুলের কেয়ারিকরা বাগান।" লেখকের বর্ণনা থেকে দেখা যায় জেল চত্বরটি পরিচ্ছন্ন, সাজানো, রক্ষণাবেক্ষণে যত্নের হাত রয়েছে। বর্মার বেসিন জেল সম্পর্কে বলেছেন—

"এক প্রান্তে দশটি সেল—সামনে অ্যান্টি সেল আছে, তারও সামনে আছে মস্ত বড় একটা দোতলা ব্যারাকের একটি সু-উচ্চ দেয়ালের জানালা দরজাহীন নীরেট দিক—আলোবাতাসের প্রতি প্রবেশ নিষেধ বাণী।"

বেসিন জেল সম্বন্ধে কয়েদীদের একটা আতঙ্ক আছে। এই জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন—

"বেসিন জেলের চেহারা দেখেই তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এক নিদারুণ ব্যাধির সর্বনাশ তখন মনটা জুড়ে খা খা করছে।"

বর্মার ইনসিন জেল সম্বন্ধে লেখক বলেছেন—"ইনসিন যে সেল ব্লকটায় আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে, গোটাকতো আম কাঁঠালের ছায়ায় সেটা ঢাকা—অনির্দিষ্ট জেল জীবনে নৈরাশ্যের মেঘলী ছায়ারই মতো। ··মস্ত বড জেল—৩৩০০ কয়েদি থাকে, ২২ জন জেলার। আমায় যে সেল ব্লকে পুরলো তার সামনে ও পেছনে আরও অনেকগুলো সেল ব্লক। আমাদের ঠিক পেছনেই একটা বড়ো গোছের করিডর সেল ব্লক, · · ঐ সেল ব্লকে দশ থেকে পনের বিশজন পর্যন্ত ফাঁসির কয়েদি প্রায় সর্বদাই থাকে।"

আমরা দেখতে পা চ্ছ—ইন্‌সিন জেলে মাঠ নেই, বা আলিপুরের মতো কেয়ারীবাগান নেই। আছে গোটাকতক আম কাঁঠালের ছায়া—যা লেখকের কাছে নৈরাশ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

কমলা দাশগুপ্তের 'রক্তের অক্ষরে' গ্রন্থে জেল কম্পাউণ্ডের একটি চিত্রধর্মী বর্ণনা আছে। বর্ণনাকৌশলে মুন্সীয়ানা যথেষ্ট—

"জেলে বন্দী চান নতুন করে একবার জন্মগ্রহণ করে, তারপর একটার পর একটার দরজা পার হয়ে তাদের নিযে চললো এক অজানা ব্যূহের দিকে। ডানদিকে র য়ছে একটা বটগাছ।·· যেতে যেতে বাঁ দিকে পড়ে চুয়াল্লিশ ডিগ্রী সেল। তার মধ্যে রয়েছে ফাঁসীর সেল। তারপর কুষ্ঠরোগীদের সেল। তারপর ইউরোপিয়ান ইয়ার্ড। এটিতে 'সবচেয়ে ভালো বন্দোবস্ত, রাজার জাতের থাকবার মত ব্যবস্থা।" দেখা যাচ্ছে জেল কম্পাউণ্ডে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েদীদের আলাদা আলাদা করে থাকবার ব্যবস্থা হলেও নীলরক্ত ও কালো

রক্তের তারতম্য যথেষ্ট। এরপর লেখিকাকে 'হিজলী' জেলে চালান করা হয়—'মস্ত বড় তার প্রাঙ্গন। প্রকাণ্ড তার ওয়ার্ড।' প্রেসিডেন্সীর তুলনায় আলো বাতাস ও প্রচুর। অদূরে ক্যাম্পে আছে ডেটিনিউ ছেলেরা। ওই ক্যাম্পের চূড়াটুকু দেখা যায়।' সন্ধ্যেবেলায় ওই চূড়ার পিছনে যখন সূর্য অস্ত যায়, হিজলীর বিরাট পশ্চিম আকাশে যেন সহস্র রঙে স্নান করতে থাকে, কেড়ে নেয় বন্দীদের হৃদয়। সেই আকাশ জেল জীবনে মস্ত বড় আকর্ষণ—

"সে আকাশ পরম বন্ধুর মত ভালবাসে, মায়ের মত সজল নয়নে স্নেহভরে তাকিয়ে থাকে, পিতার মত সমস্ত দুশ্চিন্তা আপনি এসে বহন করে।"

এখানে লেখিকা একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা হলো বন্দী জীবনের একঘেঁয়েমির এবং একাকীত্বের মধ্যে একটি বড় আনন্দের দিক হচ্ছে জেল থেকে জেলে স্থানান্তর। ঐ দিনটি আনন্দের দিন বলে মনে হয়। কারণ অন্য জেলে বদলী হলে ট্রেনে উঠতে হবে, বাইরের জগতকে কিছুক্ষণের জন্য চোখ ভরে দেখা যাবে। হিজলী জেলের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখিকা জানিয়েছেন যে প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল ইয়ার্ড বড় ছোট। হিজলীর সেই বিরাট আকাশ, প্রকাণ্ড অঙ্গন কিছুই এখানে নেই। ক্ষুদ্র পরিসর যেন বছরের পর বছর মানুষের ক্ষুদ্রতা ও হীনতাকে আরও পঙ্কিল করে তোলে।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'তখন আমি জেলে' গ্রন্থে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের বর্ণনায় বলছেন প্রায় দু'হাজার কয়েদী এখানে বাস করে। একেবারে শহরের মাঝখানে বলা যায়। জেলের মধ্যে থেকে বাইরের দোতলা ও তেতলা বাড়িগুলি দেখা যায়। ইয়ার্ডটি বড়। অনেকটা খোলা জায়গা রয়েছে। মাঝে মাঝে পুরোনো ছাতিম বা কদম গাছ, তার নীচটা গোল করে শান দিয়ে বাঁধানো। তারই এককোণে সারি সারি বোধহয় চল্লিশটা মলত্যাগের কুঠরী। এই কুঠরীগুলো মুখোমুখি। দুটি সারিতে বিভক্ত, কুড়ি আর কুড়ি। কিন্তু মজা এই যে, এই কুঠরীর সম্মুখ দিকে একেবারে খোলা আর বাকি তিনদিকে আড়াই ফুট উঁচু লোহার শিটের পার্টিশন। ভেতরে দু'পাশে সিমেন্ট দিয়ে বসানো দু'খানা ইট আর তার মাঝখানে পিচ লাগানো ছোট বেতের একটি ঝুড়ি। ইয়ার্ডের পূর্বদিকে ফুলের ছোট একটা বাগান। তাতে বাংলাদেশীয় নানারকম অজস্র ফুল ফোটে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের বর্ণনা থেকে একটি আধুনিক আশ্রমিক পরিবেশের বর্ণনা পেলেও আসলে এখানেও চলছে অত্যাচার আর অবিচার। লেখক বলছেন—

"জেলের ব্যাপার সবই অদ্ভুত। বাইরে যে ছিল চাষী, দেখা গেল সে জেলের মধ্যে নাপিতের কাজ করছে। আর যে ছিল নাপিত, জমাদারের ঝাড়ু তার হাতে।"

'নিঃসঙ্গে'র লেখক সতীশচন্দ্র হাজারীবাগ জেলে ছিলেন। তাঁর উদ্ধৃতিতেই আমরা যে জেল কম্পাউণ্ডের একটি চিত্র পাই তা হ'লো—

"হাজারীবাগ কেন্দ্রীয় জেলটি ছিল খুব বড়, তার চারিদিক অতিউচ্চ প্রাচীরে বেষ্টন করা। সেই প্রাচীরের স্থানে স্থানে দিনরাত্রি সশস্ত্র পাহারার জন্যে আছে অনেকগুলি গুমটী। এই বাহির প্রাচীরের চারিদেকে বেষ্টন করে আছে জল ভর্তি পরিখা। এর মধ্যে তৃতীয় বেষ্টনের কেন্দ্র আছে প্রহরীদের একটি বৃহৎ কেন্দ্র গুমটী ও রাষ্ট্রবন্দীদের জন্য অনেকগুলি প্রাচীর ঘেরা ওয়ার্ড। সাধারণ কয়েদীদের অপেক্ষা রাষ্ট্রবন্দীদের বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা।· প্রেসিডেন্সী জেলের মতো এখানে দুপুরে সেলে বন্ধ হলাম না; শুধু রাতে আবদ্ধ থাকতে হতো। হলের একটা সরু চৌবাচ্চা তাতে স্নান করলাম।"— এখানে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানুষটির মতোই জেল কম্পাউণ্ডটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। লোকালয়ের মাঝখানে যেন একটি বিভীষিকা; ব্রিটিশ সরকারের শান্তি রক্ষার জন্য কম্পাউণ্ডের চারপাশে আবার পরিখা কাটা।

ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য[১৬] তাঁর মুলতান জেলে অবস্থান কালে জেল-কম্পাউণ্ডের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এইরকম—

"সমস্ত জেলটি অনুমান প্রায় তিন মাইল জায়গা জুড়ে অবস্থিত। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট-বড় পাহাড়ের টিলাও আছে। মাঝখানে একটি চারতলা গম্বুজ। তাকে সেণ্টাল টাওয়ার বা গুমটি বলা হতো। সেই গুমটিকে কেন্দ্র তার চারদিকে যদি একটা বৃত্ত বা মণ্ডল আঁকা যায়, তাহলে সেটিকে মোটামুটি হিসাবে জেলের বহিঃপ্রাচীর বলা যেতে পারে। প্রাচীরগুলো খুবউচ্চ। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, উচ্চতায় কমপক্ষে পঁচিশ হাত। কেন্দ্রস্থ গম্বুজ থেকে দশটি ঋজুরেখা বা ব্যাসার্ধ দশদিকে গিয়ে মণ্ডলটিকে ছুঁয়ে আছে। এই দশটি রেখাই দশটি মহল বা ব্লক। এরই নাম মুলতান জেল। ......সমস্ত জেলের দশটি ব্লকের চল্লিশটি লাইনে একসঙ্গে আটশ ওয়ার্ডার বা সান্ত্রী এমনি ঘুরে ঘুরে নিজের পালা শেষ হলে অন্যকে জাগিয়ে দেয়। এইভাবে পালাক্রমে আটশ সান্ত্রী মিলে জেলে এই দুঃসাধ্য সাধনে নিশি ভোর করে।' মিঃ হেনরী ছিলেন এখানকার জেলার। তার বক্তব্য—'যদি আমার অবাধ্য

হও তাহলে ভগবান তোমাদের সহায় হতে পারেন, কিন্তু আমি যে হব না, সেটা স্থির জেনে রেখো। আর একটা কথা জেনে রাখো যে, এই মুলতান জেলের চার মাইলের মধ্যে ভগবান আসেন না।"

এই জেলের সীমানার মধ্যেই দীর্ঘ তেরো মাস নির্যাতন ভোগ করবার পর বিপ্লবী ফণিভূষণ ১৯৪৫ সালের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেন। শুধু মুক্তি নয়, এ'হল এক নতুন জীবন। উপরের যে গ্রন্থগুলি থেকে আমরা নানা উদ্ধৃতির সাহায্য জেল কম্পাউণ্ডের বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি, সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি কোনো লেখকই খুব বিস্তৃত বিবরণের দিকে কিম্বা নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনায় এগিয়ে আসেন নি। কিন্তু কয়েদখানার বর্ণনায় তাঁরাই বেশি করে নানা স্পর্শকাতর এবং অমানবিক ব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন। এর কারণ বন্দীজীবনে কয়েদখানাই হচ্ছে বন্দীদের থাকার একমাত্র জায়গা। এজন্য কয়েকখানা প্রসঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ এবং মর্মস্পর্শী। অন্যদিকে জেল-কম্পাউণ্ড তাঁরা এক এক লহমায় দেখেছেন। হয় এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরের সময় নয়তো কয়েদখানায় চুপচাপ বসে থাকাকালীন অবস্থায়। এখানে বন্দীর চোখ নিশ্চল ক্যামেরার মতো। আবার যেটুকু ছবি ঐ চোখে দেখেছেন তা হল-সামনের উঠোনটুকু, উঠোনের উপরের আকাশটুকু। তাঁদের মন তাই ঐ আকাশটুকুর জন্যে, ঐ সুন্দর সাজানো বাগানটুকুর জন্যে কেঁদেছে। তাঁরা কয়েদখানায় বসে বসে সেলের গরাদগুলোর ফাঁক দিয়ে বর্ষা দেখেছেন, গ্রীষ্ম দেখেছেন, রাতের আকাশ দেখেছেন, নক্ষত্র দেখেছেন, কখনও পূর্ণিমা কখনও বা অমাবস্যা দেখেছেন। যেহেতু তাঁরা রাজবন্দী হয়ে জেলে গেছেন এজন্য তাঁদের ওপর রয়েছে কড়া নজর। এজন্যে কম্পাউণ্ডের বিভিন্ন 'ইয়ার্ডে' প্রবেশাধিকার তাঁদের ছিল না। হাসপাতাল, জেলার ও সুপারের কোয়ার্টার তারা বন্দীজন্তুর মতো লক্ষ্য করেছেন—সেখানকার একজন হতে পারেননি। ফলে তাঁদের চোখ নেমে এসেছে খোলা বাগানটুকুতে যেখানে ছাতিম গাছ, কাঁঠাল গাছ, আম গাছ বা ফুলের কেয়ারি করা বাগানে। কিন্তু সকলেই অনুভব করেছেন এই কম্পাউণ্ড আসলে একটি অত্যাচারের তর্জনী যা বিভীষিকার মতো সমস্ত বন্দীদের মুখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েদখানা

খুনী, আসামী কিংবা রাজনৈতিক কয়েদী যেকোন কারণেই অভিযুক্ত আসামীর কারাজীবন বলতে মূলতঃ একটি সুনির্দিষ্ট ঘরকে বোঝায় যার অভ্যন্তর

'কয়েদখানা'। বাংলাদেশে ইংরেজ রাজশক্তির ক্ষমতা বিস্তারে শেষ প্রতিরোধ সিরাজদ্দৌল্লা—এবং সিরাজের কোলকাতা আক্রমণ ও 'হলহয়েল' আবিষ্কৃত অন্ধকূপ হত্যার গল্প, একটি বিরাট রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল ভারতে। এই অ-ন্ধকূপ হত্যা গল্পের কেন্দ্রে ছিল একটি কয়েদখানা। যে ব্রিটিশ কয়েদখানায় বন্দী সৈনিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য বিস্তারের শুরুতে রাজনৈতিক ঝড তোলবার চেষ্টা করেছিল, সেই ব্রিটিশই ততোধিক অত্যাচার এবং নৃশংসতা বজায় রেখেছিল ভারতবর্ষের কয়েদখানাগুলিতে।

বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোহের পনেরো বছর পরে লেখা একটি বিশিষ্ট নকশাধর্মী রেখাচিত্র 'সচিত্রগুল্‌জার নগর'। কাহিনীর নায়ক হেমাঙ্গ থানায় এসেছে, যেঘরে তাকে রাখা হযেছে "দেখলে বমি ওঠে, ঘরে-চম্‌সা গন্ধে নাড়ি ওঠে। দু-একটী নামমাত্র জানলা আছে তাদের হাওযা সঙ্গে কস্মিনকালে সন্দর্শন হয় না। আশ্বিনের ঝড়ের সময একবার পবন ঠাকুব তাঁদের সঙ্গে সাক্ষেৎ কবতে এসেছিলেন—কিন্তু তাতে তাব ছদ্দিগর্মি হওযাতে সেই অবদি্‌ নাকে খৎ দিযেছেন আর এমন কম্ম কববেন না"—লেখক পরিহাস-রসিক, অমানবিক কারাব্যবস্থার দেহে সাহিত্যের বর্ণাঢ্য পোষাক পবিযেছেন। কিন্তু এক লহমায় আমাদের কযেদখানার অস্বাবিক পরিস্থিতি বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। যেমন—(ক) চামসা গন্ধ (খ) নামমাত্র জানলা (গ) পবন ঠাকুবেব সঙ্গে জানালার বিরোধ অর্থাৎ হাওযা বাতাস বর্জিত একটি ঘর।

বন্দীর পক্ষে কয়েদখানা হচ্ছে জেলজীবনের প্রথম ও শেষ আশ্রয স্থল, কেননা বন্দীকে কয়েদখানায থাকতে হয়, বিশ্রাম করতে হয, ঘুমোতে হয়। সেহেতুই যেন কযেদখানাকে অমানবিক অস্বাস্থ্যকর একটি নরককুণ্ড করতেই হবে। কয়েদখানাকে এভাবে নরককুণ্ড করে রাখবার পেছনে সম্ভবতঃ একটিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে তা হচ্ছে বন্দীকে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু করে তোলো।

জেলখানার হাজত গৃহ আইনানুগভাবে একটি আলোবাতাসযুক্ত ঘরকেই বোঝায়। একজন সামাজিক মানুষ যেভাবে তার ঘরে বাস করে আমরা হাজত গৃহকেও তারই অনুরূপ একটি ঘর বর্তমানে বুঝে থাকি। স্বাস্থ্যানুকূল ঘর বোলতে বোঝায় শুধু আলো বাতাস যুক্ত কোন ঘর নয়, ঘরে থাকবার উপযুক্ত পরিবেশ। অর্থাৎ বন্দীর নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রও তার রক্ষণারেক্ষণ, শোবার জন্ত উপযুক্ত বিছানা, চাদর, পানীয় জল ইত্যাদি। অর্থাৎ এমন

একটি পরিচ্ছন্ন ঘর যা বন্দীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী। কিন্তু আমরা দেখতে পাব দেশকাল নির্বিশেষে কারাজীবন এবং কারাজগৎ নিয়ে যখন কেউ কিছু লিখ্ছেন, তখন তাঁরা কারা ব্যবস্থার নিদারুণ ও অমানবিক ছবিগুলি দেখে আহত হচ্ছেন।

বিভিন্ন লেখকের কয়েদগৃহ সম্পর্কিত আলোচনাগুলিতে আমরা কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাব। গৃহের যে সামগ্রিক ছবিটি বিভিন্ন লেখকের আলোচনায় খণ্ড, খণ্ড ভাবে রয়েছে, তা থেকেই কয়েটি দিক্ সাধারণ ভাবে আলোচিত হতে পারে। যেমন পরিসর, দরজা জানালা, আলো-বাতাস, মেঝে, দেওয়াল, দেওয়ালের রং, দেওয়ালের গাঁথনি, বসবার জায়গা, শোবার জায়গা, পানীয় জল, নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস ও তা রাখবার জায়গা ইত্যাদি। এভাবে বন্দীগৃহের বিভিন্ন দিক্গুলি যদি আলোচিত হয় তাহলে সব মিশিয়ে রাজবন্দীদের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবের একটি বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠবে যার নাম দেওয়া যেতে পারে নিষ্ঠুরতা। যেমন—"আমায় উভয় পার্শে সারি সারি বেদী বৎ মৃত্তিকা নির্মিত মঞ্চ বিরাজিত রহিয়াছে উহাকে কেহ যদি মঞ্চ না বলিতে চাহেন, তবে মৃত্তিকা নির্ম্মিত নিরেট বেঞ্চ বলিতে পারেন।·· ·· হাজতের বালিশ তুলার নয়, নারকেল ছোবডার নয়, শনের নয় হাজতে খাট মাটীর, বালিশও মাটীর।"—'আমাদের হাজত'-এ যোগীন্দ্রনাথ বসুর অভিজ্ঞতা।

উপরের বর্ণনা থেকে কয়েদখানার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, কয়েদীদের থাকবার ব্যবস্থার যে বর্ণনা দেখতে পাই সেখানে শয়নের উপযুক্ত শয্যা যেন বাডতি পাওনা। ঘরগুলি যতদূর সম্ভব ছোট এবং অস্বাস্থ্যকর হতে পারে তারই একটা যেন প্রতিযোগিতা চলেছে—কয়েদীদের জন্য আলাদা কোন কলঘরের ব্যবস্থা নেই—তাদের প্রাকৃতিক কাজকর্মগুলোর ঐ ভাবেই সেরে নিতে হয় ঐ একটা ঘরেই। মানুষকে ক্রমশঃ তার সুস্থতা থেকে অমানবিক পশুত্বে পরিণত করার এ যেন এক আজব কারখানা। সমগ্র বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক একটা কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন কায়িক এবং মানসিক দিক থেকে একজন হাজতে বসবাসকারী কিভাবে ক্রমশঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়,—কিভাবে তার সকল অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় মরচে ধরে যায়। লেখক 'অনিমেষ লোচনে' ঘরের শোভা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছেন, মানিয়ে নেবার অদম্য নিষ্ঠায় 'মূত্র বিষ্ঠার মধুর মধুর গরম গরম' ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে রসিকতার মোড়ক পরিয়ে নিজেদের অপরিসীম সহ্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের জেলখানা নয়, ইংলণ্ডের। চিত্রে বা চরিত্রে কোন পার্থক্য নেই—

"......ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারাকূপে কয়েদীর বাস, সপ্তাহে একদিন সম্মুখস্থ সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র বারান্দায় কয়েদীকে দাঁড় করাইয়া উলঙ্গ করা হইত। যাহারা নূতন প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের কাহার কি জিনিস সঙ্গে আছে, তাহাই তল্লাস করিবার জন্য উলঙ্গ করা। আমাকেও সেই লজ্জাকর ব্যাপার ভোগ করিতে হইয়াছিল।"

১৯০৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর লেখক বারীন্দ্রকুমার সহ আরও কয়েকজন বন্দী ছিলেন আলিপুর জেলে। তাদের চোয়াল্লিশ ডিগ্রিতে রাখা হয়েছিল। চোয়াল্লিশ ডিগ্রির প্রথম তিন চারখানি কুঠুরির নাম ছিল কনডেমণ্ড সেল। ফাঁসির আসামীর ঘর। তাঁদের স্নানাহার চল্‌ত বদ্ধ ঘেরা একফালি উঠানে, মানুষের মুখ বলতে তিন ঘণ্টা অন্তর এক একজন জেল পুলিশ ছাড়া কাউকে দেখতে পেতেন না। তা ছাড়া—

"ঘরে আসবাবের মধ্যে দেড় হাত চাওড়া এক একখানি নীচু তক্তপোস, আর ঘরের কোণে এক একখানি আলকাতারা মাখা মাটির ভাঁড়।... আর ঐ আলকাতরা মাখা ভাঁড়টি জীবের বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান আনিবার অপূর্ব যন্ত্র, কারণ এটিই রাত্রের শৌচাগার, এবং তাহা লইয়া সুঘ্রাণে কুতুহলে রাত্রি বাস করিতে হয়।"

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকেই লেখকের জেল জীবনের কষ্টকর নিঃসঙ্গতা এবং নরকযন্ত্রণার ছবিটা সুস্পষ্ট।

"এক কোণে শৌচ প্রসাবের জন্য দুইটি গামলা। তিনজনকেই সেইখানে কাজ সারিতে হয়; সুতরাং একজনকে ঐ অবশ্য কর্তব্য অশ্লীল কর্ম টুকু করিতে গেলে আর দুই জনে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কুঠরীর সামনে একটা বারান্দা। সেইখানে হাতমুখ ধুইবার ও স্নানাহার করিবার ব্যবস্থা।......প্রাচীরটা ছিল আমাদের চক্ষুঃশূল। সেটা যেন অহরহঃ চীৎকার করিয়া বলিত "তোমরা কয়েদী, তোমরা কয়েদী। আমার হাতে বন্ধন পড়িয়াছ, তখন আর তোমাদের নিস্তার নাই।"

প্রাচীরের ওপর দিকে একখানি আকাশ ও একটা অশ্বত্থ গাছের মাথা দেখ্‌তে পাওয়া কয়েদীদের কাছে 'জেলখানার কবিত্ব', বাকী সব কিছু 'নিরেট গদ্য'।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেল অভিজ্ঞতার অনেক কথাই বর্ণিত হয়েছে

তাঁর গ্রন্থে। কয়েদখানার নরকের ছবি, প্রাচীরের সুউচ্চ বিশালতা এবং মানুষের অমানবিক নিষ্ঠুরতা-সব মিলিয়ে লেখকের কষ্টকর জীবনের ছবিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী তথা এ্যাপ্রুভার নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ও কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হয়। 'বাংলার বিপ্লব কাহিনী' গ্রন্থের প্রণেতা হেমচন্দ্র কানুনগোই সে সময় আলিপুর জেলে ছিলেন। ফাঁসির মঞ্চের যাত্রী এই বিপ্লব তাপসকে কারাকর্তৃপক্ষ যে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো স্বস্তিতে কাটাতে দেননি তারই বর্ণনা দিয়াছেন হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর ঐ গ্রন্থে—

"তাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছিল। সেলটি বাঘের পিঁজরার মত। একদিকে রেল। অন্যদিকে দেওয়াল। পরিমাপ ৪ হাত আন্দাজ লম্বা ও ততটি চওড়া। শীতকাল, সত্যেন্দ্রের পরিধানে কম্বল ও তাহাতেই শয়ন। ঘরের এক কোণে মাটী দিয়া আচ্ছাদিত একটা বাঁশের চুবড়ী। তাহাই কমোডের কার্য্যকরিত ও ঐ ঘরেই খাইতে হইত।"

যতই পশুত্বের পর্যায়ে মানুষকে নামিয়া আনা হোক না কেন বাংলার মানুষের অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে মহান বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষয় স্মৃতিতে আজও অম্লান। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে লেখক হেমচন্দ্র কানুনগো আলিপুর জেলের কয়েদখানা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন—

"কুঠরীগুলো প্রায় দশফুট লম্বা আর আট ফুট চওড়া। সুমুখে লোহার গরাদে দেওয়া একটামাত্র দরজা। প্রত্যেক কুঠরীর সামনে প্রায় আট ফুট দূরে আট-ফুট উচু প্রাচীর। প্রত্যেক দুটো কুঠরীর মাঝে থেকে প্রাচীর অবধি আবার দেওয়াল অর্থাৎ প্রত্যেক কুঠরীর সামনে আট ফুট লম্বা আট ফুট চওড়া একটুখানি উঠোন। তার সামনের দিকে দরজায় মোটা কাঠের এক কপাট, তার মাঝে প্রহরীদের উঁকি মেরে দেখবার জন্য একটা ছোট ফুটো। এই দরজা-গুলোর সামনে চৌদ্দ পনের ফুট দূরে আবার চৌদ্দ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খুব লম্বা উঠান। এ যেন চিড়িয়াখানার মধ্যে খাঁচা।"

বন্ধনের মধ্যে বন্ধন, কঠিনপাশে আবদ্ধ রেখে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করবার অপূর্ব কৌশল এই কয়েদখানা।

"প্রতি প্রাঙ্গণে ৬৪—১১৬টি করিয়া কারাকক্ষ আছে। এক একটি কক্ষ ৯×৭ হাত। সম্মুখ ভাগে ৪×১॥ হাত একটি দ্বার' এবং পশ্চাৎ ভাগে

২ × ১ হাত একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন। এক প্রাঙ্গন হইতে অন্য প্রাঙ্গানের বিপ্লববাদী বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ ও সংবাদের আদান প্রদান করিতে হইলে এই বাতায়নের সাহায্যেই আমরা সরকারের আইন অমান্য করিতে পারি। এ বাতায়ন ভূমি হইতে প্রায় ৬ হাত উচুতে।……”

মদনমোহনের বন্দী জীবনের দশ বছর কেটেছে আন্দামানের জেল প্রাচীরের অন্তরালে, তাঁর কাছে জেলের চৌহদ্দি এবং কারাকক্ষের পরিবেশই বেশী পরিচিত। তাই তাঁর লেখার মধ্যে জেলজীবনের বাইরের কথাই কারাবার ফিরে ফিরে এসেছে।

“এটি সেলের ছোট পরিধির মধ্যে যখন অবিরত পায়চারি করি—তখন মনের পায়চারি চলে অফুরন্ত পরিধিকে কেন্দ্র করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাই দশ হাত জায়গায় ঘুরে ঘুরেও শ্রান্ত হইনে।

সীমার সঙ্গে সীমাহীনের জানাজানির অভাব ঘটলেই আসে ‘মনটনি’। দেহের সীমা আর মনের ‘সীমাহীন’ যখন একযোগে চলে, তখন যে কোনো অবস্থাতেও ‘মনটনি’র হাতে পড়তে হয় না।

জীবনে একটি মাত্র দুঃখই অসহনীয়। সে হচ্ছে মনের বৈচিত্র্যশূন্যতা। তবে মানুষ ভারি একমোডেটিং জীব। যেকোন অবস্থায়ই—নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় সে। মন বন্ধ্যা হোয়ে বসে থাকে না”—

ভূপেন্দ্রকিশোরের ‘বন্দীর মন’ তাই বন্দী থাকে না।
চারপাশের শিলাপ্রাচীরের কঠিন কঠোরতার মধ্যে লেখকের মনটি সব সময় পাড়ি দিয়েছে সুদূরের ব্যাকুল করা আশার জগতে।

বাঙলা উপন্যাসের ধারায় ‘জাগরী’ একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিষয় নির্বাচনে, ভাবনা, তথ্য সংগ্রহ, শিল্পপদ্ধতি-বৈচিত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গীর সর্বত্রগামিতা—এই সব দিক থেকেই নতুন। এজন্যে কয়েদখানা বর্ণনায় একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর স্বাক্ষর রয়েছে এখানে। তিনি কয়েদখানার বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলে ওঠেন। কিম্বা একা অনেকটা হেঁটে যান নিজের অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণাকে সরিয়ে রেখে। আবার তিনিই রাগে ফেটে পড়েন কারা প্রাচীরের স্বৈরতন্ত্রী নির্মমতায়। এগুলি কোন আপাত বিরোধ নয়—বরং বলা যায় আধুনিক উপন্যাসের চলার স্বভাব। শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার একেই বলেছেন—‘কৌশলের সুনিপুণ উদ্ভাবন’—এজন্য আমরা দেখবো কয়েদখানার বর্ণনায় সতীনাথ তথ্য আহরণে সাংবাদিক ; বর্ণনায় শিল্পী—“….. সেলের চুনকাম

করা সাদা দেওয়াল তাহাও বড় প্রাণহীন, বড়ই পাণ্ডুর। তাহার উপর কতদিন চুনকাম করা হয় নাই কে জানে; দেওয়াল ভরিয়া নানারকম দাগ-থুতুর দাগই বেশী—কেমন যেন পাঁশুটে রঙ—বোধহয় আমার পূর্বের কোন বাসিন্দাকে সিপাহীজীরা 'খয়নি' খাওয়াইয়াছিল। সে কবে সব ছাড়িয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে,—কেবল রাখিয়া গিয়াছে দেওয়ালে সিপাহীজীর প্রতি কৃতজ্ঞতার ছাপ।……

কথা বলিবার লোক নাই। সেইজন্য সেলের বাহিরের জেল-জগতের সহিত সম্বন্ধ কান দিয়া। কথা বলিতে পারি একমাত্র ওয়ার্ডারের সঙ্গে—তাহাও ভাল লাগে না। চারিদিকে দেওয়ালে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু সর্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকি, যদি বাহির হইতে কিছু শোনা যায়। ষোল পা লম্বা, দশ পা চওড়া ঘর। সম্মুখের দিকে মোটা লোহার গরাদের দরজা। দক্ষিণ দেওয়ালেছাতের কাছাকাছি একটি ছোট গবাক্ষ। তাহারই নীচে, মেঝের সঙ্গে একহাত চওড়া ও দেড় হাত লম্বা দুইখানি মোটা লোহার পাত বসানো। ইহাতে কতকগুলি ছিদ্র আছে। ইহার প্রয়োজন কী তাহা জানিনা—বোধহয় বাতাস আসিবার জন্য!"

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত বিপ্লবের একটি বিশেষ অধ্যায় বর্ণনা করেছেন ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। কারাগারের কয়েদখানার বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন—"সকাল বিকেলে সকলকেই উলঙ্গ করিয়া দেহ-তল্লাসী করিয়া পুনরায় সেল-এ চাবি বন্ধ করিয়া রাখা হইত। সেল বলিতে নয় ফুট দীর্ঘ-প্রশস্ত একটি ক্ষুদ্র কুঠরি; তাহারই একাংশে আল-কাতারা মাখানো দুটি বাঁশের টুকরিতে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত।…… সেল এর সামনে লোহার গরাদের দুয়ার ছিল, কোন জানালা ছিল না।"

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বিদেশী অনুবাদ সাহিত্যেও কারাগারের বর্ণনা প্রায় একই রকম। ভিকটর হুগো তাঁর 'ফাঁসীর আগের দিনে' দেখিয়েছেন—

"কারা—আমার চারিদেকে কারা। মানুষের মধ্যে জাফ্রি বা লৌহ শলাকার মধ্যে আমি কারা দেখতে পাই। প্রাচীর—পাথরের কারা, দরজা-কাঠের বন্দীশালা, আর রক্ষীরা যে অস্থিমাংসেরই কারাগার। কারাগার এক ভয়ঙ্কর মূর্তি—অবিভেদ্য আমি তার শিকার। আমার চিন্তায় সে বিভোর। আমায় সে করে আলিঙ্গন।"

দেখা যাচ্ছে দেশকালের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু পরিবেশ এবং কয়েদখানার পারিপার্শ্বিকতা সব দেশেই সমান। কারাগারের কণ্ঠরোধ করা পরিবেশ—কায়িক এবং মানসিক দিক থেকে মানুষকে অকটোপাসের নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে যেন বেঁধে ফেলেছে। বন্দীত্ব তার দেহে এবং মনে সর্বত্র।

সতীশচন্দ্র দে'র 'নিঃসঙ্গ, তার নামের মধ্যে দিয়েই লেখকের মনের একাকীত্ব এবং সঙ্গীহীনতাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক। ছোট সেলে বন্ত-জন্তুর মত অবিরাম পায়চারী করার মধ্যে দিয়ে মানসিক অস্থিরতা এবং এবং নিঃসঙ্গতাকে পাঠক বুঝতে পারে। একদিকে গুর্খা প্রহরী ভারী বুটের শব্দ, অন্তদিকে একজন নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তঃহীন পায়চারী—দুজনেই হেঁটে চলেছে—একজনের ভারী বুটের পদ শব্দ যেন শাসনের নির্মম প্রতীক—এই নির্মমতা সমগ্র দেশকে যেন চেকে ফেলেছে—অন্তদিকে বন্দীর অবিরাম পায়-চারী মনে করিয়ে দেয় মানুষের অন্তহীন এগিয়ে চলার বাসনাকে। এগিযে যাবে অনেকটা পথ; সেখানে অপেক্ষা করে আছে মানুষের কল্পনার জগৎ অনেক নতুন স্বপ্নের গল্প নিয়ে।

নলিনীকান্ত তাঁর জেল জীবনে অমানবিক নিষ্ঠুরতার কথা বলতে গিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার কথা স্মরণ করেছেন। মানুষই কিভাবে মানুষকে পরিচালিত করে, তৈরী করে; এই কুকুর বেড়ালের মতন খাঁচায় বন্দী জীবন, প্রাকৃতিক কাজকর্মের মধ্যে কোন আড়াল নেই—মানুষ যেন এক অদ্ভূত জীব তার অনুভূতি নেই, মন নেই, বিবেক নেই, লজ্জা নেই—লেখক রসিকতা করে বলেছেন 'লজ্জা' ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।'

সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার লালবাজারের লক আপের বর্ণনায় বলেছেন—"ঐ থানায় যে ঘরে আমাকে রাখা হইয়াছিল উহা ছিল একটি নোংরা অন্ধকূপ এবং মশা ও ছারপোকার কৃপায় নিমেষের জন্তও চোখের পাতা এক করা সম্ভব হয় নাই। নর্দমাদির ব্যবস্থা মারাত্মক রকমের খারাপ ছিল এবং গোপনীয়তা রক্ষার আদৌ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পূর্বে অন্তেরা যেরূপ বলিয়াছেন,—পৃথিবীতে নরক যদি কোথায় থাকে তাহা হইতেছে লালবাজার থানা—ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা এখন আমার পক্ষে সম্ভব হইল।"

১৯৪৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় নাবিকরা যে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করেছিল তা ব্যর্থ হওয়ায় পাঁচ হাজার ভারতীয় সৈন্ত বন্দী হলো। ফণিভূষণও গ্রেপ্তারবরণ করলেন। মূলন্দ বন্দী-শিবিরে নিয়ে গিয়ে লেখকের

পোষাক থেকে পোর্ট অফিসারের ব্যাজটি খুলে দেওয়া হলো। বিচারাধীন বন্দী হিসাবে বিচার হচ্ছে কোর্ট মার্শালে। বিচারে অনেকের সঙ্গে লেখকেরও যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হলো। এই কারাদণ্ড চলবে মুলতান মিলিটারী জেলে। কয়েদী হিসাবে এই জেলের কয়েদখানার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন ফণিভূষণ। মুলতান জেলে একটি কেন্দ্রস্থ গম্বুজ আছে—"গম্বুজটি যেমন চারতলা, তেমনি প্রত্যেক মহলও চারতলা। প্রত্যেক তলায় এক লাইনে ২৪০ টি কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরিতে একটি করে লোহার গরাদ আঁটা দরজা আছে। কপাট বা বন্ধ ডোর লিফ নেই। পেছনে সাড়ে চার হাত উঁচুতে যে ছোট জানালাটি আছে তাও দুইঞ্চি ফাঁকা ফাঁকা গরাদে আঁটা। ঘরে আসবাবের মধ্যে একহাত চওড়া তিনখানা নারকেল দড়ির খাটিয়া, আর ঘরের কোণে একটি আলকাতরামাখা মাটির ভাঁড়। প্রত্যেক কুঠরিতে তিনজনের বেশী লোক ধরে না। কিন্তু আমাদের কোন কোন সময় পাঁচজন থেকে সাতজন করে রাখা হতো। প্রত্যেককে খাটিয়া দেওয়া হতো না বা আলাদা আলাদা ভাঁড় দিত না। ঐ ভাঁড় দেওয়া হতো যদি রাত্রিতে কেউ পায়খানায় যায়, তার জন্যে। যে নারকেল দড়ির খাটিয়ার কথা বলা হলো তাতে ঘুম হতো খুব সজাগ থেকে। কারণ একটু অসাবধানে পাশ ফিরলেই ধপ্ করে মাথা ঠুকে গিয়ে ভূমিশয্যা নিতে হবে।

কুঠরিগুলো এক সারে। তাদের সামনে দিয়ে তিন -চার হাত চওড়া বারান্দা চলে গিয়েছে। বারান্দাটি গরাদে ঘেরা। তার মাঝে মাঝে থাম এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার শিকের দরজা। এদরজা খুলবার নয়, খিলানে আঁটা। সব দালানগুলির মুখ গুমটিতে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। এখানে লাইন বা corridor—এ প্রবেশ করবার ফটক। রাত্রে এ ফটক বন্ধ হয়ে যায়। কুঠরিগুলি বন্ধ হয় লোহার হুড়কায়। তালা দেবার স্থান বাইরে দেওয়ালের গায়ে, ভেতর থেকে তালা বা হুড়কার মুখ হাতে পাওয়া যায় না।" নিরানন্দ নিঃসঙ্গ বন্দীজীবনের একমাত্র আশ্রয় স্থল হ'ল এই কয়েদখানা।

উপরের আলোচনায় ভারতের (এবং বিদেশেরও) বিভিন্ন জেলে, বিভিন্ন সালে, বিভিন্ন বন্দীর কয়েদঘরের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, স্থান এবং কালভেদে অত্যাচারের কোন পরিবর্তন হয়নি। একটি অমানবিক কারাব্যবস্থাই বার বার বিভিন্ন লেখকের অভিজ্ঞতায় ফিরে ফিরে এসেছে। তবুও যাঁরা দেশপ্রেমিক, বীর, মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী—যাঁরা আত্মত্যাগ

ও ভালবাসাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পাদরূপে গণ্য করেন—তাঁরা এই অমানবিক কারাকক্ষের মধ্যেই অনুভব করেছেন সত্যকে, উদ্বোধিত হয়েছেন নব-মানবতায়। তাঁরা ফিরে ফিরে নতুন মানব ভাষার চিন্তা ও কল্পনায় মেতে উঠেছেন ; বিশ্ব জগৎ, জীবন এবং প্রত্যক্ষ-অত্যাচারকে এক দার্শনিক জিজ্ঞাসার স্তরে, মননশীল চিন্তার স্তরে, কাব্যময় সৃষ্টির স্তরে নিয়ে গেছেন। আমরা বারে বারে আশ্চর্য হই ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক কারাকক্ষের ছবি দেখে। অন্যদিকে শ্রদ্ধায় নত হই সেইসব বীর দেশপ্রেমিকের জন্য—যাঁরা হাজার অত্যাচারের মধ্যেও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন এবং উচ্চঃস্বরে জানিয়েছেন—"বন্দেমাতরম্", "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" এবং "স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।"

জেল কর্মচারীদের ব্যবহার, দুর্নীতি ও জেল-নিয়মাবলী

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একটি কমিশন ইংরেজ সরকার তৈরী করেছিল। এরপর থেকেই কারাব্যবস্থাকে শাসনের উপযোগী করা হয়। পরের সালগুলিতে শাসনব্যবস্থার ভিত দৃঢ় করতে দিন দিন ভারতবর্ষের জেলগুলি ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনখানায় পরিণত হয়। জেলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। জেলব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে ভারত-বাসীর প্রতি আক্রমণ ও প্রতিরোধের দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে। জেলখানা সরকারের সামরিক শক্তি হিসাবে কার্যকর হতে থাকে, যাতে স্বদেশপ্রেমীরা জেলখানা নামক বাহিনীর দ্বারা শায়েস্তা হতে বাধ্য হয়।

আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ১৯০৫ সালের পর থেকে এখানকার জাতীয়-তাবাদীরা যতোই আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি, বিদেশী রাজশক্তির শোষনের কবল থেকে নির্যাতিত জাতি হিসেবে মুক্তির নীতি, স্বাধীনতার জন্য বীরত্ব-ব্যঞ্জক যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করতে থাকেন ততোই ইংরেজ সরকার জেলখানায় অত্যাচারও দুর্নীতিকে পরিকল্পিতভাবে বাড়িয়ে তুলতে থাকে।

আমরা অত্যাচার ও দণ্ডব্যবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি বন্দীদের মানসিক ভারসাম্যের বিপর্যয় ও তাঁদের স্বাস্থ্যভঙ্গ, অ-পুষ্টি, অসুস্থতা সৃষ্টি করতে, কায়িক শ্রমে নিঃশেষ করে তুলতে জেলখানাগুলির কর্তৃপক্ষ কিভাবে সক্রিয় ছিল। সেই চিত্রকেই আরো ব্যাপক ও বিশ্লেষিত করে জানা যাবে প্রহরী ও পদস্থ কর্মচারীদের চরিত্র, দুর্নীতি, ও নিয়মাবলী প্রসঙ্গে। উচ্চ বা নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের আচরণ ও চরিত্রে কোন প্রভেদ নেই। আশ্চর্যের বিষয়

দুর্নীতি, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ইত্যাদির সংগঠন জেলখানাগুলো নানাভাবে নির্যাতন করেও দেশপ্রেমিক বীর কারাবাসীদের আত্মিক শক্তি ও দৃঢ়তাকে কিছুমাত্র হীন করতে পারেনি। জেল কর্তৃপক্ষ তথা ইংরেজ সরকার চেয়েছিল অপ্রতুল ও অতি নিম্নমানের খাদ্য দিয়ে, বন্দুক, আগুন, বলাৎকার ও ফাঁসীর ভয় দেখিয়ে মহান দেশপ্রেমিকদের স্নায়ুশক্তির পতন ঘটাতে। এজন্য তারা পাঠান অফিসার, জেলার ব্যারী সাহেব ও মারে সাহেব, স্যামুয়েল হোর প্রভৃতি অত্যাচারী উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী নিয়োগ করেছিলো। বন্দীর সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা উচ্চমানের খাদ্য গোপনে যোগান দিত। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে এরা মিলিত হতো যৌন ব্যাভিচারে। অন্যদিকে জেলের নিয়মাবলীতে সর্বদাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে উন্নত, সুস্থ মানবিকতাপূর্ণ জেল-ব্যবস্থার কথা। আমরা বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি থেকে দেখতে পাবো কি ভাবে জেলখানায় কর্মচারীরা দুর্নীতি ও নির্যাতনের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন জেলগুলিতে বেশ কয়েক যুগ ধরে চালু রেখেছিল।

যোগীন্দ্র নাথ বসুর লেখা থেকে জানতে পারি জেলের কতকগুলি নিয়মাবলী-

১। "হাজতের কয়েদীগণ, অবশ্যই জেল-সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট হুকুম নামা করিবে, এবং কি মাহিনা প্রাপ্ত জেলের কর্মচারী কি অবৈতনিক জেলের কয়েদী, যাহাদিগকে ঐ হাজতের আসামীগণের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে তাহাদিগকেও ঐ হাজতের আসমীগণ অবশ্যই মান্য করিবে।"

২। "হাজতের আসামীগণের যদি কোন দুঃখ বা কষ্ট জানাইবার কারণ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সুপুরিণ্টেন্ডেণ্ট সাহিব প্রাতঃকালে যখন হাজতে পরিদর্শন আসিবেন, তখন তাহাকে জানাইবে।"

৩। "হাজতের যাবতীয় কয়েদীকেই সকল সময় নীরব থাকিবার জন্য জেদ করিয়া বলা হইবে।"

৪। "পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কয়েদীরপোষাকে, বিছানাপত্রে এবং কয়েদঘরে রাখিতে হইবে। অতি জঘন্য নীচ কাজ কাহাকেও করিতে হইবে না।"

৫। "আহারের একটা সুষ্ঠ পরিচ্ছন্ন তালিকাও থাকিবে।"

যে নিয়মাবলীর তালিকা উপরে দেওয়া হল তার সঙ্গে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে কতটা পার্থক্য সেটা আমরা জেল জীবনের নির্যাতন ও আহারের অংশে উল্লেখ করেছি।

'দ্বীপান্তরের কথায়' এক পাঠান অফিসারের কথা জানতে পারি—লেখকের ভাষায় "পোর্টব্লেয়ারে ইহারা যমের দোসর, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে, নিজেরা যেমন অলস, কর্মভীরু ও কুলুষিত চরিত্র, তেমনি পরকে খাটাইতে ওস্তাদ ও দুর্দান্ত।"

এই লোকটি (খোয়েদাদ) ভীষণ বদমেজাজী ছিল। এই খাঁ সাহেবকে তুষ্ট করার জন্য লেখক নিজের দুধ খাঁ সাহেবকে দিতেন। খাঁ সাহেব দুধের ঐ উৎকোচটুকু গ্রহণ করে লেখককে কিঞ্চিৎ নির্যাতন থেকে রেহাই দিতেন।

লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় কারাজীবনে মানুষ কি ভাবে দুর্নীতির শিকার হয় সে কথা বলছেন-

(১) দাগী পুরাণ চোরের সাহচর্য্য ও পাপবৃত্তির উপভোগ দর্শন।

(২) কঠিন কাজের অসামর্থ্য। যখন সে ত্রিশ পাউণ্ড তেল আর কিছুতেই পিশিয়া উঠিতে পাবে না, তখন দণ্ডের ভয়ে সমর্থ বদমাইসের শরণ লয় এবং তাহার পাপ প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়া বিনিময়ে নিজের অর্দ্ধেক কাজ তাহাকে দিয়া করাইয়া লয়।

(৩) ভয় প্রদর্শন ও দণ্ডের তাড়নার উপর প্রতিষ্ঠিত এই জেলবিধি পরোক্ষভাবে অধঃপতনের কারণ। প্রথম প্রথম হাতকড়ায় দাঁড়াইতে, বেড়ি পরিতে, বা উলঙ্গ হইয়া বেত খাইতে প্রাণান্ত লজ্জা ও ভয় থাকে, কিন্তু একবার এ ভয় ও লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ মরিয়া হইয়া উঠে, একটা অন্ধ রাগে ও ঘৃণায় কঠিন হইয়া পাপের পথে যায়। ব্যর্থ ক্রোধে আত্মঘাতীর চিত্র জেলখানায় অতি সুলভ।

(৪) অভাবের তাড়না। নেশার জিনিষ (তামাক বা অন্য কিছু) পাবার জন্যে যে কোন কুকর্ম করার ঝোঁক দেখা যায়।

(৫) বাধ্যতামূলক কৌমার ব্রত। মানুষের স্বাভাবিক ক্ষুধাকে আইনের দ্বারা চেপে রাখা যায় না। সহবাসের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ নানা ধরণের বীভৎস উপায়ে যৌন ক্রিয়া করে।

(৬) জ্ঞানলাভের এখানে কোন উপায় নেই। কোন অনুষ্ঠান বা কোন ভাল বই পাঠ করার সুযোগ নেই।

(৭) সেলুলার জেলে remission এর কোন ব্যবস্থা নেই। শুভবুদ্ধি এতে জাগে না। কারণ কয়েদীরা জানে ভাল কিছু করলেও "মাফ্" নেই।

(৮) সাজার কোন সীমা নেই। পোর্টব্লেয়ারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের কাল আমৃত্যু।

(৯) নানা দিক থেকে নৈতিক অধঃপতন অনেক রোগের উৎপত্তি ঘটায়। কয়েদীদের এই সব রোগ ধরা পড়লে শাস্তি হয়, সতীত্ব বলে কোন ব্যাপার কয়েদখানায় নেই। রিপুর নৃত্য এ নরকে একেবারে উলঙ্গ ও পৈশাচীক। এবং এই নারকীয় অবস্থার মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বছরের পর বছর থাকতে হয়েছে।

বিপ্লবীবীর হেমন্তকুমার সরকার তাঁর 'বন্দীর ডায়েরী' গ্রন্থে জেলের সাধারণ অবস্থা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক জেলজীবনের কিছু নিয়ম কানুনের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং সেই সমস্ত আইন কানুন ভাঙলে কী ধরণের শাস্তি দেওয়া হয় তার কথাও বলেছেন—

Punishments :—

(1) Hard labour in case of simple imprisonment.
(2) Forfeiture of remission, privileges etc.
(3) Solitary Confinement.
(4) Link fetters,
(5) Bar fetters
(6) Cross-bar fetters
(7) Hand-Cuffing behind or to a staple
(8) Penal diet
(9) Whipping.
(10) Substitution of gunny clothing for ordinary dress.

সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের আদেশ অনুযায়ী কয়েদীদের সমস্ত কিছু করতে হোত। কোনও কোনও জেলে কত বাটি জলে স্নান করতে হবে, তাও ঠিক করা হোত।

এছাড়া 'সিপাহী জমাদার সকলে যেন একটি ক্ষুদ্র লাটসাহেব। কেহ কয়েদীকে দিয়া জুতার ফিতা বাঁধায়, কেহ পা টিপাইয়া লয়, আর মুখে চব্বিশ ঘণ্টা কয়েদীর মা-বোনের শ্রাদ্ধ তো লাগিয়াই আছে—কথায় কথায় মারা এবং কেস্ করাও আছে। ঘুষ খাইতে এমন ওস্তাদ জীব আর নাই। Convict mate, Convict Warder প্রভৃতি নিজেরা কয়েদী হইয়াও এইরূপে অত্য

কয়েদীর প্রতি অত্যাচার করে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলিয়াই ইংরেজের জেল চলে।'

মদনমোহন ভৌমিকের "শাসন বিভাগ" নামক অধ্যায়টিতে জেলার ব্যারে সাহেবের অমানুষিক নির্যাতনের বিবরণ পাই। আন্দামানে "বাচ্চা ফাইল" অর্থাৎ অল্প বয়স্ক অপরাধী বালকদের জন্যে পৃথক কোন কারাগৃহ ছিল না, এরা বড কয়েদীদের সঙ্গেই বাস করত। এর ফলে নানা ধরণের ব্যাভিচার চল্‌ত জেলজীবনে। এই সব সুকুমারমতি বালকদের এই নোংরা পরিবেশ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য লেখক এবং অন্যান্য অনেকেই প্রতিবাদ করেন। এঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, গুরুমুখ সিং প্রভৃতি ছিলেন। এঁদের প্রতিবাদের ফলে বিপ্লবীদলকে অতিরিক্ত ৬ মাস ডাণ্ডাবেড়ি ও নির্জন কারাদণ্ডের হুকুম হয।

য়েরোডা জেলের অভিজ্ঞতায় গান্ধীজী জেলের কিছু ভীতু প্রকৃতির আমলাদের কথা বলেছেন, এদের মনের মধ্যে কিছু 'মানবিক গুণ থাকলেও এরা কোন স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলতে পারে নি। চাকুরী বজায় রাখা এবং প্রমোশনের খাতিরে সুপারকে খোসামোদ এব' সুপারের নিজস্ব শাসনের নিয়মেই এইসব জেলের আমলাদের চলতে হয়। জেলের সুপারিটেণ্ডই হচ্ছে সর্বময় কর্তা। সুপরিটেণ্ডের দৃঢ বিশ্বাস ছিল যে তার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। ইউরোপীয়ান সুপাররা অনেক সময লোকমতের বিরুদ্ধে ও সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত বিধি নিষেধ ও হুকুম ফেলে দিয়ে যা ইচ্ছে করে থাকেন।

যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কারা পরিদর্শক এবং রাজকর্মচারীরা কারা পরিদর্শন করতে আসেন, কিন্তু পরিদর্শকদের কাছে অভিযোগ করার মতন সাহস খুব কমই দেখা যায়। কারণ প্রহরীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস যারা অল্প বিস্তার দেখিয়েছেন তাঁদের কপালে নানা রকমের শাস্তি এবং বেত্রাঘাতে সোহাগের পৌনঃপুনিকতার সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে। শাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করলে কয়েদীদের উপর স্যামুয়েল হোর নামক এক জেলসুপারের কথা উল্লেখ করেছেন নেহরুজী যার ক্রোধ নেহরুর মনে ইতিহাস হয়ে আছে।

কারাগারে থাকাকালীন জহওহরলাল নেহরু যুক্ত প্রদেশের কারাগারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—"অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে যুক্তপ্রদেশের জেলগুলি এখনও ভয়াবহ অনাচার, বীভৎসতা এবং মিথ্যাচারে ভরা।"

লেখকের মতে কারাসংস্কার-সেখানকার ব্যবস্থা এবং ব্যবহারের মধ্যে মূঢ়তা বা মনুষ্যত্বহীনতা যেন না থাকে। কঠিন পরিশ্রমের ব্যবস্থা নিশ্চয় থাকবে, তা বলে জেলের ঘানি বা যাঁতা-কল ঘোরানোর মত মূল্যহীন, নিরর্থক এবং বর্বর শ্রম প্রথা থাকবে না। বন্দীরা যে জিনিষ উৎপন্ন করবে, তাদের প্রতি-পালনের খরচ বাদ দিয়ে প্রচলিত বাজার দরের হিসাবে সেই দ্রব্যের জন্য তাদের মূল্য দিতে হবে। খেলাধূলা, পড়াশুনা বা বক্তৃতা ব্যবস্থা করা, ভাল গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা, সংবাদ পত্র পাঠের ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্নদেশের কারাসংস্কার উল্লেখ করেছেন লেখক। দেখিয়েছেন সেই সব দেশের কারাব্যবস্থায় আধুনিক মানসিকতা।

হেমচন্দ্র প্রথম থেকেই বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির উচ্ছেদ কামনায় সচেষ্ট ছিলেন। জেলব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"জেল ডিসিপ্লিন যে কি বীভৎস ব্যাপার, তা মালুম হয়েছিল তখনই—যখন শীতকালে প্রতিদিন ভোর ৫টায় এক ডাকে সকলকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিছানা গুটিয়ে নিজের দরজার সামনে "এটেনস্যান" হয়ে দাঁড়াতে হ'ত; হুকুমদার ওয়ার্ডার সাহেব-দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেককে স্যালিউট করতে হ'ত। তারপর ৫ মিনিটের মধ্যে ঝাট-পাট দেওয়া সেরে চৌবাচ্চা থেকে মাত্র একটি বালতী জল এনে, লোহার মরচে-ধরা খালি কটোরা সাফ করা. দাঁত মাজা, স্নান করা ও কাপড় কাচা সারতে হ'ত। একটু দেরী হলেই অকথ্য রকমারী গালাগাল আর ধমকানী। সন্ধ্যার সময় তালাসী দিতে আর কুঠরী বদল করতে হ'ত। পরস্পর আলাপ ত দূরের কথা, চোখাচোখী হলেও গালাগালির অন্ত থাকত না। রাত্রিতে পাহারা বদলের সময় হঠাৎ ভীষণ শব্দে তালা নাড়া দিয়ে ডেকে জাগিয়ে দেখত, বেঁচে কি ম'রে আছি। আদালত থেকে আসবার সময় জেলের বড় ফটকে সকলের সামনে সমস্ত কাপড ছেড়ে, পা ফাঁক ক'রে উঠ বোস হয়ে তালাসী দিতে হ'ত। এর আগে তিন মাস যাবৎ যে হরেক রকম উপাদেয় অপর্য্যাপ্ত খাবার আসত, তা তখন স্বপ্ন ব'লে মনে হ'ত। আর পেটের কষ্টটাই যে সব চেয়ে বড় কষ্ট, তার পূর্ণ উপলব্ধি তখনই হয়েছিল।

সব চেয়ে অসহ্য হয়েছিল কথা বলতে না পাওয়া। তখন পূজার ছুটী; কাজেই আদালত যাওয়া ঘটত না। দিনের পর দিন, সব সময় শুয়ে ব'সে কেবলই চিন্তা আর চিন্তা! তাও আবার খালি দুশ্চিন্তা। সে কি ভীষণ!"

নেহরু ভগিনী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের জেলজীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা জানতে পারি জেলের দুর্নীতি আর অন্যায়ের উন্মত্ত তাণ্ডবের কথা—

"ঘুষ যে কি পরিমাণে এখানে চলে ভাবলে গা-রিরি করে ওঠে। ঘুষের নানান ফিকির আছে, কখনো কখনো খোলা-খুলি ভাবেই দেওয়া হয়।... জেলখানা হল মানুষকে জ্যান্ত কবর দেবার জায়গা।·জেল একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্ব, দুঃখের রাজ্য, বেদনার মানচিত্র।"

লেখক অতীন্দ্রনাথ জেলখানার ডাক্তারের চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন,—

'জেলের ওষুধ গোপনে বাইরে যায়, এ বাজারে দু-পয়সা আনে। কাজেই আমাদের চিকিৎসার কাজ যথাসম্ভব সারতে হয় আশ্বাস বাণী ও বিশুদ্ধ জলবায়ু দিয়ে।' এরফান নামে এক কয়েদী অত্যন্ত দুর্বল সে ভাল করে দাঁড়াতে পারে না—ডাক্তার তাকে লিখেছেন—'ডিসচার্জ, ফিট ফর অয়েল-প্রেস'। এর দুদিনের দিন এরফান মারা যায়-'ঘানি ঠেল্‌তে ঠেলতে সে পড়ে গেল আর উঠল না।'

'সপ্তাহে একদিন পণ্ডিত আর মৌলবী আসেন কয়েদীদের ধর্মোপদেশ দিতে। উঠ্‌তে বস্‌তে যাদের মনুষ্যত্বের অপমান, রোগ ও অখাদ্যে জীর্ণ দেহ সেই লোকগুলোকে কী ধর্মশিক্ষা তারা দেন? চিত্তশুদ্ধির আগে পিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন বেশী।'

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা থেকে জানতে পারি প্রেসিডেন্সি জেলে দুর্নীতির ছড়াছড়ি। দুর্নীতিতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন তারাই যাঁরা নীতির রক্ষক। একবার যে জেলে কয়েদী হয়ে ঢোকে সে পাকা অপরাধীতে পরিণত না হয়ে পারে না। লেখককে মিথ্যা অপরাধে সাধারণ কয়েদীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। লেখকের একটা উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পারি ব্রিটিশ রাজত্বে আদালতের পরিচয়টা। 'মামলার শুনানী শুরু হয় ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসে। রায় দেওয়া হয় ১৯৩৫ সালের মে।' এই একুশ মাস লেখকের কি ভাবে কেটেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কারাবাস স্মৃতির এক পূর্ণ আলেখ্য আছে বিপ্লবী গণেশ ঘোষের 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' গ্রন্থে। জেল-নিয়ম পরিবর্তনের অনেক তথ্য আছে এখানে। অনশনে যতীন দাসের প্রাণ ত্যাগের পর সারা দেশব্যাপী যে প্রচণ্ড আন্দোলন ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল তার ফলে ভারতের অনিচ্ছুক ব্রিটিশ সরকার ভারতের কারাগারে বন্দীদের অবস্থা ও বন্দীদের প্রতি সরকারের

ব্যবহার সম্পর্কে দৃষ্টি দিতে এবং ঐ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তনের বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতের কারাগার সমূহে সরকারের স্বীকৃত মাত্র দুই শ্রেণীর বন্দী ছিল: ভারতীয় শ্রেণী ও ইওরোপীয়ান শ্রেণী। ইওরোপীয় শ্রেণীতে পরিগণিত হত কেবলমাত্র তারাই যারা ইওরোপের অধিবাসী কিম্বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অথবা এদেশীয় ফিরিঙ্গি যাঁদের একটা সাহেবী নাম থাকত; কোট পেণ্টুল পরতে পারত; এবং নিজেদের ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত কিম্বা তাদেরই নিকটতম আত্মীয় মনে করত। সেই যুগে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে পূর্ব পর্যন্ত এই ইওরোপীয় শ্রেণীর বন্দীদের ভারতের কারাগারে প্রায় রাজার হালে থাকবার ব্যবস্থা ছিল, সরকারী অর্থে এই ধরনের বন্দীদের জেলখানায় যে পোশাক পরিচ্ছদ, যে খাদ্য এবং যে বিছানাপত্র দেওয়া হত তা বাইরের ইওরোপীয়দের জীবনযাত্রার প্রায় সমপর্যায়ের ছিল।

আর এই শ্রেণীর বন্দী ছাড়া কারাগারের অন্য সব কয়েদীদেরই ভারতীয় শ্রেণী বলে পরিগণিত করা হত। এদের যে পরিচ্ছদ দেওয়া হত তা অতিশয় সামান্য, কেবলমাত্র কোনোরকমে নগ্নতা রক্ষার উপযোগী বলা যায়। এদের বিছানা ছিল মাত্র দুটি 'কুলি কম্বল'; শীতের তিন মাস একটি বেশী কম্বল। এদের খাবার বাসন ছিল একটি লোহার থালা ও একটি লোহার বাটি যে দুটিতে দেখা যেত প্রত্যহই মরচে ধরে একেবারে লাল হয়ে রয়েছে। প্রত্যহ দুই বেলাই এই দুটিকেই ভাল করে না মেজে ঘসে ভাত খাওয়ার কিম্বা জল খাওয়ার কোন উপায় থাকত না। এই শ্রেণীর বন্দীদের জন্য খাদ্যের যে ব্যবস্থা ছিল তা যত নিকৃষ্ট ধারণা করা যায় তাই। অবশ্য কারা আইনে যা বলা ছিল সেই অনুসারে এই বন্দীদের প্রত্যেককে প্রতি ৭।৮ দিন পরে একটু মাছ ও পরের ৭।৮ দিন পরে একটুকরো মাংস দেবার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা সব সময় হয়ে উঠত না।

১৯৩১ সাল পর্যন্ত ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সব বন্দীকেই এবং কংগ্রেসী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বহু সংখ্যক বন্দীকে এই ভারতীয় শ্রেণী' ভুক্ত হয়ে এই অবস্থার মধ্যে অশেষ কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

পরিশ্রম, অত্যাচার ও দণ্ডব্যবস্থা

ব্রিটিশ আমলের কারাব্যবস্থার যে বিস্তারিত বিবরণ আমরা তৎকালীন রাজবন্দীদের স্মৃতিকথা বা অভিজ্ঞতা থেকে সংকলন ও সূত্রবিন্যস্ত করেছি,

তার কিছু সমাজবিজ্ঞানগত মূল্য ও তাৎপর্য আছে, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কারাসাহিত্য নামে অভিহিত এই জাতীয় বিবরণের মধ্যে নিভৃত আনন্দবেষ্টিত রসসাহিত্যের সম্ভোগ-উপকরণ নেই, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কারাগারের পরিবেশই অজস্র অসাহিত্যিক মানুষকে সাহিত্যমুখী প্রকাশ-ইচ্ছুক লিখনলিপ্সু করে তুলেছিল। সেই সাময়িক আত্মপ্রকাশের সাহিত্য মূল্য অকিঞ্চিৎকর হলেও সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্য নিতান্তই অবহেলার যোগ্য নয়। কারাগারের অবরুদ্ধতা নিঃসঙ্গত্যই কোনো রাজবন্দী বা সাধারণ বন্দীকে কলম ধরতে বাধ্য করেছিল, একথা সর্বাংশে সত্য নয়। অবশ্য অনেকে কারামুক্ত হওয়ার পর তাঁদের স্মৃতিচারণা করেছেন, কিন্তু স্মৃতিচারণা যখনই করুন বা যখনই তা লিখিত আকারে প্রকাশিত হোক, কারাজীবন-যাপনই যেহেতু সেই সাহিত্য প্রয়াসের মুখ্য হেতু, তাই এই ধরণের যাবতীয় রচনা একসূত্রেই আমাদের বিবেচ্য। একথা জোর করেই বলা যায়, একদিকে যেমন নিঃসঙ্গতা নির্জন জীবন-যাপন বন্দীকে আত্মনিষ্ঠ ও প্রকাশপ্রয়াসী করেছে, তেমনি কারান্তরালের অভিনব অজ্ঞাতপূর্ব অন্ধকার জগতের রীতিনীতি দণ্ড-প্রণালী পীড়ণ-নিষ্ঠুরতা ও মনুষ্যত্বহীনতার নব নব উদ্ভাবন পদ্ধতি ও সে সকলের বিচিত্র প্রয়োগব্যবস্থাও বহু দণ্ডপ্রাপ্ত বা বন্দী সামাজিক মানুষকে বিচলিত করেছিল। তাই সে সবের স্মৃতিকে তাঁরা হারিয়ে যেতে বা বিস্মৃতির মধ্যে অবলুপ্ত করতে চাননি। সেগুলি লিখতে চেয়েছেন, সভ্য সমাজকে বাইরের জগৎকে জানাতে চেয়েছেন। কেউ স্বয়ং লিখেছেন, কেউ তাঁদের জীবন-অভিজ্ঞতা অপরকে শুনিয়ে গেছেন, যাতে সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়। এইভাবেই কারাব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা একটি অপরিমেয় তথ্যের খনি আবিষ্কার করেছি, যার সন্ধান সরকারী আইনে বা কাগজ পত্রে নেই—অভিজ্ঞ মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় মসীলিপ্ত হয়ে আছে।

কারাব্যবস্থা সম্পর্কিত এইসব আলোচনায় জেলজীবনের ভিতরকার দমন-পীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, দৈহিক ও মানসিক ক্লেশপ্রদানের বিচিত্র ঘৃণ্য অভিনব ও প্রচলিত নানা তথ্যের সন্ধান পাই।

সে অত্যাচার কখনো প্রত্যক্ষ নির্য্যাতন হিসাবে, কখনও জেল কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণ হিসাবে আবার কখনও বা অবহেলা দুর্নীতি থেকে আসে। আমরা কয়েদখানা, আহার, স্বাস্থ্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি একটি অ-মানবিক জেল ব্যবস্থা যা পরোক্ষে অত্যাচার হিসেবে কয়েদীদের আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে

রেখেছে। এক নারকীয় জেল ব্যবস্থায় কয়েদীরা থাকতে বাধ্য হয়েছে। আবার অন্যদিকে এই অত্যাচারই প্রত্যক্ষ চেহারা নিয়ে এসেছে কখনও পরিশ্রমের মধ্যে, কখনও অত্যাচারের মধ্যে, কখনও বা দণ্ড ব্যবস্থায়।

জেলখানায় পরিশ্রম কোন বিচ্ছিন্ন অত্যাচার নয়। এটি একটি শ্রমব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য জেল অবস্থানকালে কয়েদীরা শারীরিক মানসিক ভাবে যেন জীবন-বিচ্ছিন্ন না হয়। তারা যেন কর্মঠ, সক্রিয় এবং সৃষ্টিশীল থাকে। বন্দীদশায় যে নিঃসঙ্গতায় আলস্য ও মানসিক বৈকল্য নিয়ে আসে তারই বিপরীত কোটিতে পরিশ্রম ব্যবস্থা। 'পরিশ্রম' একটি উৎপাদনমুখী ব্যবস্থা বা বিধি। কিন্তু আমরা আলোচিত রাজবন্দীদের রচনাগুলি থেকে দেখতে পাবো পরিশ্রম কিভাবে একটি অত্যাচারের কৌশল হিসাবে জেলখানায় কাজে লাগানো হয়েছে। পরিশ্রম প্রতিটি ক্ষেত্রেই কয়েদীর শারীরিক সামর্থ্যের অতিরিক্ত হয়ে ওঠে। কয়েদীরা যেন যন্ত্রদানব। তারা যেকোনো পরিশ্রমের উপযুক্ত যন্ত্র। পরিশ্রম মূলতঃ অত্যাচারেরই একটি মৌলিক পদ্ধতি। এজন্য আমরা পরিশ্রম, অত্যাচার ও দণ্ডব্যবস্থাকে একটি পরিধির মধ্যে বাঁধতে চেয়েছি। দণ্ডব্যবস্থাও হ'ল কয়েদিকে স্বীকারোক্তির নামে, তার মানসিক রূপান্তরের নামে, কয়েদীর অপরাধপ্রবণতার মূলোচ্ছেদের নামে জেল কর্তৃপক্ষের একটি সুপরিকল্পিত অপরাধ—আপাতদৃষ্টিতে যাকে শৃংখলা ও শাসনব্যবস্থা বলা হয়েছে। কয়েদীদের শ্রেণী অনুযায়ী, রাজবন্দীদের মর্য্যাদা পরিশ্রম, অত্যাচার ও দণ্ড-ব্যবস্থার নানা রকমফের হয়। বিভিন্ন লেখক তাঁদের জেলজীবনের যে স্মৃতি-চারণা করেছেন তা থেকে আমরা জেনেছি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিশ্রম তার স্বাভাবিক সংজ্ঞায় উপস্থিত থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অমানুষিক। দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমদানের এই বিধি ব্যবস্থা খুবই কঠোর। এখানে কাজের লঘু গুরু বলে কিছু নেই। মধ্যযুগের ক্রীতদাসের মতো কয়েদীদের নানাধরণের কঠিন কঠোর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অক্ষমতায় পাওয়া যায় শাস্তি-অনেক ক্ষেত্রে যার অপর নাম প্রায় মৃত্যু।

অত্যাচার ও দণ্ড ব্যবস্থার কোনো নির্দিষ্ট স্বরূপ নেই। বিভিন্ন জেলে বিভিন্ন কয়েদীদের মধ্যে নানাধরণের নিপীড়ন বহাল থাকে। বন্দীর যে একটি মানসিক সত্তা আছে, তার যে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বতন্ত্র পরিচয় আছে-তার কোন সম্মান ও মর্য্যাদা এখানে দেওয়া হয় না। যদিও গান্ধীজী বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জেল জীবনে কখনই স্বর্গসুখ বাঞ্ছিত বা

আকাংক্ষিত নয়। বন্দীরা সেখানে জাতীয় মুক্তির জন্য দায়বদ্ধ। ব্রিটিশ সরকারের কাছে চিরকাল তাই অত্যাচার ও নিপীড়ন হিংস্র প্রতিরোধ হিসেবে সক্রিয় থেকেছে।

আমরা আলোচনার শেষে বিভিন্ন লেখকের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখাতে চেয়েছি যে কীভাবে বিভিন্ন জেলে দণ্ডিতদের ওপর নানা অত্যাচার ও দণ্ড কার্যকর হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের পশ্চিমী গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুধু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও রাজনৈতিক কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর উপর শাসক দলের নির্দয় মনোভাব কী অমানুষিক নির্যাতনের আকারে প্রকাশ পায়। তার কিছু সাহিত্যিক নজির আছে।

জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাসীর মঞ্চ থেকে' গ্রন্থটি অনবদ্য। দুশো সাতষট্টি নং সেলের বাসিন্দা ফুচিকের এই সেল সম্পর্কে জবানবন্দী—
'জানালা থেকে দরজা, আবার দরজা থেকে জানালা। সাত পা এগুনো আর পেছুনো। ·· দেয়ালের পাশে ভাঁজকরা খাটিয়াটি, আর একধারে একটা বিশ্রী তাক। তার উপর মাটির একটা ভাঁড়। হাঁ, সবই তো জানি।· জানালার নীচে আমি খড়ের গদিতে চুপ করে শুয়ে আছি—একহপ্তা এমনি পড়ে আছি ···আবার যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছি।' সভ্যজাতির এই হলো কয়েদখানা বা কসাইখানা। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা, সেলের এই নিঃসঙ্গ ভয়ংকর জীবন ফুচিককে নিঃশেষ করতে পারেনি। জীবনে এসেছে নবতম উপলব্ধি—'বন্দী-জীবন আর নিঃসঙ্গতা সব যেন এক হয়ে আছে মানুষের মনে। কিন্তু সে তো মস্ত ভুল। বন্দী তো একা নয়। কয়েদখানা তো এক গোষ্ঠী, কঠোর মেয়াদেও মানুষ কখনও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না—' বন্দীজীবনের এই উপলব্ধি, আত্মবিশ্বাস ও বিশ্লেষণ অবিস্মরণীয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জওহরলাল নেহরুর কারা-স্মৃতিকথা এ প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। নেহরুর লেখা আত্মচরিতে আমরা নির্যাতনের নতুন দুটি দিক দেখতে পাই—(১) লাইফার (২) নির্জন সেলে বন্দী। লাইফার হচ্ছে প্রত্যেক কয়েদীর কাঁধে একটা কাপড়ের সঙ্গে আটকানো আছে একখানি ছোট কাঠের চাকৃতি-তারমধ্যে তাদের নম্বর, কারাদণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মুক্তির তারিখ লেখা থাকে। নেহরু একজন অপরাধীকে দেখেছিলেন যাঁর মুক্তির তারিখ ছিল ১৯৯৬। তার

জেলজীবন শুরু হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে। একটা মানুষ সর্বক্ষণ বয়ে বেড়াচ্ছে তার মুক্তির দিনের তারিখটি যে তারিখ আগামী ৬৬ বছর পরে আসবে। দীর্ঘ কয়েক জীবনের প্রত্যেকটা একঘেঁয়েমী সকাল শুরু হচ্ছে অসম্ভব আশা আর কল্পনায় ৬৬ বছরের দীর্ঘ পথকে সামনে রেখে। সুস্থ মানুষ কেমন করে মানসিক রোগী হয়ে উঠতে পারে তারই স্বয়ং সম্পূর্ণ উপায় এই "লাইফার" পদ্ধতি।

নির্জন সেলে অধিকাংশ তরুণের বৈপ্লবিক কার্য্যের শাস্তি স্বরূপ নির্য্যাতন করা হচ্ছে। একটা নৈরাশ্যময় শূন্যতা, অদ্ভুত বোধহীনতার জন্ম হয় এই নির্জন সেলের অন্তরালে। মানুষের তেজকে মানুষের স্থৈর্যকে এখানে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে—মানুষ ক্রমশঃ একটা অস্বাভাবিক বোধশূন্য জড়ত্বের নামান্তর মাত্র হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি একদিকে অমানবিক কাজের প্রচণ্ড ভার অন্যদিকে কাজহীন, সঙ্গীহীন হয়ে বেঁচে থাকার অমানুষিক যন্ত্রণা।

একজন মার খাওয়া বিপ্লবী স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন ভারতের, শুধু চেয়েছিল ভারতের প্রত্যেকটা অধিবাসী দু-বেলা পেট ভরে ভাত আর ডাল পাবে। তার স্বপ্ন তার আকাঙ্ক্ষায় কোন ফাঁকি ছিল না, তবু তাকে সঙ্গীহীন হতে হয়, বন্ধু-হীন হতে হয়—ক্রমশঃ সে একা-একা হতে হতেই একদিন সকল অনুভবের বাইরে একটা জড় পদার্থে পরিণত হয়, শুধু শারীরিক নিয়মে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-টাই শোনা যায় আর সব প্রাণ চঞ্চলতা—আশা অকাঙ্ক্ষা প্রেতাছায়ার আলো-আঁধারী নির্জন ঘর তাকে ঘিরে থাকে।

'জেলখানা কারাগারে' নির্যাতনের দুটি বিশেষ উপায় দেখি—(১) কম্বল ধোলাই, (২) ডাণ্ডাবেড়ী। নিকুঞ্জ সেনের বর্ণনায় দেখা যায়—

"কম্বল ধোলাই ইংরেজের জেলখানার এক অদ্ভুত আবিষ্কার। অপরাধীকে লইয়া যাওয়া হইত একটি Punishment Cell-এ। সেখানে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। বাংলায় জেলখানার পরিভাষায় ইহাকে বলা হইত 'ডিগ্রী বন্ধ'। কম্বল কিংবা চট দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ মুড়িয়া তাহাকে শায়িত করা হইত এবং ঐ অসহায় বন্দীর উপর কিছুক্ষণের জন্য চলিত নির্দয় লাঠির প্রহার। এই অভিনব ধরণে 'ধোলাই' করার সার্থকতা কর্তৃপক্ষের কাছে এই ছিল যে, এত প্রহারের পরেও দেহে সেই আঘাতের বড় একটা চিহ্ন থাকিত না, অথচ ব্যথা বেদনায় সারা শরীর অবশ হইয়া যাইত, কিছুদিন পর্য্যন্ত উঠিয়া বসিবার কিংবা পাশ ফিরিয়া শুইবার কোন সাধ্য তাহার থাকিত না'—ইংরাজ সরকারের

যুক্তির তারিফ করতে হয়, সাপও মারা হবে লাঠিও ভাঙবে না গোছের ব্যবস্থা। অন্যায়ভাবে শাসনের কোন চিহ্ন নেই কয়েদীর অঙ্গে অতএব প্রমাণও নেই সুতরাং বিচারকের কাছে নালিশ করার পথও বন্ধ।

অপরটি হচ্ছে 'ডাণ্ডা বেড়ী'—'প্রথমে দুই পায়ে গোড়ালির ঠিক উপর ভারী দুইখানি চমড়ার পাত মুড়িয়া দেওয়া হইত, তাহার পর ঐ পাতের উপরে পরানো হইত দুইটি ভারী লোহার বালা। দুই পায়ের সেই বালা দুইটিকে প্রায় একহাত লম্বা একটি লৌহদণ্ড দিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইত যাহাতে ইচ্ছামত ঐ ডাণ্ডাবেড়ীধারী 'কদম-কদম' না বাড়াইতে পারে। আরও দুইটি ভারী লৌহদণ্ড ঐ লৌহবলয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উর্দ্ধদিকে প্রলম্বিত থাকিত। ভুক্তভোগী কয়েদী ঐ ডাণ্ডা দুইটিকে দুইহাতে ধরিয়া পথ চলিত; পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিত শৃংখলধ্বনি। বহুদূর হইতে সে ধ্বনি যুগপৎ দুঃখীর দুঃখ এবং ইংরেজের জয়গৌরব ঘোষণা করিতে করিতে চলিত।"

মানুষ কতটা সহ্য করতে পারে, কতটা ভার বহন করতে পারে—এই বহন দুইভাবে সত্য, একদিকে বস্তুর ভার অন্যদিকে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার এক নিদারুণ পরীক্ষা।

লেখিকা কল্যাণীদেবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফসল 'জীবন অধ্যয়ন'। মেট্রনের বিরুদ্ধে এক নারী কয়েদী প্রতিবাদ করেছিল বলে তার কপালে জুটেছিল প্রচণ্ড বেত্রাঘাতের স্নেহ ভালবাসা। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরমে তাকে একফোঁটা পিপাসার জল দেওয়া হয়নি। লেখিকা অত্যন্ত গোপনে সেই তৃষ্ণাকাতর মেয়েটিকে একটু জল দিয়েছিলেন। বিকালবেলায় কারারক্ষী পুনরায় মেয়েটির উপর চালিয়ে গেল অজস্র লাঠি বর্ষণ। মেয়ে কয়েদীদেরও রেহাই ছিল না।

লেখক হৃষিকেশ শীল তাঁর গ্রন্থে সেলুলার জেলের বন্দীদের ওপর, যে অমানুষিক নির্য্যাতন চালানো হতো তার বির্ণনা দিয়েছেন। পরিশ্রমের নামে বন্দীদের ওপর যে অমানবিক নিপীড়ন ও অত্যাচার চলতো তা বিপ্লবী সাভারকর বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। লেখক তারই এক সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে—

"আন্দামানে এই বন্দীদিগকে কী কঠোর পরিশ্রমই না করিতে হইত। সর্ষপ তৈল নিষ্কাশন করিবার জন্য বলদের মত কাঠের ঘানিতে বাঁধিয়া দিত এবং এইরূপে সাভারকরকে প্রত্যহ ৮০ পাউণ্ড তৈল নিষ্কাশন করিতে হইত।

নারিকেল ছিলার রজ্জু প্রস্তুত করিতে হইত তাহাতে অংগুলী ক্ষত-বিক্ষত হইত। পাথর ভাংগিতে হইত। তৎকালে এই বন্দীনিবাসে ভাই পরমানন্দ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা নির্বাসিত জীবনযাপন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে পরস্পরের সান্নিধ্য হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত যে তাঁহারা কোন প্রকার আলাপ করিতে পারিতেন না; একমাত্র কক্ষ পরিবর্তনকালে নয়নের নীরব ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন।"

বন্দীজীবনে এই অব্যক্ত দৈহিক পরিশ্রম শিক্ষিত ভদ্র সন্তানগণের পক্ষে যে কত বেদনাদায়ক ছিল ত' কল্পনাও করা যায় না।

উল্লাসকর দত্তের ভাষায়, 'হিন্দুস্থানে বৃষ যেইরূপ জুয়ালে বাধিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ সরিষার তৈলের প্রতি ঘানিতে তিনটি করিয়া নরদেহ বাঁধিয়া দেওয়া হইত। দিনে বারো ঘণ্টার মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিট আহারের জন্য সময় পাওয়া যাইত, ইহা ভিন্ন সব সময় ঘানির চারিদিকেই দ্রুত পদে ঘুরিতে হইত। যদি কেউ শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে পড়িয়া যাইত বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া গাত্রোত্থানে বাধ্য করিত। যদি কেহ একান্তেই উঠিতে না পারিত তাহাকে চলমান ঘানিতে বাঁধিয়া দিত—দেহ-ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হইয়া যাইত। আমাকেও এইরূপ দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি যখন আমার কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিতাম তখন মনে হইত সেইদিন ঈশ্বরের অনন্ত দয়ায় কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছি। বন্দীনিবাসের নিয়ম অনুসারে অনেকেই ছয়মাস পরে মুক্তিলাভ করিল কিন্তু আমাদের দুঃখ ছিল অনন্তকাল।'

১৯৪৪ সালের নৌ-বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর সংগ্রামী নাবিক ফণীভূষণ ভট্টাচার্য্যকে মুলতান জেলে যাবজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই জেলে অবস্থানকালে কয়েদীদের ওপর যে নারকীয় অত্যাচার করা হতো তার বিবরণ দিয়েছেন ফণিভূষণবাবু—"মুলতান মিলিটারী জেলকে যমপুরী আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, ১৯৪৪।......মুলতান জেলে দিন কাটাচ্ছি। এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাপন আরও ভয়াবহ। তা বর্ণনারও অতীত। মধ্যযুগীয় যে বর্বরতাপূর্ণ অত্যাচারের কাহিনী শোনা যায় এ-যেন তাকেও হার মানিয়েছে। প্রতিদিন আমাদের ওপরে রুটিন-মাফিক যে অত্যাচার করা হতো তা নিম্নরূপ:

প্রতিদিন ভোর চারটায় আমাদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেতো 'সেল্'

থেকে জেল-পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যে খোলা মাঠের বধ্যভূমির এক কুঠরীতে। এরকম কুঠরী ওখানে সারিবদ্ধভাবে ২,৪৫০ টি আছে। প্রত্যেক কুঠরীতে একজন করে বন্দীকে হাতে-পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে ওপরে কড়িকাঠের সঙ্গে হ্যাণ্ডকাপে শিকল এঁটে ঝুলিয়ে দিত। পরে সঙ্কর মাছের লেজ (যার গায়ে অসংখ্য কাঁটা থাকে) দিয়ে হুইপ করা হতো। পাঠান সৈন্যদের ওপরে আদেশ ছিল প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট হুইপ্ করতে হবে। কেউ যদি ঐ ত্রিশ মিনিট পূর্ণ হবার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়তো, তাহলে তাকে নামিয়ে ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে চাঙ্গা করে নিয়ে আবার ঐ জহ্লাদেরা ঝুলিয়ে দিত বাকি সময়টুকু পূর্ণ করবার জন্যে। কীরকম 'আইনের-এর দাস' একবার ভেবে দেখুন: অবশ্য এটা স্বাভাবিক, কারণ, মিলিটারীতে যে-পরিবেশে সৈন্যদের রাখা হয় (বর্তমানে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে) তাতে স্বকুমার-বৃত্তির মানুষগুলোও পশুতে পরিণত হতে বাধ্য হয়। আমি প্রথম প্রথম অজ্ঞান হয়ে যেতাম। ঐ একই দাওয়াই দিয়ে আমাকে চাঙ্গা করে আবার ঝুলিযে বেত মারা হতো, আধঘণ্টা বেত মারার পরে আমাদের নামিয়ে নীচে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হতো।"

বৈকুণ্ঠ স্বকুলের ফাঁসির পূর্ব রাতের এবং ফাঁসি—মঞ্চে আরোহণের যে নিখুঁত ও অবিস্মরণীয় ছবি লেখক উপহার দিয়েছেন তা শুধু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নয়, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলিয়ে একাত্ম হয়ে বৈকুণ্ঠধামের যাত্রী বৈকুণ্ঠ স্বকুলের জীবন-সায়াহ্নের মর্মস্পর্শী বিদায় দৃশ্যটি উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'সেই মহাবরষার রাঙা জল', লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত।

বিপ্লবী লেখকের অভিজ্ঞতা এইরকম—

'কয়েদী যখন সাজা নিয়ে জেলে আসে তখন দশদিন তাকে কোয়ারেণ্টাইনে থাকতে হয়—তারপর তাকে হেলথ পাশ করবার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হেলথ অনুযায়ী হার্ড, মিডিয়াম ও লাইট কাজ অর্থাৎ কামানের (কাজের) ব্যবস্থা করা হত। স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টই সেটা ক'রত।

বার্ক সাহেবের আমলে যখন কামান পাস করবার জন্য কয়েদীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হোতো, তখন বার্ক সাহেব তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করাতো। কয়েদীকে দাঁড় করিয়ে তার মাথাটা নুইয়ে হাঁটুর সঙ্গে ঠেকান হত। তারপরে বার্ক সাহেব তার গুহ্য দেশে থুতু দিয়ে হা হা করে অট্টহাসি হাসতো। একটা নমুনা দিলাম মাত্র। এই নিরিখে জেলের কয়েদীদের অবস্থা অনুমান করা

যেতে পারে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন কিন্তু এটা হত। শুধু দু'একদিন নয়, কয়েক বছর ধরে, বার্ক সাহেব যতদিন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিল।"

অথবা

'পনের নম্বর' ঢুকে দেখলাম এটি পাশাপাশি দশটি সলিটারী সেল-এর সমষ্টি। সলিটারী কনফাইনমেন্টের জন্য যে সেল তাকে কোথাও সলিটারী সেল আবার কোথাও কনডেমড সেলও বলা হয়। যে এতে থাকেনি বা এ দেখেনি তার পক্ষে এর ধারণা করা মুস্কিল।

ফুটের মাপে ঠিক বলতে পারবোনা—সেলগুলি লম্বায় প্রায় দুই মানুষ এবং প্রস্থে প্রায় দেড় মানুষ হবে। ঢুকবার জন্য প্রায় সমস্ত প্রস্থটা জুড়ে মোটা মোটা লোহার গরাদের বিরাট এক সিংহদ্বার। একেবারে পিছনে উপরের ছাদের কাছে স্কাইলাইটের মাপের মোটা লোহার দণ্ড দিয়ে সুরক্ষিত একটি ঘুলঘুলি বা ক্রস-ভেন্টিলেশন। ঢুকে ডানদিকের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে ডানদিকের দেয়ালের কোনে দাঁড়িয়ে গম বা ডাল ভাঙবার জাঁতার জন্য একটি উঁচু সিমেন্টের বেদী।

ঐ সেলের সামনে প্রায় ঐ সেলের মাপের কি তার চেয়ে সামান্য একটু বড় ঐ রকমই পাষাণ প্রাচীর ঘেরা অঙ্গন। তফাৎ শুধু উপরে ছাদ নেই এবং বাইরে যাবার দরজাটা পুরু কাঠের। বাইরে থেকে দেখবার জন্য কাঠের পাল্লায় একটি বড় গোল গর্ত। সেলের ভিতরে থাকলে সামনে দেয়াল আর আকাশের একটু অংশ ছাড়া আর কিছু দেখা যেতনা।"

সর্বত্যাগী বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্রের উল্লিখিত কয়েকটি নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানবো। ১৯১৮ সালে রাজসাহী জেলে বসে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর যে অমানুষিক দৈহিক নির্য্যাতন করা হয়েছিল তা তিনি যোগেশবাবুর মুখ থেকেই শোনেন। যোগেশবাবুর ওপর পুলিশী অত্যাচারের নিষ্ঠুরতার যে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক তা এইরকম—

'রাত্রিতে ঘুমোতে দিত না। দাঁড় করিয়ে রাখত। চোখে একটু ঘুমের ভাব দেখলেই সঙিনের খোঁচা দিয়ে রক্তপাত ঘটাতো। একদিন যোগেশবাবু দাঁড়ানো অবস্থাতেই ঘুমিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তথনই মনোজ পাল ঘরে ঢুকে লাথি মেরে দাঁড় করিয়ে মারতে মারতে বলতে লাগল—বলবি না শালা, কিছুই বলবি না। শালাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবো। মা, বোনকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলো।

আর একদিনের কথা। মনোজ পাল যোগেশকে মারতে মারতে তাঁর কাপড় টেনে খুলে ফেলল। দেখল যোগেশের লেঙট পরা। মনোজ পাল আরও চটে গেল—শালারা লেঙট পরে, ব্রহ্মচর্য ঠিক রাখে, বীর্যপাত ঘটতে দেবে না, তার ফলে গায়ের জোর বেড়ে যায় এবং খুন-ডাকাতি করে। বলা শেষ করেই আবার মারতে শুরু করল। যোগেশবাবুর উপর এই অত্যাচার চলে আটদিন ধরে। ঐ ক'দিন তাঁকে ঘুমোতে দেওয়া হয়নি। স্নান তো নয়ই। সারাদিনের আহার ছিল একখানা ছোট লুচি ও একটি আলু।' এখানে শেষ নয়, যোগেশবাবুর ওপর চূড়ান্ত নির্য্যাতন শুরু হলো এইভাবে—

'বিকেলবেলা মনোজ পাল কয়েকজন মেথর ডাকিয়ে এক কমোড ভর্তি প্রস্রাব ও মল গুলে রাখল। তারপর তারই আদেশে মেথররা যোগেশকে ধরে তার মাথা ও মুখ সেই কমোডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল। দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় পুনরায় দাঁড় করানো হ'ল। একজন তার নাক টিপে ধরে রাখল যাতে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়। এমনি অবস্থায় সেই কমোডের মলমূত্র যোগেশের মাথায় মুখে ঢেলে দিয়ে, সে অবস্থাতেই একটা সেলে বন্ধ করে দিল।'

নির্য্যাতনের আর একটি বীভৎস দিক প্রতুলচন্দ্র বর্ণনা করেছেন 'কুঞ্জ ঘোষ অত্যাচার কাহিনী'তে। 'আমাদের দেশের গোয়েন্দা পুলিশ নির্য্যাতনের নানা উপায় উদ্ভাবন করেছিল। সমিতির ছেলেরা ব্রহ্মচর্য পালন করত, এও তাদের একটা আক্রোশের কারণ ছিল। ছোট ছোট ছেলেদের উলঙ্গ করে, হাত পিছনে এনে হাতকড়ি দিয়ে পুরুষাঙ্গ নিয়ে টানাটানি করা, আঘাত হানা, বীর্যপাত করাবার চেষ্টা সবই চলত। যারা ব্রহ্মচর্য পালন করত, অসদালাপ না করে সব সময় সৎকথা আলোচনা করত, তাদেরই সরকার মনে করত অপরাধী, সাংঘাতিক বিপ্লবী।' তাই এইসব বিপ্লবীদের যথাযথভাবে শায়েস্তা করবার জন্য নিত্য নতুন বীভৎস অত্যাচার চালানো হতো। বিপ্লবী লেখক প্রতুলচন্দ্র আশা প্রকাশ করেছেন—'দেশের মানুষ জানুক স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে এদেশেরই এমনি অল্পবয়সের ছেলেরা কি প্রকার নৃশংস অত্যাচার সহ্য করেও নিজের ব্রতে ভুলে যায় না। ফলে লোকের মনে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করতে শিখবে।'

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

'এ শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল'

সাহিত্যিক-রূপরীতি প্রকরণ

ইতিপূর্বে ভূমিকায় এবং এযাবৎ বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা বিশেষভাবে জানিয়েছি যে, সাহিত্য শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও কারাসাহিত্য বিশুদ্ধ 'লিটারারি' সৃষ্টি নয়, কারাগার-সংশ্লিষ্ট সাহিত্য গুণান্বিত অথবা সাহিত্যগুণবর্জিত যাবতীয় গদ্যপ্রবন্ধজাতীয় রচনাই এই অভিধার অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের সাহিত্যমূল্য অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। একেবারে ন্যূন না হলেও অপ্রত্যাশিত, ক্ষণলব্ধ বা চকিতদৃষ্ট সাহিত্যসম্পদে এই জাতীয় রচনা সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-ইতিহাসিক কারণেই মূল্যবান। কারাসাহিত্য সৃষ্টির ভিত্তি তাই কোনো মৌলিক শিল্প-প্রতিভানির্ভর নয়। এজন্য পেশাদারি সাহিত্যের সপ্রস্তুত ক্ষেত্রের উপর এই সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেনি। এই সাহিত্য-চিহ্নিত গদ্যরচনার বিষয়কেন্দ্র হল আমাদের দেশের বিভিন্ন সময়ের ও স্থানের কারাব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতা। কালক্রমে এই বিষয়টি রচনাধিক্যে এত বিপুল হয়ে উঠেছে যে বিষয়সচেতন প্রবন্ধের ইতিহাসকার বর্তমানে এটিকে আর অবহেলা করতে পারেন না। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এই জাতীয় রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের সুদীর্ঘ পরাধীনতার ইতিহাসে দেশমোচনের সংকল্প ও সংগ্রামেই স্বদেশপ্রেমিক দেশবাসীর কারাবরণের সূচনা। আর সেই কারাজীবনের নির্মম অভিজ্ঞতা থেকেই কারাসাহিত্যের ক্রমবর্ধমান পুষ্টি। বস্তুত এ জাতীয় রচনার কোনো পূর্বরূপ ছিল না, কোনো প্রচলিত প্রথাগত রূপরীতির আনুরূপ্যে এই অভিজ্ঞতা লিখিত হয়নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই এই শ্রেণীর রচনাকে উদ্‌বুদ্ধ করছে বলে এই প্রকার অভিজ্ঞতাসম্পদের রূপরীতিও ব্যক্তিগত হতে বাধ্য।

তাই কারাসাহিত্যের রচনাশৈলীর প্রকরণ কখনই প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচনার মানদণ্ডে বিচার্য হতে পারে না। কারাসাহিত্যের তথাকথিত লেখক সম্প্রদায় হয়ত পেশাগতভাবে লেখক ছিলেন না কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ চেতনাশূন্য ছিলেন, এমন কথা সর্বদা বলা যায় না। আবার যে নান্দনিক চৈতন্য শিল্পীকে ক্রমাগত শিল্পজগতের কক্ষ ও কক্ষান্তরে অনুবর্তন করায় সেই সারস্বত চেতনাও এঁদের মধ্যে ছিল, একথা সাধারণভাবে সত্য নয়। এজন্য তাঁরা কারাঅভিজ্ঞতাকে কোন্ শিল্পমাধ্যমে প্রকাশ করবেন সে বিষয়ে গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী, প্রখর রাজনৈতিক চেতনা এবং বিবিধ অবর্ণনীয় অমানবিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা তাঁদের বিচলিত করেছে। এবং তার ফলে তাঁরা নিজের নিজের মর্জি ও মেজাজে

উপরোক্ত অভিজ্ঞতাকে বাণীবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্নও সীমাবদ্ধ। কারাসাহিত্যের রূপরীতি-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো গ্রন্থ লেখকের স্বাভাবিক সাহিত্য-প্রবণতার প্রভাবে পরিচিত সাহিত্য-প্রকরণের অনুকূল হয়েছে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থের শ্রেণী স্বভাব বিমিশ্র। অনেকক্ষেত্রেই গ্রন্থগুলি ব্যক্তিজীবনের একটি বিশেষ সময়কালের কারাভিজ্ঞতার স্মৃতিচিত্রণ। তথাপি গ্রন্থগুলিকে এক কথায় আত্মজীবনী বা জীবনস্মৃতি বলা যায় না। তবে কারা-অভিজ্ঞতাই যেহেতু আলোচ্য গ্রন্থগুলির কেন্দ্রীয় ভিত্তি, তাই কারাসাহিত্যের রচনা রীতিগত শ্রেণীবিভাগের পর্যালোচনায় উক্ত কেন্দ্রীয় ভিত্তির উপরই আমরা নির্ভরশীল হতে বাধ্য। আমরা প্রচলিত কারাসাহিত্যের রূপ-রীতিগত একটি সম্ভাব্য শ্রেণীবিন্যাস এখানে প্রস্তাবাকারে পেশ করছি—

কারাসাহিত্যের রচনারীতিগত শ্রেণীভেদ

১. আত্মজীবনী ধর্মী
২. জীবনী ধর্মী
৩. পত্র ধর্মী
৪. উপন্যাস ধর্মী
৫. ছোটগল্প ধর্মী
৬. প্রবন্ধধর্মী
৭. অনুবাদক মূলক

১

আত্মজীবনী ধর্মী

আত্মজীবনী যে কোনো মানুষের জীবনধারার স্বলিখিত বিবৃতি। ঘটনা, তথ্য, জীবনসত্য এবং অভিজ্ঞতা আত্মজীবনীর প্রাণকেন্দ্র। আত্মজীবনী স্মৃতিনির্ভর, তবে, নানাকারণে আত্মপরিচয়ের সত্যনিষ্ঠা বিঘ্নিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে স্মৃতির সংরক্ষণ শক্তি সক্রিয় থাকলেও আত্মজীবনীকার অনভিপ্রেত সংবাদগুলিকে গোপন করতে পারেন অথবা সম্পূর্ণ জীবনের সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য

কোনো প্রাক্তন ঘটনার স্বেচ্ছাকৃত ব্যাখ্যা দান করতে পারেন। সত্যনিষ্ঠ অকপট' আত্মবিবৃতি সামাজিক মর্যাদার অন্তরায় হতে পারে, এই আশঙ্কায় আত্মবিবৃতিকার কিছু তথ্য অপ্রকাশ্য রাখতে পারেন। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আত্মজীবনী কল্প-কাহিনী নয়। আত্মজীবনীতে প্রামাণ্য ঘটনার নানা গ্রহণ-বর্জন ও বর্ণলেপন সত্ত্বেও একটি গ্রহণীয় সারাংশ জীবন্ত থাকে। আত্মজীবনীধর্মী কারা-সাহিত্যে লেখকের রাজনৈতিক এবং কারা-জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রাধান্য লাভ করে।

সুতরাং আত্মজীবনীধর্মী কারাসাহিত্য লেখকের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের বিবরণ। এই জাতীয় গ্রন্থে অবশ্য আত্মজীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপটি পাই না। এ জাতীয় গ্রন্থের লেখক কখনও স্মৃতির পুঞ্জিত তালিকা উপস্থাপিত করেন কখনও সন-তারিখের ক্রমিক ধারা অনুসরণ না করেও কারাঅভিজ্ঞতাকে অনেকটা ডায়েরির মতো পেশ করে থাকেন। কোনা কোনো ক্ষেত্রে যুগ-ইতিহাস লেখকের আত্মস্মৃতির উপর অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করায় তিনি কারাকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

আত্মস্মৃতিমূলক কারাসাহিত্যে আমরা দেখতে পাই—কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারাজীবনের তুলনায় ব্যক্তির অন্তর্জগতের সংবাদই অধিক।

শ্রীঅরবিন্দের 'কারাকাহিনী'[১] (১৯২) এই ধারার নিদর্শন। কারাজীবনের বিক্ষত গ্লানি এবং দমন-পীড়নের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃহত্তর দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসায় উপনীত হয়েছেন লেখক। এ গ্রন্থ লেখনশৈলীতে যেমন পরিণত, মননেও তেমনি সমৃদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আলোচ্য কারাকাহিনীতে চিন্তাস্রোত এবং রূপ-রীতির সার্থক সম্মেলন ঘটিয়েছেন। নির্জন কারাকক্ষে 'প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল।' কারাকক্ষের নির্জনতাই লেখককে অনুভবের এক উন্নতলোকে উন্নীত করেছে, কারাবাস এখানে উপলক্ষ হয়ে গেছে। একদিকে জেলের বস্তুগ্রাহ্য দৃশ্যজগৎ, অন্যদিকে অদৃশ্য সুদূর—লেখক এই দুই জগতের সঙ্গে সন্ধি ঘটিয়েছেন সাবলীল বাক্যবন্ধে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্লেষ-সিঞ্চিত অলংকরণে—

'একটি বাটী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্বস্বস্বরূপ থালা বাটীর এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জলতার মধ্যে 'স্বর্গজগতে' নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম।' লক্ষণীয়

যে কারাকক্ষের থালা ও বাটীর চিত্রটিকে যখন তিনি বৃটিশ রাজতন্ত্রের উপমা বলেন তখন বাচনভঙ্গী তাঁর সরস অথচ ব্যঙ্গাত্মক, মার্জিত অথচ দীপ্ত। আবার তিনিই অবরুদ্ধ নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন হয়ে ওঠেন—

'শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম।'

বারীন্দ্র কুমার ঘোষের 'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী'[২] (১৯২২) ঠিক আত্মজীবনী নয়, আত্মকাহিনী। শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা স্বাধীনতা-সংগ্রামী বারীন্দ্র কুমার তাঁর কাহিনীর কাঠামো নির্মাণ করেছেন বিপ্লবী জীবন ও কারাভিজ্ঞতা থেকে। সে কাহিনীতে রোমাঞ্চ আছে, উত্তেজনা আছে, ঘটনার ঘনঘটা আছে। আবার সেইসঙ্গে একটি চিন্তাশীলতাও আছে। একশো পনেরো পাতার গ্রন্থটিতে সংখ্যার ভিত্তিতে পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের একটি বিশিষ্ট শিরোনাম সমগ্র গ্রন্থটির চালচিত্র তৈরি করেছে। লেখক রাজনৈতিক কালসীমার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও মূলত তিনি আত্মকথক। প্রতিটি পরিচ্ছেদে তাঁর অন্তর্জগৎ উপস্থিত। ঘটনাবহুল জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়গুলিকে তিনি কখনই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য সমকালের সমালোচনা এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করা। গ্রন্থটির প্রকাশকাল লেখকের কারাপ্রবেশের তের বছর পর। এজন্য স্মৃতির ময়নাতদন্তের সুযোগ এখানে নেই। অন্যদিকে যাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আধ্যাত্মিক সাধন ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে আত্মাকাহিনী একক বিবৃতির মতো শোনায়। যুগপরিবেশের সংবাদ গ্রন্থে থাকলেও শেষ পর্যন্ত লেখক একাধারে সন্ত ও সাংবাদিক হয়ে উঠেছেন। বারীন্দ্রের বাক্য গঠন এবং আত্মকথনে কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করলে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হবে—

'ভগবানের পথ বড় সহজ; দুর্লভ হইয়াও, কঠিন হইয়াও, ক্ষুরের ধারের অধিক সুতীক্ষ্ণ হইয়াও বুঝি সহজ। মানুষ কিন্তু সহস্র বাসনার ফেরে, সে সহজ পথকে দীর্ঘ ও জটিল করিয়া রাখিয়াছে।'

'বঙ্গের এত দিনের রাজনীতিক দুলাল, অসপত্ন্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ কখনও লোকমতের কাছে মাথা নীচু করিতে শিখেন নাই, তামস অন্ধজগতের তিনি ছিলেন রাখালরাজ, এতদিন লাঠি হাতেই গরু চরাইয়াছেন।'

'ভারতে দুর্ভিক্ষের মড়ক তো লাগিয়াই আছে, না খাইতে পাইয়া ভবিষ্যতে চিঁ-চিঁ করা কিছু মাত্রই আশ্চর্য্য নয়।'

'ভাগ্যে ইংরাজের গুঁতাটা গাঁতাটা ছিল আর বাঙ্গালীর কীর্তনে নাচা ভাবুক প্রাণ ও হৃদয়টা ছিল, নহিলে এ দেশের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা বলা দুষ্কর।'

'আমরা সেই জীবন্ত মার্বেল ষ্ট্যাচু বার্লি সাহেবের কোর্টে নিজ নিজ কৃত পাপের নিরীখ দিতে চলিলাম।'

ভাষাশৈলী ও বাক্‌রীতি গম্ভীরও খরস্রোতা, সরস ও অনর্গল। স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক গদ্য গ্রন্থগুলির মতো তৎসম ও দেশী শব্দের সহাবস্থায় বাক্যধর্মে তীব্র গতি ও ওজস্বিতা লক্ষণীয়।

উল্লাসকর দত্তের 'আমার কারাজীবনী'র[৩] (১৯২৩) ভূমিকায় নরেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—'স্বীয়-স্বভাব-সুলভ সরলতা, অনাবিল হাস্যকৌতুক ও মর্মস্পর্শী রাগ-রাগিনীতে ফৌজদারী আদালতের কঠোরতা ও নির্মমতা সাময়িকভাবে বিদূরিত করিয়াছিল।'

কিন্তু উল্লাসকর গ্রন্থের নির্মাণকৌশলে নরেশবাবুর মতো সরস নন। ভাব ও ভাষা অস্থির। দিবাস্বপ্নের বিভিন্ন চিত্র রচনাভঙ্গীকেও উন্মত্ত করেছে। অভিজ্ঞতার ধারাভাষ্যের সংযম এবং মিতাচারের অভাব লক্ষণীয়—'হঠাৎ আমার কুঠুরির সম্মুখ দিয়া একটি উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে একেবারে সোজা সরল রেখায় চলিয়া গেল।' অথবা

'অতিলৌকিক বিক্ষেপ দ্বারাও আমাদিকের লৌকিকের জ্ঞান পরিস্ফুট ও পরিমার্জিত হয়।'

বিধুভূষণ বসুর 'পুরানো জেলের কথা' (১৯৫০) এবং 'স্মৃতিকথা'[৪] (১৯৫৯) পাঠ করলে প্রথমে মনে হবে এটি কি কোন সত্যভাষণ না কোন রাজনীতিকের আত্মকথা। তিনি আত্মজীবনীকারের মতো ব্যক্তিগত জীবনের কথা যেমন বলেছেন তেমনি সমকালীন যুগের কথাও ব্যক্ত করেছেন। তাঁর স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গদ্য একটি মানুষের বিপ্লবী জীবনের দীপ্তি ও সুষমাকে প্রোজ্জ্বল করে। আসলকথা তিনি আগে সাহিত্যিক, পরে বিপ্লবী। তিনি যে সাহিত্যিক একথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কেবল উল্লেখমাত্র হলেও রবীন্দ্র স্নেহে তিনি ধন্য। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম গল্প লিখে কারাবরণ করেন; [১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'শিকার' গল্প]।

'পুরানো জেলের কথা'—মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত, এটি একটি কাহিনী। কিছু গল্পরস, কিছু বস্তুরস এবং সর্বোপরি স্মৃতিরস—এই ছোট

কাহিনীর ভূমিকেন্দ্র, তুলনায় অনুপস্থিত ইতিহাসরস। বাক্‌রীতি মার্জিত, মৃদু এবং ভাষার রং রক্তাক্ত নয়।

কথনভঙ্গী মন নির্ভর। অথচ নির্লিপ্তি তাঁর অভিজ্ঞতাকে সুবাচনিক করেছে। আলোচনা দীর্ঘ না করে কিছু নমুনা দেওয়া যাক—

'খোঁড়া কিরণ দেওকীনন্দনের গোঁফের বাহার দেখে একদিন বলে গোঁফরাজ। দেওকীনন্দন রেগে আগুন। হারামজাদ বলে গালি দিয়ে উঠলো।'

'জেলার ছিলেন লোকনাথ তেওয়ারী। কালো বেঁটে ছোট লোকটি মাথায় একটা টুপি। নিরাপদ নাম রাখিল কালীর বোতল। নিরাপদ একদিন সেলাম জানালো, 'সেলাম ভাই কালীর বোতল।' (জেলার) আমার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসিল—'What do you mean by কালীর বোতল' আমি ইন্দিরা বই-এর কালীর বোতলের গল্পটা বুঝাইয়া দিলাম।'

আসল কথা 'পুরানো জেলের কথা'য় সাহিত্যবোধের সার্থক বিমিশ্রণ ঘটেছে। এখানে কারাঅভিজ্ঞতা এবং শৈল্পিক পরিমিতি একটি সংস্পৃরক দেহ লাভ করেছে। অভিজ্ঞতার রসে জারিত পরিণত শিল্পীমন জেল জীবনের বর্ণনাতে বিচ্ছিন্ন কাহিনীচিত্রগুলিকে তথ্যচিত্রের মতো ধারাবাহিক করেছে।

'স্মৃতিকথা' জেল জীবনের স্মৃতিকথা নয়। বিধুভূষণের সমগ্র জীবনের মধ্যে জেলজীবনের কথা এখানে বিচ্ছিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। মূলতঃ গ্রন্থটি তাঁর সাহিত্য-জীবনের উপলব্ধি বা অনুভব। অনুভবের গভন মননের গভীরতা নিয়ে প্রকাশিত না হলেও পুস্তিকাটিতে দর্শনচিন্তা উপস্থিত। সাহিত্য জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভব পুস্তকটিকে আত্মমুখী ভাবচিন্তায় সমৃদ্ধ করেছে।

দুটি গ্রন্থেই ভাষা ব্যবহারে সাধু গদ্য রীতির সঙ্গে সাবলীল চলিত গদ্যরীতি প্রাধান্য পেয়েছে। 'জিজ্ঞাসিল, 'জিজ্ঞাসেন' জাতীয় কাব্য ব্যবহার্য ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি ছড়ার ঢঙে মাঝে মাঝে বাক্য গঠন করে 'গদ্যের স্বাদ বদলে দেন—'গমপিষি, দড়ি পাকাই, সেল বন্দী, খাট্টা খাই।' বাক্যে তৎসম শব্দ বহুল যৌগিক ও জটিল পদবিন্যাস নেই—

'রেলে চড়ে কলিকাতায় এলাম। সঞ্জীবনী অফিসেই এসে উঠলাম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আমায় দেখে খুব খুশী।' অভিজ্ঞতার কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব হলেও—স্মৃতিকথার প্রকাশকাল ১৯৫৯ এবং পুরানো জেলের কথার প্রকাশকাল ১৯৫০। অন্যদিকে 'মহাপুরুষগুলি আসলে ছদ্মবেশী দেবতা'। পায়ের ধুলা

নিতে আমি কেঁপে পড়ে যাই'—এ জাতীয় বাক্যবন্ধে 'কেঁপে পড়ে যাই'— মধ্যবিত্ত গ্রাম বাংলার বহমান ঘরোয়া গদ্য উঁকি দিয়েছে। ভাষায় নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও ঔজ্জ্বল্য অনুপস্থিত।

কোনো কোনো আত্মস্মৃতিমূলক কারাসাহিত্য অপেক্ষাকৃত বস্তুনির্ভর। কারাজীবনের ছোটোখাটো বস্তুগ্রাহ্য সংবাদ, কারাগারের নিখুঁত বর্ণনা, বস্তুনির্ভর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বর্ণনাশক্তি এই জাতীয় গ্রন্থগুলিকে কারাসংবাদে পরিণত করেছে। ফলে আত্মকথার অন্তর্মুখীনতা তুলনামূলকভাবে কম।

যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'আমাদের হাজত'[৫] (১৯২৭) এই ধরণের একটি বস্তুমুখী কারাস্মৃতি। গ্রন্থটির রচনারীতি বর্ণনাধর্মী। জেল প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যকালের বিস্তৃত ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন লেখক। কারাজীবনের সমগ্র অধ্যায়টি তিনি বিশেষ বিশেষ শিরোনামায় বিভক্ত করে ধারাবাহিক বিবৃতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। রচনাটি ইঙ্গিতধর্মী নয়, রচনাশৈলীর অতি সরলীকরণ গ্রন্থটির পঠনে অবশ্যই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। যোগেন্দ্রনাথের ভাষা-ছাঁদ সাধু গদ্যরীতির হলেও ক্রিয়াপদের সাধুপ্রয়োগ ভিন্ন বাক্যবন্ধে অন্য অভিনবত্ব নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতি বাক্যগুলিকে শক্তিশালী করলেও তাতে ধারাবাহিক পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। যথা—

'অধিকারী আমাদের খাট নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া, কার্যান্তরে অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। আমরা চারিজন কেবল অনিমেষ-লোচনে গৃহের সৌন্দর্য সন্দর্শন করিতে লাগিলাম।'

রচনারীতি বৈচিত্র্যহীন, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার জন্য যে তীব্র মানসিক গতির প্রয়োজন তার অভাব। তিনি যা দেখেছেন গ্রন্থে তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটিতে জেলজীবনের বিস্তৃত সংবাদ থাকলেও আত্মস্মৃতির অন্যান্য উপাদান যেমন—আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমালোচনা এবং আত্মকথনের প্রবণতা প্রায় অনুপস্থিত। ফলে বর্ণনার মেজাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ সাংবাদিকের মতো, শিল্পীসুলভ নয়।

'স্বদেশীর কারাবাস'[৬] (১৯০৬) আর একটি বাস্তবধর্মী আত্মস্মৃতিমূলক কারাবিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখক সুরথকুমার বসু তাঁর কারা অভিজ্ঞতাকে সাধারণ সাধু গদ্যে ব্যক্ত করেছেন। সংবাদধর্মী ভাষায় নতুনত্ব নেই, জেল জগতের বাস্তবচরিত্র তুলে ধরার জন্য তিনি একের পর এক খুঁটিনাটি বর্ণনায় মনোযোগী হয়েছেন। রচনায় লেখকের অন্তর্জগতের অনুভূতি একেবারেই

অনুপস্থিত। ভাষার গঠন বিবৃতিপ্রধান। গ্রন্থটি কারাজগতের সংবাদে সমৃদ্ধ হলেও উপযুক্ত মণ্ডনকলার অভাবে উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে নি।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের কথা'[৭] (১৯২০) এক বিপ্লবীর দ্বীপান্তরিত জীবনের কথাচিত্র। স্মৃতিকথা এখানে উপন্যাসের আদল পেয়েছে। সংযম এবং রসিকতা প্রতিটি পরিচ্ছেদকে যেমন সৌন্দর্য দান করেছে, তেমনি বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা লেখকের মূল লক্ষ্যকে যথেষ্ট প্রাণবন্ত করেছে। গ্রন্থটির ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত, মনোরম এবং সুখপাঠ্য। লেখক কাহিনী উপস্থাপনের শৈল্পিক কৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন —

'হিল সাহেব অত দুর্দান্ত হইয়াও আমায় বড় ভালবাসিতেন, দুই হাতে তুলিয়া খোকার মত নাচাইতেন, বলিতেন 'এই মানুষ এত বড় বাক্সে কাজ করিয়াছে, তাহা তো বিশ্বাস হয় না।'

'সংসারে সুখ দুঃখ সব অবস্থার কথা, এক অবস্থায় যাহা বুকভাঙা দুঃখ অন্য অবস্থায় তাহাই স্পৃহনীয় সুখ।'

বারীন্দ্র ঘোষের মনোজগতে দ্বীপান্তরের অভিজ্ঞতা ম্লান হয়ে যায়নি। মনোজগতে সেই অভিজ্ঞতা সক্রিয় এবং সজীব, বর্ণনাতে কৃত্রিম ভাষারীতির প্রয়োজন হয়নি। এজন্য 'দ্বীপান্তরের কথা' বাক্যে, শব্দে, রসিকতায় চিত্রময় এবং শ্রুতিসুখকর করেছে। বস্তুধর্মী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং লেখকের বিভিন্ন চিত্র ও চরিত্রপ্রিয়তা গ্রন্থটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনকে শিল্পমণ্ডিত করেছে সন্দেহ নেই।

'খোয়েদাদ, গোলাম রসুল ও ব্যারী সাহেব এই ত্র্যহস্পর্শে আমরা শাশুড়ী ও রক্তচক্ষু পতিদেবতা-তাড়িত বধূর মত পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।'

'যাহাদের স্বভাব-প্রেরণা জন্মাবধি ইন্দ্রিয়পর-তন্ত্রতা ও কলুষের দিকে, তাহারা কারাজীবনের অষ্টবন্ধনের মধ্যে ও শাসনের তাড়নায় মরিয়া হইয়া ওঠে।'

'মহাবীর দীর্ঘাকার রোগা, কদাকার, দুর্বাসা মূর্তি।'

শব্দচয়ন, শব্দবিন্যাস, বিষয়-উপস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বারীন্দ্রকুমার 'দ্বীপান্তরের কথা'য় নির্বাসিত জীবনের বাস্তবসম্মত তথ্যবহুল অথচ সাহিত্যগুণাশ্রিত আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই ধরণের আর একটি গ্রন্থ মদনমোহন ভৌমিকের 'আন্দামানে দশ-বৎসর'[৮] (১৯৩০)। একটি বর্ণনাধর্মী আত্মকথাকে লেখক সরস ব্যঙ্গে বিবৃত

করতে চাইলেও 'উপযুক্ত প্রহিনীপণার অভাব' সমগ্র গ্রন্থটিকে' ক্লান্তিকর এবং দীর্ঘায়িত করেছে। বর্ণনারীতিতে অবশ্যই আন্তরিক প্রযত্ন আছে অথচ সেই প্রযত্ন রীতিটিকে পুষ্পিত করেনি। মাঝে মাঝে বর্ণনার বিস্তৃতি থেকে সরে এসে লেখক হঠাৎ মর্মপীড়ার অনুচ্ছেদ রচনা করছেন ফলে পূর্ববর্তী বর্ণনাত্মক বিষয়গুলির গতি ভঙ্গ হয়েছে।

'আমরা সকলে অনভ্যস্ত সুতরাং আমাদের খাবা তাহ' পূর্ণ হয় না এজন্ত প্রতিদিন কথা শুনা, তিরস্কার ইত্যাদি চলিল'।

'অনেক সময এমনও হয যে, ক্রমান্বয়ে এক মাস কাল অবিশ্রান্ত বর্ষাধারা ঝরিতে থাকে।'

'জেলে ছেলেপাগল অনেক লোক আছে—গোপদাড়িহীন লাবণ্যযুক্ত সুশ্রী ছেলেদিগকে দেখিলে অনেকেরই লোভ জন্মিয়া থাকে। এই লোভের বশবর্তী হইযা একের উপর ঐকান্তিক আকৃষ্ট হয়।'

'জীবন অধ্যায়নে'র[৯] (১৯৫৪?) লেখিকা কল্যাণী ভট্টাচার্য। গ্রন্থটির ভাষা আটপৌরে চলিত গদ্যরীতি 'ব্যবহা'র' মার্জিত ও স্বচ্ছন্দ। ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় কালিদাস নাগ যথার্থই বলেছেন—

'পড়তে সুরু করলে থামা যায় না। এতকাল যে মেয়েদের দেখে এসেছি তাদের সেই পরিচিত সাধারণ মূর্তির মধ্যে বিধাতা কী অসামান্য প্রাণ শক্তির সঞ্চার করলেন—কেন করলেন? আজ শুধু নত মস্তকে সেই রহস্যময় আবির্ভাবের কথাই ভাবি।'

লেখিকা মর্মস্পর্শী ভাষায় কারাজগতের নির্যাতন এবং অপমানের বিভিন্ন চিত্র যেভাবে তুলে ধরেছেন তা প্রশংসনীয়। ভাষা ব্যবহারে সহজ ও অনাড়ম্বর অথচ সাহিত্যগুণান্বিত। টুকরো টুকরো বর্ণনার সমান্তরালে লেখিকার মানসিক প্রতিক্রিয়া গ্রন্থে উপস্থিত। ধারাভাষ্যের রীতিতে স্মৃতিকথা চিত্রিত করলেও লেখিকা আবেগের সংযম রক্ষা করেছেন। আমরা কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করছি—

'খাটুনী ঘরে বসে ভোর থেকে এগারটা পর্য্যন্ত আবার বারটা থেকে চারটে পর্যন্ত তখন বড় ভারী লোহার চরকায় দড়ি পাকাতে হোত। পিঠের শিরদাঁড়াটি মাঝে মাঝে এমন ব্যথা করে উঠত; ডান হাতটি যেন ছিঁড়ে পড়ে যেত।'

'যাঁরা অনেকদিন হাসেন নি তাঁরাও সব হেসে উঠতেন. কল্পনাও রোজ একটি মজার ব্যাপার করে একঘেঁয়ে টানা জীবনের নতুনত্বের স্বাদ এনে দিত

ও চমৎকার নকল করতে পারত—কোনদিন হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে 'আল্লা হো আকবর' বলে নমাজ পড়তে লাগল।'

সুধীরচন্দ্র দে রচিত 'সাগর ঘেরা পাথরকারা'[১০] (১৯৭২) আন্দামানের কারাজীবন এবং কারাব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণচিত্র। জেল জীবনের ধারাবাহিক ঘটনা, অভিজ্ঞতা এবং চিত্র গ্রন্থটির মূল উপাদান।

স্বচ্ছন্দ চলিত গদ্যরীতি, সরল বাক্যবন্ধ, তদ্ভব এবং দেশীশব্দের সুপ্রয়োগ গ্রন্থের ভাষা-শৈলী নির্মাণ করেছে। ধারাবাহিক ফটোগ্রাফিক বর্ণনায় লেখকের অনুভব এবং সংবেদন যুক্ত হয় নি। অন্যদিকে তথ্যের বিপুল আয়োজন, এবং তার বিন্যাস বস্তুনির্ভর স্মৃতিকথার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি এক আন্দামানযাত্রীর যাত্রাকথা এবং কারাজীবনকথার চিত্রায়ণ, তাই গ্রন্থের শিরোনাম 'সাগর ঘেরা পাথর কারা।' কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে লেখকের রচনারীতি এবং রচনা-কাঠামোর পরিচয় পাব—

'মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছি। আশু বিচ্ছেদে আমাদের সবার মনই ভারাক্রান্ত। হয়ত এই চিরবিদায়। শুনেছি কালাপাণি থেকে কেউ ফিরে আসে না। স্বপ্ন ছিল, দেশের জন্য বন্দুক ধরে দলবেঁধে লড়বো, দেশকে স্বাধীন করবো, সে আশা ধূলিসাৎ হল ভেবে মনটা বিষন্নতায় ভরে গেল।'

'সেলুলার জেলে ৭টি লম্বা লম্বা ব্লক চাকার স্পোকের মত এক কেন্দ্র থেকে বেরিয়েছে। প্রত্যেকটি ব্লক তিনতলা, মাঝখানে তিনতলা টাওয়ার।'

'পোর্টব্লেয়ারে এবং সমগ্র আন্দামান দ্বীপে শীতকাল বলে কিছু নেই। দুটী মাত্র ঋতু এখানে গ্রীষ্ম এবং বর্ষা।'

কারাসাহিত্যে আর একধরণের আত্মচরিত পাওয়া যায়, যেখানে বর্ণনাভঙ্গী দিনলিপিভিত্তিক হলেও সর্বদা ব্যক্তিগত রোজনামচা হয়ে ওঠেনি। বরং প্রাত্যহিক বিবরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনাগুলিই সেখানে স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আত্মস্মৃতিধর্মী কারাসাহিত্যের প্রায় সবক্ষেত্রেই এই দিনানুদৈনিক ডায়েরিধর্মিতা অল্পবিস্তর লক্ষিত হয়। তবে সব গ্রন্থেই প্রতি দিনের বিস্তারিত ঘটনাসূচী নেই, কোথাও মুখ্য হয়ে উঠেছে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাও তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নির্বাসন কাহিনী'[১১] (১৯১১) ডায়েরিধর্মী আত্মকথা। 'নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন যে তিনি কাহিনীর রসদ সংগ্রহ করেছেন, 'অনেকাংশ আমার দৈনন্দিন লিপি হইতে'। তিনি আরও

বলেছেন, 'ইতিহাস সর্বদাই সত্যবাদী হইবে এবং 'নির্বাসন-কাহিনী' ব্যক্তি বিশেষের সাময়িক জীবনের ইতিহাসমাত্র।'

১৯০৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর থেকে ১৯১০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী লেখকের নির্বাসনকাল। এই সময়ের মধ্যে সংকলিত দিনভিত্তিক রোজনামচা অবলম্বনেই আলোচ্য গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিদিনের ঘটনাগুলির লঘু গুরু ভেদ আছে। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন গৃহীত হয়েছে, গুরুত্বহীন দিন বর্জিত হয়েছে। তিনি দিনলিপির খণ্ড কাহিনীগুলিকে সামগ্রিক আকারে উপস্থিত করার জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিনলিপির নামকরণ করেছেন। উদ্দেশ্য পাঠককে দিন-সচেতন করা, যার ফলে সম্পূর্ণ কাহিনীটির বৈচিত্র্য আস্বাদন করা সম্ভব হয়। দৈনিক ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ অবস্থায় যখন দ্বিতীয়বার স্মৃতিকথার কাঠামোয় স্থানান্তরিত হচ্ছে তখন যা ছিল নিতান্ত একটি দিনের সত্য, তা সাহিত্যের সত্য হয়ে উঠছে।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'[১২] (১৯২১) বহু পঠিত এবং বহু প্রশংসিত গ্রন্থ। ঘটনার নাটকীয় উপস্থাপনায়, কাহিনীচিত্রণে সংলাপ রীতি গ্রহণে, সরস এবং শ্লেষাত্মক লেখনভঙ্গিতে গ্রন্থটি ইতিহাস হয়েও ব্যক্তিত্বস্পর্শে উপভোগ্য। উপেন্দ্রনাথের মনোজগতটি সাহিত্যবোধে পরিপূর্ণ। এজন্য একদিকে যখন তিনি দিনলিপির ঢঙে নির্বাসিতের অন্তরটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন অন্যদিকে গল্পকথায় জীবনের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ কাহিনীকে উপন্যাস-প্রবণ করেছে। আমরা রূপ-রীতির বৈশিষ্ট্য বোঝবার পক্ষে যোগ্য কিছু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করছি—

'বাংলার সে একটা অপূর্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। লক্ষ্য পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ।'

'প্রাণভরা সহস্র আকাঙ্ক্ষা, কত কি বিচিত্র কল্পনা লইয়া যুগান্তর গড়িতে নামিয়াছিলাম—এক ভূমিকম্পে সবটাই ধূলিসাৎ হইয়া গেল।'

'আর সব চেয়ে কটমটে গন্ধ আহারের ব্যবস্থাটা।'

'স্পর্শে সিংহগর্জ্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগণস্পর্শী রক্তোর্মির উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে।'

'বিচার সংক্রান্ত সব স্মৃতিটাই প্রায় ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—শুধু মনে আছে, ইনসেপেক্টর শামসুল আলমের কথা।'

'ক্রমে জার্মানীর সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইংলণ্ডে বিজয়—উৎসব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু কই, কয়েদী ত ছাড়িল না।'

উপেন্দ্রনাথের রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বিবৃতিকালে লেখকের সাহিত্যিক হৃদয় বার বার কথা বলেছে। ফলে যা ছিল নিতান্তই কারাজীবনের ঘটনা তা পরিণত ব্যক্তিমনের প্রতিক্রিয়ায় অসাধারণ হয়ে উঠেছে। অত্যাচার, অপমান, অপ্রাপ্তি পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতায় মস্তিষ্ক অতিক্রম করে হৃদয় জগতকে প্লাবিত করেছে, আর তার ফলে অনবদ্য গদ্যভাষার ব্যবহার ঘটেছে। ডায়েরি, উপন্যাস এবং স্মৃতিকথা এই গ্রন্থে একটি টানা কাহিনীর মধ্যে একত্রিত হয়েছে।

অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'ডেটিনিউ'[১৩] (১৯৩৯) ডায়েরিধর্মী স্মৃতিকথা। কারাজীবনের ধারাবাহিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে অনেকটা ডায়েরি লেখার ছাঁদে লেখক কাহিনী বিবৃত করেছেন। জেলজীবনের বিভিন্ন চরিত্রের পর্য-বেক্ষণ এবং তা সাহিত্যসম্মত ভাবে প্রকাশ করার জন্য লেখক মার্জিত গদ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। আত্মস্মৃতি লেখার সমস্যা এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে লেখক অত্যন্ত সচেতন। প্রেসিডেন্সি জেলে বসে যখন তিনি গ্রন্থের ভূমিকা লিখছেন— তার অসাধারণ রমণীয় ভাষা লক্ষণীয়—'মনে হয়, আমাদেরও ভিতরে একটা মাকড়সা আছে, সেও জাল বোনে—স্মৃতি ও কল্পনা দিয়া।'

'মানুষের ব্যক্তিগত সীমানায় যাহা স্মৃতি, ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় তাহাই অতীত।' অর্থাৎ লেখক ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন। ব্যক্তিমন নিয়ত যা গ্রহণ করে ইতিহাস নিয়ত তাকে অতীত করে। সুতরাং স্মৃতিকথার ভাষা এক নয়। অমলেন্দু দাসগুপ্তের মননশীল গদ্য তার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য নিয়ে প্রথম শ্রেণীর ডায়েরি লেখকের মতো প্রকাশিত—

'যে-মুখ বা যে-অবস্থা বিশেষ ছবি ও রূপের প্রতীক হয়, বিশেষ ভাব বহন করে-তাহাতে অবশ্য মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বাহির পৃথিবী যে-অনায়াসে আমার মন টানিয়া লয়, যে-অবস্থার মধ্যেই থাকি না কেন সরাসরি হৃদয়ের অন্দর-মহলে যেভাবে ঢুকিয়া পড়ে।' ছবি এবং রূপকে প্রতীকী করা, স্মৃতির বিমূর্ত আবহাওয়াকে অবয়ব দেওয়া, অভিজ্ঞতাকে কারাজগতের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দায়বদ্ধ করা এই মানসিক গুণগুলি ডায়েরি লেখকের—যা অমলেন্দু দাশগুপ্তের কাহিনীর উপস্থাপনে সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট।

'৩৬ বছরের জীবন বিচিত্র ওঠানামার মধ্যে বয়ে চলেছে—সেই যুগ, সেই দিনগুলো, আর সেদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলোকে কিছুটা ভাষা দিতে চেষ্টা করব।'

বীণা দাস জীবনের বিচিত্র ওঠানামার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটিকে ভাষা দিতে চেয়েছেন তার 'শৃঙ্খল ঝংকারে'[১৪] (১৯৪৮)। তাঁর ভাষায় দেশপ্রেম এবং সমাজচিন্তার রক্তরঙ আছে। তাঁর বিচারশীল, বিশ্লেষণমুখর, নৈর্ব্যক্তিক বাক্‌রীতি বক্তৃতাধর্মী, যদিও শ্লোগানধর্মী নয়।

আত্মকথায় দীর্ঘ বিস্তৃত ঘটনাপ্রবাহের পৌনঃপুনিক দিনাঙ্ক সূচিত না হলেও দিন ও ঘটনার বহমান নির্যাস অবশ্যই উপস্থিত। পাঁচ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শেষে—

'দেখতে দেখতে একদিন এই সুখের দিন ফুরিয়ে এল। আবার আমরা জেলে ফিরে গেলাম। তবে এবার আর মেদিনীপুরে নয়। হিজলীতে মহিলা রাজবন্দিনীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে আর শান্তিকে। সুনীতিকে ঢাকায়।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শুরু হয় নতুন কালস্রোতের নিরাসক্ত বিবরণে—

'এরপর আরও বহু বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আমাদের বন্দীজীবনের স্রোতাস্বিনী বয়ে চললো। একটি একটি করে দীর্ঘ সাতটি বছর আমরা জেলের প্রাচীরের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম। সাতটি গ্রীষ্ম···সাতটি শীত···সাতটি বর্ষা··· সাতটি বসন্ত···।'

আলোচ্য গ্রন্থে বীণা দাসের সুকথিত অথচ কোমল গদ্যরীতি একটি সচেতন, ব্যগ্র, বুদ্ধিদীপ্ত আলাপচারিতায় রচনারীতির ডায়েরিধর্মকে বিকশিত করেছে। ছোট ছোট সরল গদ্য, সন্ধি ও সমাসের বাহুল্য বর্জন, একান্ত আপন কথাকে আপন ভাষায় মালা গাঁথা—এ সব আধুনিক লক্ষণ তার গদ্যে উপস্থিত—

'সবশেষে দেখা করতে এল: 'চোখের জল'। এত দেরি! অভিমানে দুঃখে মনটা ভেঙে পড়েছিল প্রায়। কিন্তু যেদিন এল সমস্ত অভিমান নিঃশেষে মুছে দিয়ে মনটাকে কানায় কানায় ভরে দিয়ে গেল। এ শুধু 'চোখের জল'ই পারে! একটু বদলায়নি ও, মনে মনে অন্তত একটুও সংসারী হয়নি। তেমনি স্নিগ্ধ আছে, তেমনি মাধুর্যে ভরা।'

পাঁচটি পর্ব নামাঙ্কে শান্তি দাস বিরচিত 'অরুণ-বহ্নি'র[১৫] (১৯৫১) কাহিনী

গঠিত। প্রতিটি পর্ব-নাম ইঙ্গিতমুখর। কারাকাহিনী চতুর্থ পর্ব 'পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা'র অন্তর্গত।

গ্রন্থপ্রসঙ্গে সরোজকুমার রায়চৌধুরী জানিয়েছেন—'ভাষা সুন্দর স্বচ্ছন্দ এবং সংবলীল' এবং রচনাশৈলী 'উপন্যাসের মতো মনোরম হয়েছে'—

'একটি কিশোরী বিপ্লবী মনের গতি ও পরিণতি চমৎকার ফুটে উঠেছে। কারাগারের লৌহকপাটের অন্তরালে বিপ্লবী বন্দী-মনের এই যে পথ চলা, এইটেই আমাকে মুগ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি। সেই মন একটি বিশেষ বন্দী মন নয়। বিপ্লবী মানস সমষ্টি।'[১৬]

এক দেশপ্রেমিকার আত্মত্যাগের রাজনৈতিক জীবনবৃত্ত কিভাবে বিভিন্ন জেল ফেরতের পর প্রেসিডেন্সি জেলে স্থান লাভ করে তার ক্রমিক সংবাদ পরিবেশনের কৌশলটি রাজনৈতিক রহস্যময়তায় ভরা। লেখিক কারাজীবনের উল্লেখ্য ঘটনাগুলিকে সাজিয়েছেন অভিজ্ঞতার ক্রমানুসারে। ভাষার স্টাইল সংরক্ত, ক্ষুরধার ও অগ্নিময়। তিনি তিরিশের দশকে কারারুদ্ধা ছিলেন। বাংলাদেশে আলোচ্য দশকটি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মত ও পথের বিতর্কে পরিপূর্ণ। লেখিকার রাজনৈতিক চেতনা আলোচ্যগ্রন্থে অধিক সক্রিয়। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চা লেখিকাকে ক্রমাগত তাড়িত করায় উপস্থাপন ভঙ্গী অনিবার্যভাবে সরল, প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট এবং ঋজু হয়ে উঠেছে। স্বদেশ ও পৃথিবীর যুগ-ইতিহাসে যার তার্কিক ইন্দ্রিয় সক্রিয় তিনিই তো রচনারীতিকে উদাত্ত গাম্ভীর্যে পূর্ণ করে তুলতে পারেন—

'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'—বিশ্বের রাজরাজেশ্বরীর কাছে এই হল চিরন্তন প্রার্থনা শিল্পিমনের।

'সমগ্র পরিবেশটা সিন্ধবাদের দৈত্যের মতই আমাদের মনের ওপর চেপে বসত, কিছুতেই সোয়াস্তি পেতাম না।'

'স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বত্যাগী সৈনিক এঁরা, রক্তবিপ্লবের ভগীরথ।'

'পাশাপাশি ব'সে অনর্গল তর্ক ক'রে চলেছি। দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আমাদের অনুসৃত পন্থা থেকে আমাদের বিচ্যুত করবার জন্যে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তা আজও অনুরণিত হচ্ছে আমার অন্তঃকরণে।'

নিকুঞ্জ সেনের 'জেলখানা কারাগার'[১৭] (১৯৫২) ডায়েরিধর্মী স্মৃতিকথা এবং নৈর্ব্যক্তিক অধ্যয়নের আর একটি দৃষ্টান্ত। কারাজীবনের ভিতরের সঙ্গে

বাইরের আকাশ ও পৃথিবীর সংযোগসেতু লেখকের আত্মজগৎ। ভূমিকায় গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

'রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদিদের মিলিত পদক্ষেপে দেউলীর যে দিনগুলি ব্যথা-বেদনায়, হাসি-উল্লাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার আংশিক চিত্র পাঠক সমাজের সামনে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছি, সে চিত্র কতটুকু সফল হইয়াছে পাঠকবর্গই সে বিচার করিবেন।'

সে উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য তিনি যে আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন তা শব্দসম্পদে এবং ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, জিজ্ঞাসু এবং ইঙ্গিততীক্ষ্ণ মণ্ডনকলায় অসাধারণ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা ঘটনা ও চরিত্রের বর্ণনাগুলি প্রসাদগুণে চিত্রময়, সতর্ক যা পাঠক মনকে বিমুগ্ধ করবে—

'জেল-গেটের সান্ত্রী হইতে সুরু করিয়া সামান্যতম জেলকর্মচারী সকলের মধ্যেই একটা অস্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য শুধু এই কথাটাই সকলকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, আর দেরি নাই, শীঘ্রই জেলের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইবে।'

'এমনি ছিল রামসিংয়ের চরিত্র। তাহার বিভিন্ন কাহিনী শুনিয়া একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, রামসিংয়ের শুধু সাহসই ছিল না, কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তাও ছিল।'

পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত 'বিপ্লবের-পথে' (৮, ১৯৫৭) গ্রন্থে 'লেখকের কথা' অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন—'সৈনিকের ডায়েরির মত স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে রেখেছিলাম।' স্বাধীনতা সংগ্রামীর অন্তর্জগৎ আসলে এক বীর যোদ্ধার ডায়েরি, তারই যথার্থ উদাহরণ 'বিপ্লবের পথে।' এই স্মৃতিকথায় রাজনৈতিক সংগ্রামের সহিষ্ণুতা ও বেদনার আভাস, এতে আছে—দেশাত্মবোধ ও মানবপ্রেমের প্রগাঢ় উপলব্ধি। অভিজ্ঞতার বর্ণনরীতি বাঙ্ময় ও জার্নালধর্মী। আত্মোপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসা ঘটনাকথনের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি যেন সত্যই কোন এক সৈনিকের অতীত স্মৃতির গহনগভীর উত্থান। লেখকের কাছে বর্তমান গ্রন্থ একটি দীর্ঘলালিত স্মৃতির মোক্ষণাগার—

'বন্দী শিবিরের আবহাওয়াকে একেবারে নিষ্করুণ মরুভূমি মনে করলে ভুল হবে। এখানে মাঝে মাঝে দু' চারটি পান্থপাদপের সন্ধানও মিলবে। ভূপতিদাকে (শ্রীভূপতি মজুমদার) এই প্রসঙ্গে স্মরণ কোরতে হয়।'

'বাংলার সেন্ট্রাল জেলগুলো বিশেষ করে মেদিনীপুর, ঢাকা ও রাজশাহী

তখন হয়ে উঠেছিল কসাইখানার নামান্তর। একবার এই জেল ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আন্দামান কেন, জাহান্নামে যাবারও আগ্রহ এবং অধীরতা সঙ্গে সঙ্গেই এসে যেতো। এ সব জায়গায় বিপ্লবী বন্দীদের ওপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হতো, তাতে নরকের বর্ণনাও ছোট হয়ে যেত। বাংলার পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের সেই হীন অত্যাচারে ও মৃত্যুর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থার কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। লাঞ্ছনায়, বর্ব্বরতার সীমাহীন বিস্তারে বিপ্লবী বন্দীদের জীবন হয়ে উঠেছিল মূল্যহীন। প্রতিটি দিন ছিল—অজানা আশঙ্কায় ভরা ; প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল জল্লাদ মুহূর্ত।'

'বিপ্লবী বন্দীদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে—ক্ষমাহীন ও নিষ্ঠুর দৃষ্টিপাতে। তাদের অত্যাচারে মথিত ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা শরীর ও মনের তন্তুগুলো যেন বিশ্রাম নিতে চায় কোথাও কোন নিভৃত আড়ালে, গভীর বনের অন্ধকারে বা শ্বাপদ সঙ্কুল রাজ্যে ক্ষণিকের বিশ্রামও উপভোগ্য। একেই আমরা 'আন্দা-মানের মন' বলতাম।'

'অনেক সময় দেওয়ালকে সামনে রেখে বলতাম—দেওয়ালই হয়ে উঠত সঙ্গী।'

'কারাস্মৃতি'র[১] লেখিকা কুন্দপ্রভা সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম বিপ্লবের অন্যতম 'অধিনেত্রী'। ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের 'আশীর্বাদ পত্রে' মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ্রন্থটির গঠনরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

'এতে কল্পনার লীলাখেলা না থাকলেও এ হয়েছে উপন্যাসের চেয়েও মনোময়। ফ্যাক্‌ট্ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশান।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজল সাহেব মন্তব্য করেছেন—

'এইটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আত্মকাহিনী। ব্যক্তিগত হলেও অন্যান্য সংগ্রামবাদীদের কথা, বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নেতা সূর্য সেনের অপূর্ব আত্মত্যাগের, তাঁর অসাধারণ সংযম, শৃঙ্খলা ও সংগঠনী শক্তির অপূর্ব পরিচয় বইখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে আরো বেশি করে। লেখিকা এতটুকু কল্পনার আশ্রয় নেন-নি—দেহ ও মনে যে দুঃসহ অভিজ্ঞতা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে, 'কারা-স্মৃতি' তারই নির্ভেজাল কাহিনী। লেখিকার রচনাগুণে এই রূঢ়-নির্ম্মম বাস্তব ঘটনাবলীও উপন্যাসের মতো আকর্ষণায় সুখপাঠ্য হয়েছে।'

উপরোক্ত দুটি মন্তব্যই যে যথার্থ তা গ্রন্থটি পাঠ করলে বোঝা যায়;। লেখিকা তাঁর আপন কথা, জেলের কথা, মাস্টারদার ফাঁসির কথা, জেলে

বিদ্রোহের কথা—কখনও স্মৃতির মোড়কে, উপন্যাসের কথনভঙ্গীতে, কখনও বা ডায়েরি লেখার আত্মগত অভ্যাসধর্মে কারাজীবনের স্মৃতিচিত্রকে রসমণ্ডিত করেছেন—

'আজ যাঁরা প্রাণ দিয়ে গেল দেশের জন্য, স্বদেশীরা তাঁদের জীবনের মূল্য বুঝল না। নির্বিচারে তাঁদের তুলে দিল শত্রুদের হাতে। যারা চিরদিন আঁধার গুহায় বাস ক'রে, তারা উদ্দীপ্ত সূর্য-কিরণে চোখ মেলবে কি ক'রে?'[২০]

'মুক্তির প্রবল বাসনায় দিকভ্রান্ত হয়ে যায়। মুক্তির জন্য বন্ধনের সাথে লড়াই চলে। মুক্তি যখন বন্ধ দ্বারের নিকট এসে হানা দেয়, তখন হু হু করে কেঁদে উঠে প্রাণ, ঐ বন্ধকারার অন্ধ টানে।'[২১]

এই পর্যায়ে আরো কিছু গ্রন্থ স্থান পেতে পারে—'স্রোতের তৃণ', 'তখন আমি জেলে', 'বিপ্লবের পথে' এই গ্রন্থগুলি।[২২] এগুলিতে আত্মস্মৃতির অভিনবত্ব নেই। আপন যুগটির কথা এঁরা কখনও বা সাধারণ সরলগদ্যে, কখন বা আবেগমথিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শিথিল অবিন্যস্ত উপস্থাপনভঙ্গী বস্তুসম্পদকে অনেক ক্ষেত্রে বস্তুদৈন্যে পরিণত করেছে।

আর একধরণের আত্মস্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ আছে যেখানে লেখক যুগ সচেতন, প্রামাণিক ঘটনানির্ভর এবং রাজনৈতিক চিন্তার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় সুশৃঙ্খল। লেখক রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় অতিচারী, কল্পনাশক্তিতে অপেক্ষাকৃত মৃদু ও নিষ্প্রভ। রাজনৈতিক চিন্তায় রচয়িতার স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত বিচরণ বাস্তব-পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে সংযমী করেছে। ইতিহাসধর্মী আত্মস্মৃতিগুলি শিল্পীর ইতিহাসচেতনার পরিপূরক নয়। যে অর্থে শুদ্ধ সাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা আলোচিত হয়, আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে ঐতিহাসিকবোধ সে অর্থে গৃহীত হয়নি, ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে ইতিহাসবোধ জাগ্রত হয়েছে। উপন্যাসে, ছোট গল্পে এবং কবিতায় এ কারণে ইতিহাস চেতনা একটি আধুনিক লক্ষণ। কিন্তু কারাসাহিত্যে লেখক সম্প্রদায় ঘটমান ইতিহাসের অংশীদার, তাঁদের গদ্যলেখায় ভূমি তৈরী করেছে একটি বিশেষ যুগ বা কালপটের ঐতিহাসিক ঘটনা। কারাসাহিত্য লেখকগণ ইতিহাসের সিংহদ্বারের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছেন। এজন্য আমরা স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে যে কাহিনীগুলিতে ঐতিহাসিক উপাদান সক্রিয় সেগুলিকে ইতিহাসধর্মী বলেছি।

আত্মস্মৃতিমূলক কারা কাহিনীগুলি কেবলমাত্র লেখকের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা এবং যুগের নিছক বিবৃতি নয়। তাঁরা যে রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে সংযুক্ত

ছিলেন অতিক্রান্ত সেই যুগটিকে নিরীক্ষণ করেছেন স্মৃতির আত্মদৃষ্টি দিয়ে। ফলে একদিকে যেমন কল্প কাহিনীর মতো বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা-গল্পরস ও চিত্ররসে ফুটিয়ে তুলেছেন অন্যদিকে একজন অদীক্ষিত অথচ প্রাজ্ঞ বিচারকের মতো অভিজ্ঞতালব্ধ যুগ বা জীবনটির বিচারও বিশ্লেষণ করেছেন। একদিকে সাহিত্যিক সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং চরিত্রসৃষ্টির ঝোঁক, অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক যুগবিশ্লেষণ।

শচীন্দ্রনাথ সান্যালের 'বন্দীজীবন'[২৩] (১৯২২) গ্রন্থে বিপ্লবের ধারাবাহিক ইতিহাস অর্থাৎ বিপ্লবের প্রস্তুতি ব্যর্থতার ইতিহাস বিভিন্ন নামে বর্ণিত হয়েছে। 'বন্দীজীবনে'র ১ম ও ২য় খণ্ডে কারাজগতের তুলনায় সমকালীন রাজনৈতিক তথ্য এবং বিশ্লেষণ বেশি লেখকের উপস্থাপন রীতি ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনায় এত প্রবল যে, স্মৃতিরোমন্থনে কারাজীবন এবং কারাজগতের কথা অত্যন্ত কম। এবং এজন্যই লেখক গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে নিঃসংশয় নন—'বন্দীজীবনের কাহিনী লিখিতে বসিয়া ভাবিয়াছিলাম, আমি কেন বন্দী হইলাম সেই কথাটিও পাঠকবর্গকে জানাইব। কিন্তু সেই কথা বাড়িতে বাড়িতে গ্রন্থের কলেবর ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং এখন ইহাকে বন্দী-জীবন না বলিয়া 'বন্দী-বিপ্লবীর জীবন স্মৃতি' অথবা 'বিপ্লবযুগের স্মৃতি' এইরূপ বলাই যুক্তিসংগত ছিল। তাহ হইলেও এখন নাম পরিবর্তন করিতে যেন কেমন একটা বাধা ঠেকে।

লেখকের যুক্তি থেকে বোঝা যায় তিনি জেলজীবন অপেক্ষা রাজনৈতিক জীবন বর্ণনায় বেশি মনোযোগী লেখকের রাজনৈতিক ভাষ্য এখানে অসহিষ্ণু এবং ক্ষারধর্মী।

'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা'র[২৪] (১৯২৮) লেখক হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর সমস্ত চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছেন বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের সমালোচনায়। ফলে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে উদ্দেশ্যধর্মী। লেখকের বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গী আত্মপক্ষ সমর্থনে এত উগ্র যে, যুক্তির সুবিন্যস্ত আকৃতি খণ্ডিত হয়েছে। স্থূল রাজনৈতিক জগৎটিকে তিনি বিদ্বেষের চোখে দেখেছেন। একটি সূক্ষ্ম, নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক এবং সাত্ত্বিক মনের অভাব গ্রন্থের পদবিন্যাস এবং বাক্‌রীতিকেও মলিন করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে ত্রিশ বছর'[২৫] (১৯৪৮) গ্রন্থটিকে রীতির দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি ভাগে লেখকের রাজনৈতিক জীবনবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত-

হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে লেখকের কারাভিজ্ঞতার কথা আছে। লেখক মোট ছ'বার কারাবরণ করে মোট তিরিশ বছর কারাবদ্ধ ছিলেন। আটপৌরে ভাষায় তিনি জেল-জগতের সংবাদ পরিবেশন করেছেন নিছক কারাবর্ণনা, বিভিন্ন জেল কর্মচারীদের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক, জেলের খুঁটিনাটি সবিস্তার বর্ণনা, খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয় প্রসঙ্গ প্রথম কারাজীবনের উপজীব্য বিষয়। বর্ণনারীতি বর্ণনাত্মক এবং বিবৃতি প্রধান—'পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা কলাই-এর ডাল পছন্দ করে কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই 'পিছ্‌লা' ডাইল বিশেষ পছন্দ করে না। অবশ্যই জেলের রান্না, বাড়ীর মতো হয় না।'

দ্বিতীয়বারের জেলদর্শনও প্রথমবারের মতো বাক্‌ভঙ্গীতে প্রকাশিত। গল্পকথকের মতো নিত্যকার অভিজ্ঞতা জার্নালধর্মী নিরলংকার গদ্যে প্রকাশিত। বক্তব্য উপস্থাপনায় কোনো মনোরম শোভন বাক্যবিন্যাসের আশ্রয় নেননি লেখক। তৃতীয় এবং অপর তিনটি কারা অভিজ্ঞতায় লেখকের রাজনৈতিক সচেতনতার তীব্রতা অন্তর্লোকের স্থিতিস্থাপক পর্দাটিকে নিষ্ক্রিয় রেখেছে। ইতিহাস কথনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি জেল-জগতের কিছু চরিত্রকে প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গীতে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। জেল-বাসের ইতিহাসে তিনি সর্বদাই প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত অথচ আত্মমুখীন কাহিনীতে যেমন নিজস্ব অনুভব, অনুরাগ, উপলব্ধি স্থান পায় সেই জাতীয় উপস্থিতি এখানে নেই। দেশহিতৈষণা এবং সমাজকল্যাণের প্রেরণা লেখকের রচনারীতিকে যেটুকু বস্তুতান্ত্রিক করেছে তার অতিরিক্ত কোনো শৈল্পিক সফলতা বর্ণনাভঙ্গীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজন সৎ ও দেশব্রতী মানুষ সাহিত্যিক দীক্ষা ব্যতীত যেভাবে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন সেটুকুই ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় দৃষ্ট হয়—

'এইখানে আমি কারা-সংস্কার (Reforms) সম্পর্কে লিখিতে আরম্ভ করিলাম তখন প্রায় চব্বিশ বৎসর আমি জেলে কাটাইয়াছি। আমি বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জেলে ছিলাম—আন্দামানেও অনেকদিন কাটাইয়াছি '

সমগ্র গ্রন্থে কারাভিজ্ঞতা উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটির প্রতিধ্বনি করে।

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' - (১৯৫৩) গ্রন্থে জেলখানা ও কারাজীবনের কথা উপলক্ষ; লক্ষ্য রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা। লেখার ভঙ্গী বর্ণনাত্মক এবং বিবৃতিধর্মী। যেসব চরিত্রের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন বর্ণনাকালে তাদের অন্তর্জগতের ছবিটি আন্তরিক করে তুলেছেন—

'আমি রাজসাহীতে গিয়ে রায় সাহেবের দর্শন পাই নাই। তার জায়গায় এসেছেন, উপেন মুখার্জী। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৪ সালে যখন পূর্ণ দাস তাঁর দলবল নিয়ে ফরিদপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী, উপেন মুখার্জী তখন সেখানকার জেলার।'

'তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর গভীর অনুভূতির অপরূপ সামঞ্জস্যে গড়া এ মানুষটি জেল জীবনে গভীর অন্তরের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থেকে অব্যাহতি পান নাই। অব্যাহতি পান নাই, শুধু তাই নয়, ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন।'

কমলা দাশগুপ্তের 'রক্তের অক্ষরে'[২৭] (১৯৫৪) একদিকে আত্মজীবনী অন্যদিকে স্মৃতিকথা। জীবনখণ্ড এবং কাল-খণ্ডকে লেখিকা অসাধারণ কৌশলে শিল্প সামগ্রীতে পরিণত করেছেন। চরিত্র সম্পদ, ভাবসম্পদ, চিত্র এবং সমাজের নিখুঁত বর্ণনায় এটি পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিচিত্র এবং আত্মকথা। তাঁর বর্ণনাভঙ্গীটি উপন্যাসের ফ্রেমে বাঁধা। কথার ধারাবাহিকতা তিনি ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ভেঙে দিয়ে সময় থেকে সময়ান্তরে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বাক্‌ভঙ্গী দ্রুত গতিময়, স্পন্দিত অথচ কোমল ও সহিষ্ণু। একদিকে উচ্ছ্বসিত দেশাত্মবোধ অন্যদিকে নিগূঢ় বেদনা—এরই মধ্যে বয়ে চলেছে অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য, স্মৃতির কুলকুলধ্বনি। লেখিকার রোমান্টিক মন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটি যুগের হৃদ্‌স্পন্দন শুনেছে।

'স্রোতহীন, আবর্তহীন 'জগত—একেবারে অপরিচিত একঘেঁয়ে। এমন কর্মহীন জীবন যে শাস্তি দেবার জন্য কোথাও সংসারে কেউ সাজিয়ে রাখতে পারে সে-কথা কে জানতো! জীবন থেকে বছরগুলি যেন কেটে বাদ দেওয়া র'য়ে গেছে। নিষ্কর্ম জীবনের দুর্বহ মুহূর্তগুলি মনের উপর, স্নায়ুর উপর ক্রমাগত পীড়া দিতে থাকে।'

'ওই সেলে বসলে ধীরে-ধীরে অতীত জীবন এসে ধরা দিতো। নিজের অতীত নিজের কাছে এমন মধুর হ'য়ে দেখা দেবে কখনো ভাবিনি। বর্ষাকালের অনুভূতি ছিলো করুণ ও মায়াময়। অঝোরে হিজলীর বর্ষা নেমেছে চোখের সামনে, মনে পড়ে যেন সেই ছোটোবেলায় আমাদের গ্রামে চ'লে গেছি।'

কমলা দেবীর শিল্পভাবা ইতিহাস, উপন্যাস এবং ডায়েরির ত্রিবেণী সঙ্গম। গ্রন্থের কেন্দ্রীয় শক্তি ইতিহাস রস।

বিপ্লবী গণেশ ঘোষের 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান'[২৮] (১৯৭৭) সেলুলার জেলের বিস্তৃত বিবরণ এবং ইতিহাসসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হবে

একজন বিপ্লবী একটি ব্রাত্য জগতের ইতিহাস লিখছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক ভারতীয় জনগনের মুক্তি সংগ্রামে আতঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে যে বর্বর অমানবিক এবং নিষ্ঠুর প্রতিশোধস্পৃহায় মেতে উঠেছিল তারই বাস্তব উদাহরণ কুখ্যাত সেলুলার জেল। সেই কুখ্যাত জেলটির বর্ণনার ভাষা শাণিত, বিদ্যুৎতীক্ষ্ণ এবং আক্রমণাত্মক। লেখকের ওজস্বিভাষা আন্দামানের ভয়ংকর নিষ্ঠুরতাকে মুক্তি-তীর্থে পরিণত করেছে। কেননা গণেশবাবু জানেন সাম্রাজ্যবাদীর কাছে যা নৃশংস অত্যাচারের বধ্যভূমি দেশপ্রেমিকের কাছে তাই-ই মুক্তি-অন্বেষণের তীর্থভূমি। এই দুটি ভূমি জগতের কথা লেখক সমান্তরালে বর্ণনা করেছেন। লেখকের রচনারীতির দুটি দিক লক্ষণীয়। একদিকে ঘটনা ও চরিত্রের বিস্তৃত বিবরণ ফটোগ্রাফির মতো তুলে ধরা, অন্যদিকে ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি শোভন সংযত বাক্‌রীতির অনুসৃতি।

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ীর 'বিপ্লবীর জীবন' (১৯৫৪) আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ। এখানে ডায়েরীগুন এবং ইতিহাসবোধ দুই-ই বর্তমান।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবের সন্ধানে' (১৯৬০) গ্রন্থে লেখকের নৈতিকতা এবং চেতনা নিয়মানুগ অঙ্গসজ্জার অভাবে খণ্ডিত। যুক্তিনিষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। ভারসাম্যহীনতা এবং অসংযম আঙ্গিক-কৌশলকে দুর্বল করেছে।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর 'বিপ্লবীর জীবনদর্শন' (১৯৭৬) গ্রন্থে বাক্‌সংযম এবং ভাবসংযমের অভাব লক্ষণীয়। তত্ত্ব ও তথ্যের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য সত্ত্বেও শিথিল অবিন্যস্ত অকর্ষিত গদ্যরীতি কাহিনী উপস্থাপনা এবং বিবৃতিকে অস্পষ্ট করেছে।

জীবনীধর্মী কারাসাহিত্য

যে সমস্ত দেশনায়ক বীর দেশব্রতী আত্মত্যাগী হয়ে কারাবরণ করেছিলেন অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁদের জীবনধারা যে সব গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে সেগুলিকেই আমরা জীবনীমূলক কারা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

চরিত্রগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সেই কেন্দ্রচরিত্রটির দার্শনিক, সামাজিক, কিম্বা শৈল্পিক গুণাগুণের বিস্তৃতি ও গভীরতা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার, আগেই তাঁদের জীবনাবসান ঘটেছে। দেশপ্রেম ছাড়া হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ব্যক্তিত্বের অনুরূপ বিকাশ লাভ করেনি জীবনকালের সীমাবদ্ধতার জন্য।

চরিত-রচয়িতাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সাহিত্য রচনার অধিকার সীমাবদ্ধ। সাহিত্যরসে মুখ্যত অদীক্ষিত কিছু শিক্ষিত ও উৎসর্গিত মানুষ এই জাতীয় জীবনীরচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। জীবনী লেখকগণ রচনারীতির কোনো শৈল্পিক সতর্কতার আবশ্যিকতা প্রয়োজন মনে করেন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যের তালিকা গ্রন্থটিকে কোনো এক মানুষের জীবনপঞ্জী করে তুলেছে। ফলে সাহিত্যরসহীন তথ্য পাঠ পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর এবং বিরক্তিজনক হতে পারে। মনে হতে পারে গ্রন্থগুলি অসম্পাদিত এবং কিছু অবিন্যস্ত তথ্যের সংকলন। কিন্তু যেহেতু এগুলি কোনো এক দেশপ্রেমিকের জীবনচরিত সেজন্য রচনারীতির সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও ভাষায় রক্ত, অশ্রু এবং অঙ্গীকারের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে।

মণীন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'কাকোরী ষড়যন্ত্র', ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ', পদ্মনাভের 'বিপ্লবের সপ্তশিখা', মতিলাল রায়ের 'বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল', হীরালাল দাসগুপ্তের 'জননায়ক অশ্বিনীকুমার', ও বিশ্ব বিশ্বাসের 'বিপ্লবী সূর্যসেন' এই পর্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই সূত্রে একটি বিদেশী কারাবন্দীর জীবনের ইতিহাসও স্মরণ করা যায়।

'নেপোলিয়নের কারাবাস' প্রবন্ধে ফরাসীদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রথম কনসাল্ ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নের সেণ্ট হেলেনাদ্বীপে নির্বাসিত জীবনের অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। লেখকের রচনারীতিতে ইতিহাস ও সাহিত্য সমদক্ষতায় বর্ণিত। তিনি ভাবাবেগে ঐতিহাসিক ঘটনার অতিরিক্ত কোনো কাহিনী সংযুক্ত করেননি। রচনায় সংযম এবং উপাদানের সম্পাদনা লক্ষণীয়। লেখকের লক্ষ্য কেবল তথ্যের সংগ্রহ নয়, তথ্যকে শৈল্পিককৌশলে সাহিত্যপদবাচ্য করে তোলা—'স্থির, ধীর, নীরব, বিষণ্ণভাবে নেপোলিয়ন সেই শূন্য—গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একখানি লৌহের খাট তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। এখানি তিনি যুদ্ধকালে শিবিরে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার অনুচরেরা সেইখানি পাতিয়া শয্যা রচনা করিয়া দিলে, নেপোলিয়ন তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, দীপ নির্ব্বাণ করিয়া, এরূপ অবস্থায় যতটুকু বিশ্রাম লাভ করা সম্ভব, তাহা,

পাইবার জন্য শয়ন করিলেন। কারাবাসের প্রথম নিশা এইরূপে অতিবাহিত হইল।'

'ব্রিটানিয়া! ব্রিটানিয়া! তুমি মহাসাগরের অধীশ্বরী। কিন্তু এই মহাপুরুষের জন্য তুমি যে কলঙ্ক রাশি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা প্রক্ষালন করিতে পারে, এত বারি মহাসাগরেও নাই।'

মণীন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'কাকোরী ষড়যন্ত্র' (১৯২৮)'[৩০] 'নেপোলিয়নের কারাবাসে'র মতনই ইতিহাসের খণ্ডাংশ কেন্দ্রিক জীবনী সাহিত্য। লেখক ব্যক্তিপন্থী রচনারীতি গ্রহণ করেছেন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত আসামীদের কেন্দ্রে তিনি যেন উপস্থিত হয়ে কথা বলেছেন। রচনারীতিতে ঐতিহাসিকের নির্লিপ্ততা নেই বরং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অশ্রুজলকে তিনি যেন আপন অশ্রুজলে পরিণত করেছেন—

'আমি ভারত স্বাধীন করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে কিন্তু মানুষের রক্তে আমার হাত কলঙ্কিত হয় নাই। তারপর জল্লাদ ফাঁসীর দড়ি পরাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবিনশ্বর আত্মা নশ্বর দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অমর ধামে প্রস্থান করিল।'

তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, জীবনকে প্রাঞ্জল ও জীবন্ত করার জন্য বিপ্লবীদের পত্রাবলীকে ইতিহাসের জীবনী উপাদান হিসাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। অসাধারণ এই চিঠিগুলি এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। আমরা রাজেন্দ্রলাল লাহিড়ীর একটি চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরছি—

'মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র। জীর্ণবস্ত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিবার মতই আত্মা পুরাতন দেহ পরিবর্তন করিয়া নূতন দেহ আশ্রয় করে। মৃত্যু আগত প্রায়, আমি প্রশান্ত চিত্তে ও হাসিমুখেই তাহাকে আলিঙ্গন করিব।'

আজাদ হিন্দ গ্রন্থমালার নবম গ্রন্থ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ'[৩১] (১৯৪৭)। যতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের একটি পর্যায় কারাবাস, আলোচ্য গ্রন্থে যা 'বৈপ্লবিক সংগ্রাম' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ। ভঙ্গী বর্ণনাত্মক। ভাষা সাধুগদ্য। রচনারীতিতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বর্তমান। তবে যে লিপিকুশলতা ইতিহাসকে জীবনীসাহিত্যে পরিণত করে তার অভাব আছে। অবশ্য পরিণতি অধ্যায়ের কিছু মন্তব্যে গভীরতা আছে। যথা—

'ইতিহাস কোথাও আসিয়া বসিয়া থাকে না—সে অগ্রসর হইয়াই চলে। একদিন যে পথকে একান্ত ও সুনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়, পরের দিন সে পথ

পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—পায়ের নীচে নূতন পথ দেখা দেয়। পিছনে পড়িয়া থাকা পদচিহ্নগুলিকে তবু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা ধরিয়া রাখি—ভবিষ্যতের পথের ইঙ্গিতের জন্য, নিজেদের চিত্তে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য। যতীন্দ্রনাথ তেমনি একটি পশ্চাতের পদচিহ্ন। সেই পদচিহ্নের পাশে পাশে আগে ও পরে অনেকের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। সকলের পদবিক্ষেপে একটি পথ একদা রচিত হইয়াছিল। সে পথও আমাদের পিছনে পড়িয়া রহিল আমরা আজ নূতন পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি।'

মতিলাল রায়ের 'বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল'[৩২] (১৯২৩) বস্তুধর্মী জীবন-কথা। লেখায় স্মৃতিচারণের লক্ষণ স্পষ্ট। কানাইলালের কারাবাস ও ফাঁসি—এই দুটি জগৎকে লেখক বিপ্লবী যুগের একজন হয়ে স্মৃতিচারণের মত আত্যন্তিক বেদনাসিক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ভাষা মোটামুটি সংহত ও ধ্রুপদী রীতির। যথা—

'নরেন্দ্রনাথ আত্মরক্ষার্থে, তাহার সমস্ত সহচরদিগের সর্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেখানে দাঁড়াইবার অবসর পাইলে পাছে সে আরও ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়, সেইজন্য তৎপূর্বে তাহারা উহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিল। এ স্থলে একের নিপাতে বহু লোকে উদ্ধারসাধন। উহারা সহচরদিগের মঙ্গলার্থেই নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করিয়া অকুতোভয়ে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। যদিও ইহা হত্যা, কিন্তু কখনই হীন কাপুরুষোচিত কর্ম্ম নহে। আত্মত্যাগের গৌরবালোকে ইহা সমুজ্জ্বল।'

অথবা

'রক্তস্নাত হাস্যময় কানাইয়ের উন্নত ললাটে স্বদেশ জননী স্বহস্তে জয়টীকা পরাইয়াদিলেন'।

পদ্মনাভের 'বিপ্লবের সপ্তশিখায়'[৩৩] (১৯৪৭) সাতজন শহীদের জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই ইতিহাসের একটি অঙ্গ বিপ্লবীদের কারাবাস। গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কার বর্জিত এবং তালিকাধর্মী। গদ্য রচনার উপস্থাপনে কোনো নান্দনিক রীতিচাতুর্যের প্রয়োজনীয়তা লেখক অনুভব করেন নি।

হীরালাল দাশগুপ্তের 'জননায়ক অশ্বিনীকুমার'[৩৪] (১৯৬৯) ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে দেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনচরিত। গ্রন্থটির ৬৯-৭৭ পৃষ্ঠায় অশ্বিনীকুমারের জেলজীবনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনায় রীতি সংলাপধর্মী, ঘরোয়া ব্যক্যালাপের মতন।

'ছোটলাট হিউয়েট্ এসেছিলেন আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ নিতে। ছত্র, চামর, উপাধি সবই তো হল। বাকী রইল দণ্ড। কেন, নির্বাসনই তো আমার রাজদণ্ড।'[৩৫]

'অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে ভাগবৎ ছাড়া আর ছিল তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্তমাল গ্রন্থ। ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করে তাঁর অন্তর ডুবেছিল ভক্তিরসে।'[৩৬]

বিশ্ব বিশ্বাসের 'বিপ্লবী সূর্য সেন'[৩৭] (১৯৭২) গ্রন্থটি 'জননায়ক অশ্বিনীকুমার' এর মতনই সহজপাঠ্য। গ্রন্থটির উনিশ এবং কুড়ি অধ্যায় দুটিতে কারাজীবনের ইতিহাসও বর্ণিত। চট্টগ্রামের বীরবিপ্লবী সূর্য সেনের কারাবাসের চিত্র অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত। এই রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য সহজ প্রত্যক্ষতা। এই গুণটুকুই আলোচ্য গ্রন্থের অলংকার—

'কারাগারে সূর্য সেন। ফাঁসীর আসামীর সেলে বন্দী। একা—কর্মহীন। জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেয়েছেন তিনি একখানা রামায়ণ। সেইখানা তিনি দিনরাত পড়তেন।'[৩৮] কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসাধারণ কাব্যভাষায় লেখকের রসবাদী মন আত্মপ্রকাশ করেছে।

লেখক বিশ্ব বিশ্বাস প্রবাদবাক্যের মতো শব্দশৈলীর চমৎকার বিন্যাস কৌশল বোঝেন—'বিপ্লব বাতাসের মত। বাতাস যেমন থামে না, বিপ্লবেরও তেমন, শেষ নেই।'[৩৯]

৩

পত্রধর্মী কারাসাহিত্য

তথাকথিত কারাসাহিত্যের পর্যালোচনায় আমরা অনেকগুলি পত্রজাতীয় রচনার সঙ্গে পরিচিত হই। বস্তুত কারাসাহিত্যে পত্রধর্মী রচনাই সর্বাগ্রগণ্য। কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত নাগরিক যখন সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ নির্জন বন্দীজীবনে প্রবেশ করেন তখন স্বভাবতই বাইরের সামাজিক, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের সহস্র বন্ধনস্মৃতি তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। কারাবাসী মানুষটির মধ্যে হয়ত কোনোকালেই সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা ছিল না, প্রতিভাও ছিল না। কিন্তু কারাগারের এই নিঃসঙ্গতা এবং নতুন একটি

অগোচর অজানিতপূর্ব জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁকে আত্মপ্রকাশের জন্য উত্তেজিত করে তোলে। প্রিয়পরিজনের কাছে তখনই তিনি পত্রাকারে তাঁর নতুন জগৎ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের সংবাদ সরবরাহ করতে বসেন। সময়ের কোনো অভাব তাঁর নেই, এখন ধীরেসুস্থে গুছিয়ে বলার যথেষ্ট অবসর। তাই দ্রুততাবশত লেখা দৈনন্দিন প্রয়োজনের চিঠির তুলনায় এইসব চিঠি একটি দীর্ঘ সংবাদবহনমূলক নতুন পত্রের স্বরূপ নিয়ে বেড়ে ওঠে। এমনি করেই জুলিয়াস ফুচিক তাঁর কারাবাসের অন্ধকার থেকে অমর সাহিত্য সৃষ্টি করেন পত্রাকারে, এমনি করেই জওহরলাল নেহরুর চিঠিগুলি তাঁর কন্যাকে লেখা হলেও সাহিত্যের কোঠায় উন্নীত হয়েছিল। এই কারণেই কারাপত্র সচেষ্ট সচেতন সাহিত্যিক প্রবণতার সৃষ্টি নয়। পত্ররচনার আগ্রহ থেকেই এদের জন্ম। এজন্য চিঠিগুলি জীবন্ত ও স্পষ্ট। এগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিন্তার ভাণ্ডার।

আমাদের আলোচিত চিঠিগুলি ব্যক্তিগত। অবশ্যই ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক জীবনের নীরস তথ্য নয়, কিছু নির্বাসিত মানুষ যাঁরা কারাবরণ করে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই যাঁদের সামাজিক জীবনের অবসান ঘটেছে তাঁদেরই রাজনৈতিক এবং দার্শনিক জবানবন্দী চিঠিগুলির মুখ্যবিষয়। বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্ত যে অতীত হয়ে যাচ্ছে তার জন্যই এই করুণ-বিষণ্ণ চিন্তার বিষাদসংগীত; স্মৃতি ও অনুভূতি দিয়ে জীবনের বিদায় মুহূর্তে পত্রকাব্যে যেন এক একটি শ্লোক সংযোজন। চিঠিগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তা-তরঙ্গের চয়নিকা। এক মহতী আত্মবিনষ্টির উপক্রমণিকা। অতীত যেখানে অবসিত আর ভবিষ্যৎ বলতে কেবলমাত্র আগামীকালের কয়েকটি দিন। ভবিষ্যৎ নিশ্চিত জেনে অনিশ্চয়তায় ভরা—এই মানসিক বিষণ্ণতা থেকে যে চিঠি লেখা হয় তা শুধু চিঠি নয়—যন্ত্রণার কাব্য।

কারাসাহিত্যের এই নতুন রূপরীতির আলোচনায় আমরা 'ধূমকেতু'র কবি নজরুল ইসলাম, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, মহান বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্রকিশোর রায়, জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার, আশরফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, প্রবোধ চন্দ্র মজুমদার, অমর শহীদ দীনেশ গুপ্তের কিছু কিছু নির্বাচিত চিঠি গ্রহণ করেছি।

নজরুল ইস্লামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'[৪০] (১৯২৩) ঠিক ব্যক্তিগত চিঠি নয়। দণ্ডিত কবি ১৯২৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী কোলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সী

ম্যাজিস্ট্রেট সুইন-হো'র এজলাসে একটি দীর্ঘ জবানবন্দী দেন। সেটি সাহিত্যের অমর সম্পদ হয়ে আছে। জবানবন্দী একধরণের খোলা চিঠি যাকে বলা যেতে পারে বন্দীর রাজনৈতিক বিবৃতি। নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক নেতা নন, দেশপ্রেমিক কবি, তাই এই বিবৃতি এক কবির বিবৃতি। নজরুলের জবানবন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতার ইস্তাহার চিঠিতে দুটি বিরোধী শক্তির অভিঘাত দেখান হয়েছে। একদিকে মানবতার জয়যাত্রা অন্যদিকে তা দমন করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর বর্বরতা।

চলিত গদ্যে তৎসম শব্দ ব্যবহার ও অনুপ্রাসের ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাক্যবন্ধগুলি হয়ে উঠেছে যেন এক একটি কবিতা। গদ্য কবিতার মতো বাক্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও সুষমা অসাধারণ কাব্যময় ছন্দ সৃষ্টি করেছে। ভাষার কান্তি ও দীপ্তি শাণিত ও স্বতঃস্ফূর্ত—

'রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র রাজার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।'

'সুর আমার বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং বাঁশী সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশীরও নয় সুরের নয়, দোষ আমার, যে বাজায়। তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয় দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান।'

তবু জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিচারাসন এ কার? রাজার, না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে?—রাজা, না ভগবান?—অর্থ, না আত্মপ্রসাদ?'

হেমন্ত কুমার সরকারের 'সুভাষচন্দ্র' (১৯২৭) পুস্তকে সুভাষচন্দ্রের কুড়িটি অমূল্য চিঠি মুদ্রিত হয়েছে। চিঠিগুলি ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক। বাক্য সাধু ক্রিয়াপদে রচিত হলেও আভ্যন্তরীণ মনোভঙ্গীতে আছে চলিত গদ্যের যুক্তিশীলতা। আত্মস্মৃতি এবং উপন্যাস-ধর্ম চিঠিগুলিতে প্রাধান্য পাওয়ায় চিঠিগুলির উপস্থাপন কৌশল হয়ে উঠেছে স্বচ্ছন্দ ও ব্যক্তিগত। চিঠিগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য রচনায় নাগরিক বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ইংরেজি শব্দের যত্রতত্র ব্যবহার আছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি চিঠিগুলি ব্যক্তিগত কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠির কাঁচা স্বাদ

এখানে নেই। আবেশ, উত্তেজনা, স্বগতোক্তি, একাকীত্বের নিঃসঙ্গতা, মনকে বিমূর্ত নৈঃশব্দের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া, আপন মনে কথা বলা—এগুলি সুভাষ-চন্দ্রের এই চিঠিগুলিতে অনুপস্থিত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে গৃহীত একটি আন্তরিক খোলামনের ছবি এখানে দেখা যাবে। কারাজগতের খুঁটিনাটি তথ্যকে তিনি অনেক দূর থেকে দেখেছেন। এক কথায় বলা যায় সুভাষের রচনারীতি সরল, গভীর, সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষীভূত। আমরা সুভাষচন্দ্রের ভাষারীতির কিছু নমুনা তুলে ধরছি—

'জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্বৈত জ্ঞান 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা'—একটা থিয়োরি কি না-বলিলাম, যতক্ষণ মুখে বলছি, ততক্ষণ থিয়োরি কিন্তু রিয়ালাইজ করিলে সত্য এবং রিয়ালাইজ করা যায়।'[৪২]

'আমাদের এক্‌সপিরিয়েন্স-এর ভিতরে রোমান্স বিশেষ কিছু নেই, সেই জন্য কলিকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে মনোটোনাস বোধ হইত।'

'দ্বিতীয়তঃ এদের একটা রোবাস্ট অপটিমিজম আছে আমরা জীবনের দুঃখের বিষয় বেশি ভাবি, এরা জীবনের সুখের এবং আলোর বিষয় বেশী ভাবে।'

'তোমার ২৪/৩/২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে ডাব্‌ল ডিসটিলেশানের ভিতর দিয়ে আসতে হবে; কিন্তু এবার তা হয়নি এবং সেজন্যে খুবই সুখী হয়েছি।'

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'বন্দীর মন' ও 'মুখর বন্দী' (১৯৪০) গ্রন্থ দুটি একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে ১৩৮২ সালের শ্রাবণ মাসে। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরী পুস্তকতালিকায় 'মুখর বন্দী' পুস্তকের প্রথম প্রকাশকাল ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০ এবং 'বন্দীর মনে'র প্রথম প্রকাশকাল ২রা এপ্রিল ১৯৪০। আমরা ন্যাশনাল লিটারেচার এম্পোরিয়াম প্রকাশিত 'বন্দীর মন'[৪৩] সংস্করণটি দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু 'মুখর বন্দী'র কোন প্রাচীন সংস্করণ হস্তগত হয়নি। এজন্য নতুন প্রস্তুত সংস্করণটিকে (যেখানে 'মুখর বন্দী' ও 'বন্দীর মন' এক সঙ্গে মুদ্রিত) আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি।[৪৪]

গ্রন্থ দুটির ভাব, ভাষা এবং উপস্থাপনরীতি একই। রচনাগুলি ডায়েরির আকারে লেখা। কিন্তু অধিকাংশ চিঠিতে রচনাকালের স্থান ও তারিখের সঙ্গে সঙ্গে রচনারীতিতে দেখা যায় যে উপস্থাপনরীতি পত্রধর্মী। একজন 'তুমি' কে কেন্দ্র করে (অথচ নাম ও সম্ভাষণ উহ্য রেখে) সম্ভবতঃ গ্রন্থদুটি পত্রাকারে

সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টা। এটি একটি বিশিষ্ট চিঠির স্টাইল না ব্যক্তিগত চিঠি বোঝা যায় না। 'মুখর বন্দী'র ১৬ এবং ৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পত্রদুটি 'র' এবং 'জ'-কে উদ্দেশ্য করে লেখা। পাদটীকায় দেখা যাচ্ছে (সম্ভবতঃ প্রকাশকের মন্তব্য)—

'তৎকালে দেউলী ক্যাম্পে অবরুদ্ধ রাজবন্দী শ্রীযুক্ত রসময় শূরকে লিখিত অপ্রেরিত পত্র' এবং অন্যটির পাদটীকায় আছে—

'এটি দেউলী ক্যাম্পে আবদ্ধ রাজবন্দী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদারকে লিখিত অপ্রেরিত পত্র।'

সুতরাং গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ করে রচনাগুলি সম্ভবত পত্র,-ডায়েরি নয়।

কবি কল্পনার বিস্তৃত আকাশের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণা, স্পর্শকাতরতা, দেহকাতরতা, আত্মানুশীলন, আত্মান্বেষণ অসামান্য হীরকদ্যুতির মতো চিঠিগুলিকে প্রাণবন্ত এবং কাব্যময় করেছে। প্রত্যেকটি চিঠি এক একটি বিচ্ছিন্ন পুষ্পের মতো। তার দীপ্তি, সৌরভ, সুষমার উৎস হলো এর অপূর্ব কাব্যময় গদ্যভাষা। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র মতো। যেখানে কবিতা গদ্যের মোড়কে রোমান্টিক কবি মনকে প্রকাশ করে তার অসামান্য রসমাধুর্যে। এজন্য এক মুখর বন্দীমনের দ্রুত সঞ্চারণশীল অথচ লঘু পদক্ষেপ যখন এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় এগিয়ে চলে তখন তাঁর রচনারীতি হয়ে ওঠে কখনও কবিতা, কখনও দর্শন, কখনও সঙ্গীত, আবার কখনও বা চিত্র। আসলে ভূপেন্দ্র কিশোরের রচনারীতি কোনো একটি বিশিষ্ট রীতির পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠে না। রচনাগুলি চিঠির আকারে উপস্থাপিত হলেও এর অন্তর্নিহিত আত্মাটি আসলে এক সাত্ত্বিক মনের কবিতা।[৪৫]

দীনেশগুপ্তের চিঠিগুলি পারিবারিক। মা, বৌদি, মণিদি, খুকুদি, বোন ও ভাইকে লেখা। কোনো চিঠিতে তিনি পুত্র ('তোমার নসু'), কোনো চিঠিতে 'স্নেহের ছোট ঠাকুর পো', কোনো চিঠিতে তিনি 'স্নেহের দীনেশ', কোনো চিঠিতে 'নসুদা', কোনো চিঠিতে 'দাদা'। একদিকে আসন্ন ও অনিবার্য জীবনাবসানের আশঙ্কা অন্যদিকে স্নেহ-প্রেম মমতার জীবন্ত মুখচ্ছবি তাঁকে মুহুর্মুহু বিচলিত করেছে। এক বিপ্লবীর জীবনের চরমতম মুহূর্তে মানবিক বৃত্তিগুলি অর্থাৎ শোক, দুঃখ, ভালবাসা যন্ত্রণার অনুভূতি—এই সব কিছুর পরিচয় পাওয়া যাবে ব্যক্তিগত চিঠিগুলিতে।

চিঠিগুলি সাধু গদ্যে লিখিত। প্রদীপ্ত আত্মপ্রত্যয় যেভাবে এক মহান দেশব্রতীর মনোজগতে মরণ ও জীবন এই দুটি সমাপ্তি ও সূচক বিন্দুকে আলোড়িত করে, দীনেশ গুপ্তের রচনায় তারই মর্মান্তিক অথচ অবশ্য-পরিণামী স্বরূপ অনবদ্য ভাষায় ধরা দিয়েছে।

এগুলি একান্তই ব্যক্তিগত চিঠি—এক বীর শহিদের চিঠি। ফাঁসির একেবারে শেষ দিনগুলিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের জীবনদর্শন একান্ত ব্যক্তিগত ভাব ও ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। চিঠিগুলি কখনই একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়নি। কোনো চিঠি একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব উপলব্ধি—

'মা, যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবুও তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমি হয়ত ভাবিতেছ, ভাগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থনা করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ তাঁহার কানে পৌছায় না। ভগবান কি আমি জানি না, তাঁর স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তবু এ কথাটা বুঝি, তাঁর সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না।'

(চিঠি-১, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, ৩০শে জুন ১৯৩১, কলিকাতা)

'তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাহিত, "কেন ডাকাইছ আমার মোহন ঢুলী?" যে পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, তাহাকে আর ষ্টেজে আসিতে হইত না।'

(বৌদিকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি-৩, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, ১৮ই জুন ১৯৩১, কলিকাতা)

'গীতা বলিয়াছেন—শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্বব্যাপী।'

(বৌদিকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি-৪, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, ২৯-৩-৩১, রবিবার, কলিকাতা)

লেখক তাঁর চিঠিগুলিতে মৃত্যুকে সঙ্গীত করে তুলতে চেয়েছেন[৪৬]।

'বন্দীর চিঠি' (১৯৪৬) ছ'জন বিপ্লবীর চিঠির সংকলন। এতে আছে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের চারটি চিঠি; সত্যগুপ্তের একটি; মণীন্দ্র কিশোর

রায়ের একটি; জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদারের ২৫টি, আশরফ্‌ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী'র ১টি এবং প্রবোধ চন্দ্র মজুমদারের একটি চিঠি।[৪৭]

পুস্তিকাটির ১ম মুদ্রণের ভূমিকা ও সম্পাদকীয় থেকে চিঠিগুলির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেই নতুনত্বটি হলো এগুলি কোনো কিশোর বন্দীকে লেখা আর এক 'বন্দীর চিঠি'। অর্থাৎ চিঠিগুলি এক জেল থেকে অন্য জেলে প্রেরিত হয়েছে। প্রাপক এবং প্রেরক উভয়েই কারারুদ্ধ—

'কয়েকটি কিশোর-বন্দীকে লিখিত কয়েকখানা পত্র একত্রিত কোরে ছাপিয়েছেন দু'জন কিশোর কর্মী।' (ভূমিকা-নওশেব আলি) এবং

'এই চিঠিগুলোর দু' একটি বাদে প্রায় সবই ময়মনসিংহ জেলে আটক সহবন্দীদের নিকট লিখিত এবং প্রত্যেকটিই সেন্সর করা চিঠি।' (সম্পাদকীয়-প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু এবং কালীপদ ভট্টাচার্য)। কিন্তু চিঠিগুলিতে প্রেরকের জেল-ঠিকানা আছে, প্রাপকের নেই। প্রাপকের নামগুলিও অনুল্লেখিত, কারণ বৃটিশ সরকারের সেন্সরের রক্তচক্ষু। সাংকেতিক সম্ভাষণগুলিও লক্ষণীয়। যেমন—'নী-দাদু', 'স্নেহের ভাই-মা', 'কল্যাণীয় কা', 'স্নেহের ভাইটি আমার', 'প্রিয় আ-দা', 'কল্যাণীয়েষু ভাই-ব', 'স্নেহের প্রি'-ইত্যাদি।

সম্ভাষণের সংকেত এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে বোঝা যায় এগুলি অনুজ সতীর্থের কাছে অগ্রজ সতীর্থের কারাচিঠি। এক একটি চিঠিতে এক এক ধরণের মনোজগৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রবণতা রাজনৈতিক-দার্শনিক। কারান্তরালে মনোজগতের যে নতুনত্ব তা অবশ্যই সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মেলে না। বন্দীর মন হয়ে ওঠে দর্শন ও কল্পনার রাজধানী, অত্যাচার নিপীড়ন আত্মলোককে অমৃতলোকে শিল্পলোকে পৌছে দেয়। এই নতুন শিল্পজগতের যন্ত্রনা বেদনা কান্না ও আনন্দ চিঠিগুলিকে কখনও কবিতায়, কখনও সঙ্গীতে, কখনও সাহিত্যে, কখনও দর্শনে উত্তরণ ঘটিয়েছে।

জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদারের চিঠিগুলি বর্ণনা ও দৃশ্য সজ্জায় অনবদ্য। তাঁর চিঠিতে প্রকৃতিজগৎ কথা বলে। আত্মকথার মত সেই জগৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে—

'গাছেরা সব উঠলো নড়ে, শিকড়রা কেঁদে বলে: কেন মালী ভাই, আমরা কি তোমার কেউ নই, আমাদের কি ছিল না একদিন এমনি হাল্কা মধুর জীবন, বাতাসের কোলে, আলোর আঙিনায়? আর আজ? রইনু পড়ে পাতাল পুরে; আলো বাতাস গেল-মরে।'

(বক্সা স্পেশাল জেল, ১৮।৭।৪৪ ইং)

'ঝরা পাতা আবার মাটি হয়ে রস হয়ে ফিরে আসে নবীনের বেশে। কেউ হারায়-না; কেউ ব্যর্থ হয়-না। সুন্দরের সাধনায় পলাশও সুন্দর, গাঁধা-ও সুন্দর। তাই না? মহাজনরা বলেন, এরা সবাই এক অব্যক্তের ব্যক্তরূপ—এক বিচিত্ররূপ।'

(বক্‌সা জেল, ৩।৩।৪৫ ইং)

'...আনন্দরাজ্যের অধিপতি পাগলা ভোলা; নিজেকে খান খান করে বিলিয়ে দিয়েও সৃষ্টির সকল অপচয়ের শূন্য ভাণ্ডার সদাই পরিপূর্ণ রাখবার দায়িত্ব তারই।'

(রাজসাহী জেল, ৬।১।৪২ ইং)

রচনারীতিতে রাবীন্দ্রিক প্রভাব সুস্পষ্ট। জ্যোতিশ্চন্দ্রের চিঠিগুলির কাব্যভাষা স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগের মিলনে পরিপূর্ণ যেন একটি সংগীতের রূপায়ণ—'বেদনা-আর্দ্র হৃদয়ে' যে মনের যন্ত্রণা-যাত্রা তাই 'মেঘের বুক চিরে' অন্তরায় এসে পৌছোয় যখন তিনি বলেন—'এ বেদনা-ঘন-মেঘ গলে জল হয়ে ঝরবে।' তিনি পরিশেষে বলেন—'মানুষের কাছে মানুষের ঋণ পরিশোধের আনন্দে।' এই যে সংগীত ধর্ম, ভাষা ও সুরের একাত্মতা তা নিবেদিত হয়েছে বিশ্বমানবতার মন্দিরে—

'আমরা বিশ্বমানবতার মন্দিরের পথে পথে প্রতিবেশি, সমাজ, স্বদেশ এদের কাউকে ডিঙিয়ে যেতে মনে সায় পাইনে,—কি ক'রবো?'

আশরফ্ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীর পত্র-রচনা রীতি অন্তর্মুখী। কথা বলায় কোন তাড়া নেই, শব্দবন্ধে তিনি জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদারের মত রবীন্দ্র-প্রভাবিত নন। গদ্যকে তিনি তর্কবিদ্যার আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। ফলে একটি বাক্যের সঙ্গে আর একটি অধস্তন বাক্য যুক্ত হয়ে বাক্যবন্ধকে অর্থের সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে; যেমন—

'যে ব্যক্তি জীবনকে বিকশিত করিতে চায় সত্যের স্পর্শে, তার চলার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইবেই।'

সত্য গুপ্তের চিঠিতে ভোরের সোনালী রোদের আমেজ আছে আবার শীতের স্পন্দনের মতো শব্দবিন্যাস ভেঙে যায় নতুন নতুন বাক্যের মধ্যে।[৪৮]

মণীন্দ্রকিশোর রায়ের চিঠিতে ছবি আঁকবার আয়োজন সুপ্রচুর অথচ শব্দ-বাছাইয়ের হাত শক্ত নয়। স্বরান্ত শব্দের মিল রেখে তিনি চিঠিকে কবিতা

করতে চান কিন্তু তা নিছকই অনুপ্রাস হয়ে ওঠে—কবিতা হয় না—বাক্যে অসাধারণ কাব্যিক আয়োজন চিঠিকে কাব্যের জগতে সাবালক করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাষার নাবালকত্ব ঘোচেনি—'মনোহরণ বাঁশী শুনেছে আলো' এই তরল বাক্যবন্ধের দুর্বলতায়।

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার অনেকটা দার্শনিকের মতো নির্লিপ্ত ও জীবনজিজ্ঞাসু। তাঁর রচনারীতি সাবলীল, ব্যক্তিগত অথচ সার্বিক—

'জীবন এমনিই বটে। সকল জায়গায় মানুষ খুঁজে বেড়ায় দুষ্প্রাপ্য একটা কিছু। চলতে গেলেই প্রশ্নের আর অন্ত থাকে না। চোখের সামনে যে প্রশ্নটি একান্তভাবে ফুটে ওঠে তাকে এড়িযে চলা হয়ে ওঠে না'।

এই চিঠিগুলি আসলে দর্শনে মননে সমৃদ্ধ একদল বন্দীর পুষ্পার্ঘ্য। আমরা উপরোক্ত ব্যক্তিগত চিঠিগুলিকে কারাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছি, কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে—

ক চিঠিগুলি ব্যক্তিগত সুতরাং সাহিত্য নয়।

খ. চিঠিগুলিব মধ্যে কাবাজগতের ছবি এবং কারাসংবাদ নেই।

এতদসত্ত্বেও অন্তর্ভুক্তির কারণ হলো (১) বন্দী মনকে বোঝা ও জানার পক্ষে চিঠিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (২) কারান্তরালের চিঠিগুলির একটি বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য আছে, কারাসাহিত্যের রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক এবং নান্দনিক দিকগুলি উন্মোচনের জন্য। (৩) কারাজগৎ বন্দীর দেহকে শৃঙ্খলিত করতে পারে না। মনোজগতের উত্তাপ অনুভবে চিঠিগুলি সাহায্যকারী দৌত্যকার্য গ্রহণ করেছে। (৪) কারাব্যবস্থা, মৃত্যুদণ্ড, দণ্ডিত মানুষকে যে দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসা এবং সাহিত্যানুভূতির দিব্যদৃষ্টির উন্মোচন করে সেগুলির কারাসাহিত্য সমালোচনার কাঁচামাল। সুতরাং চিঠিগুলিকে বাদ দিলে কারা সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার অসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।

৪

উপন্যাসধর্মী কারাসাহিত্য

কারাসাহিত্যের পর্যালোচনায় উপন্যাসধর্মী কিছু রচনাকেও অনিবার্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। এযাবত আলোচিত কারাসাহিত্যের বিশেষত্ব হল

কারাগার জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লিখিত রূপ। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা অবলম্বনে রচিত কারা বৃত্তান্তকেই আমরা কারাসাহিত্য আখ্যা দিয়েছি। কিন্তু উপন্যাস তো কল্পকাহিনী। এখানে ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা গ্রন্থন কৌশলের উপাদানগত প্রেরণা হতে পারে, কিন্তু তা নিছক ইতিহাসও নয়, আত্মজীবনীও নয়। অভিধানে তাই উপন্যাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

'কাল্পনিক উপাখ্যান; উপকথা; কল্পিত গদ্যকাব্য।·· উপন্যাস অর্থে প্রকৃতজীবনের দৃশ্যাত্মক-কাল্পনিক কাহিনী-সম্বলিত গদ্য গ্রন্থ, গদ্যে রচিত যে কাল্পনিক কাহিনীতে বা গল্পে প্রকৃত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়।'[১৯]

ইংরাজি অভিধানেও নভেল অর্থে অনুরূপ উক্তি আছে। যথা—

a fictitious prose narrative or tale presenting a picture of real life especially of the emotional crises in the life history of the men and women portrayed. (Twentieth Century Dictionary).

সুতরাং উপন্যাস বিষয়ের দিক থেকে কারাজীবনকাহিনী অবলম্বন করলেও প্রত্যক্ষ কারাঅভিজ্ঞতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায় এই প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কারাজীবনের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ কাহিনী নিয়ে রচিত জাগরী (সতীনাথ ভাদুড়ী), পাতালে এক ঋতু (দীপক চৌধুরী), একদা (গোপাল হালদার), লৌহকপাট (জরাসন্ধ) বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে একদা যে নতুনত্বের ও বিষয়গত অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রখ্যাত উপন্যাস-সমালোচক শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় উপন্যাসকে 'কারাসাহিত্য' আখ্যা দিয়েছিলেন[২০]। ফলে কারাসাহিত্য শব্দের সেই প্রয়োগ ও ব্যবহার বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয়গত সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল। তাকে সম্প্রসারিত করেই আমরা কারাসাহিত্যের নতুন নতুন উপাদানের দিকে লক্ষ্য দিয়েছি। তাই অনুরূপ বিষয়াশ্রিত উপন্যাসকেও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

তবে কারাজীবনের বিষয় অবলম্বনে রচিত কারা-উপন্যাসের এই শিল্পবস্তু ও শিল্পরীতি আধুনিক কালের বিষয় বা প্রকরণ হলেও তথ্যানুসন্ধানে এই জাতীয় কিছু কিছু পুরানো কালের বইকেও আমরা বিষয়ের দাবীতে এই আলোচনার অঙ্গীভূত করেছি।

সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে কারা উপন্যাসের গুণগত ও মাত্রাগত প্রভেদ

আছে। প্লট ও চরিত্রের দিক থেকে যেমন তফাৎ রয়েছে, বিষয় নির্বাচনেও নতুনত্ব রয়েছে। কারাজগৎ ভালমন্দের বিমিশ্রণে সম্পূর্ণ একটি নতুন জগৎ। এখানকার ব্যক্তি-সমাজ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা প্রকরণ প্রভৃতির দিক থেকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দানা বেঁধে উঠেছে যা সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে। কারা-উপন্যাসের একমাত্র উপকরণ ও উপাদান জেলখানা ও তার মানুষ। এখানকার মনুষ্যসমাজ দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—একদিকে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী অন্যদিকে জেলের প্রশাসক সম্প্রদায়। এরই মধ্যে কিছু অধস্তন জেল কর্মচারী আছেন যাঁরা এই দুটি বিপরীত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। কারাজগৎ ও লেখকমনের সংযোগসূত্রের যথার্থ সমীক্ষাই এই জাতীয় উপন্যাসের রূপরীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

'সচিত্র গুলজার নগর'[৫১] (১৮৭১) যথার্থ অর্থে কারাসাহিত্য নয়। এখানে নায়ক হেমাঙ্গের কারাবরণ ঘটনার অনুষঙ্গ মাত্র। কারাবরণ এবং কারাজগৎ কাহিনীর মূলগতিকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত করেনি, এমনকি প্রভাবিতও করেনি। কিন্তু যে দুটি অংশে কারাসংবাদ আছে তার সঙ্গে ব্রিটিশরাজের শোষণটুকু যুক্ত হয়ে 'সচিত্র গুলজার নগরে' কারাউপাদান একটি স্বয়ং স্বতন্ত্র অধ্যায়ে পরিগণিত হয়েছে। একারণে আলোচ্য গ্রন্থটির রূপরীতি আলোচনায় আমরা দুটি দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। প্রথমত, সাধারণ গল্পাংশ এবং লিপিকুশলতা দ্বিতীয়ত, সংলগ্ন কারা অনুচ্ছেদের উপর। এই অর্থে গ্রন্থটিকে অ-রাজনৈতিক কারাসাহিত্য বলা যেতে পারে।

'সচিত্র গুলজার নগর' নক্‌সাধর্মী রচনা। সাধারণত নক্‌সার উদ্দেশ্য চরিত্রসৃষ্টি নয়, কৌতুক-সৃষ্টি। এতে ছোট ছোট খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়েই ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস সৃষ্টি করা হয়। বর্তমান কাহিনীর লেখক কেদারনাথ দত্ত কৌতুক-রসকেই কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্র করতে চেয়েছেন, হেমাঙ্গকে নয়। এজন্য গ্রন্থটি প্রকৃত অর্থে ব্যাঙ্গাত্মক নক্‌সা—উপন্যাস নয়। এটি যে নক্‌সাধর্মী রচনা তার অন্যতম প্রমাণ গ্রন্থটির শিরোনাম। এখানে সচিত্র অর্থে Pen Picture—'রসে মাখা বর্ণে আঁকা হয়ে হরবোলা সেজে দেখা দিলেন'—প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত এই বাক্যটি নক্‌সাধর্মী গদ্য কাহিনীর ইঙ্গিত দেয়।

প্লট বা কাহিনীতে গল্পরস এবং রহস্য গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকায় নক্‌-সাটি হয়ে উঠেছে কাহিনীপ্রধান। লেখকের মূল লক্ষ্য কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও বা ব্যঙ্গবিহীন কৌতুক সৃষ্টি করা। গল্পের কাহিনী বুননে কোনো জটিলতা বা

নতুনত্ব নেই। উত্থান-পতনের পরিবেশটি তৎকালীন সামাজিক আবহাওয়ার উপর গড়ে উঠেছে। পরস্ত্রী প্রণয়, মদ্যপান, পরিচারকের শঠতা, বাগানবিলাস ইত্যাদি। নায়ক হেমাঙ্গ এবং জমিদার নীরদচন্দ্রের মধ্যে সম্পর্কটি অবৈরিতা-মূলক। লেখক কাহিনীকে বেঁধে রেখেছেন হেমাঙ্গ নীরদের মিত্রতা ও বন্ধুতাকে কেন্দ্র করে। এই দুটি বিপরীত সম্পর্কের মধ্যে কাহিনীটি ছোট ছোট খণ্ড চিত্র এবং ঘটনার রহস্যময় উপাদান হয়ে উঠেছে। ফলে প্লট প্রাধান্য পেয়েছে, চরিত্র প্রাধান্য পায়নি।

আলোচ্য ব্যঙ্গাত্মক গদ্য নকসাটি কারা পটভূমির উপর রচিত নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু হেমাঙ্গ নীরোদচন্দ্রের গৃহে আশ্রিত হয়ে চুরি ও অবৈধ প্রেমের অপরাধে পনেরো দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছে—সেই কারাদণ্ডের সামাজিক পটভূমিটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য। কাহিনী অবশ্যই কাল্পনিক নক্সা। হেমাঙ্গের কারাবাসের জন্য দায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়। দায়ী একটি বিশেষ সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনা। এজন্যই বল্প কাহিনীটি অ-রাজনৈতিক কারা-সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'জেলখানা'[৫১] (১৯১৯) উপন্যাসের নায়ক উত্তম-পুরুষে কথা বলেছেন। ঘটনা পরিবেশ চরিত্র সব কিছুরই কেন্দ্রভূমি ইংলণ্ড এবং সেই দেশেরই সতেরোটি জেলখানা। কাহিনী নির্মাণের পরিবেশটি দেখে মনে হয় এটি কোনো বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ অথবা বিদেশী উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে লেখা। যদিও কোথাও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই।

উপন্যাসটি উদ্দেশ্যধর্মী বলে মনে হয়। কেন না লেখক চুরির অপরাধে দণ্ডিত হয়ে নানা সময়ে সতেরোটি জেল পরিক্রমণ করেছেন। ভাগ্যাণে্বষণে বাংলা দেশ থেকে ইংলণ্ডে যাত্রা এবং কপালদোষে 'পর্যায়ক্রমে সপ্তদশ কারাগারে পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল' অতিবাহিত করেছেন ভুবনচন্দ্র। উপন্যাসের শতকরা আশিভাগই এই জেলজগতের চিত্র। চিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন এবং বর্ণনাত্মক। লেখকের লক্ষ্য ইংলণ্ডের সতেরোটি জেলের জীবনযাত্রা এবং দণ্ডব্যবস্থার চিত্রটিকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরা। এই জেল জগতের বিস্তৃত চিত্রটি উপস্থিত করার জন্য লোরার সঙ্গে লেখক এবং কলভিনের দ্বিমুখী প্রেম, লেখকের চৌর্যবৃত্তি এবং কারাবাস। কারাবাসের পর লোরা এবং কলভিন আখ্যানভূমি থেকে বিদায় নিয়েছে। লেখক একটি বিস্তৃত বর্ণনার চিত্র পরপর সাজিয়ে ইংলণ্ডের কারাব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন। সতেরোটি জেলের দীর্ঘ বর্ণনা ক্লান্তিকর এবং

বৈচিত্র্যহীন। কেননা স্মৃতি চিত্রণের মতো এখানে পাঠককে দেবার মতো তেমন কোনো মানসিক খাদ্য নেই। তথ্যের বিপুল সংগ্রহ রচনারীতিকে সাধারণ বর্ণনায় পরিণত করেছে। লেখক জেলে দিনলিপি লিখতেন একথা উল্লেখ করলেও উপন্যাসের কোনো অংশে ডায়েরি-স্বাদ নেই।

কাহিনীর দ্বিতীয় উপকাহিনী জেলখানায় জুলিয়েটের সংগে লেখকের প্রেম। লেখকের সংগে লোরা এবং জুলিয়েটের প্রেম কাহিনীর মধ্যে এমন কোনো নতুনত্ব নেই যা জেলজীবনের ক্লান্তিকর বর্ণনাকে অতিক্রম করতে পারে। প্রকৃত অর্থে 'জেলখানা'কে উপন্যাস বলা চলে না; কারণ ঘটনা, চরিত্র ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উপন্যাসে যে বিপুল গতি সৃষ্টি করে 'জেলখানা'য় তার পরিচয় নেই। দুটি প্রেম কাহিনী আকস্মিক ঘটনার মতো উল্লিখিত হয়েছে, ব্যাপ্তিলাভ করেনি। 'জেলখানা'র আভ্যন্তরীণ কাঠামো যেহেতু বিবৃতি এবং সাধারন বর্ণনায় পর্যবসিত এজন্য এটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে ওঠেনি।

' জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রফুল্ল সরকারের 'অনাগতে'র[৫৩] (১৯২৭) কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ভাব ও চরিত্র, মন ও হৃদয়, চিন্তা ও কর্ম একটি বিশিষ্ট যুগের সাধনা। অনিন্দিতা, প্রতিমা, মোহিত এবং মহেন্দ্রকে আলোড়িত করেছে বিপ্লবী আদর্শ। একুত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ঘটনার কেন্দ্রীয় গতি নরেশের ষড়যন্ত্রে মোহিত কিশোরের কারাদণ্ড। জাতীয় জীবনের দুর্গম সংক্ষুব্ধ পথটিকে লেখক অনিন্দিতার নির্ভীকতা ও মূল্যবোধের সৌজন্যে একটি দীর্ঘ আপাতবক্র তরঙ্গের মতো চিত্রিত করেছেন।

' 'শৃঙ্খল'[৫৮] (১৯৬৩) উপন্যাসটির আখ্যানভূমি সামাজিক। কাহিনীর নায়ক বিশ্বেশ্বর স্ত্রী হত্যার অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছে। সেই সূত্রেই উপন্যাসে কারাজীবন এসেছে। বিশ্বেশ্বর যেহেতু শিক্ষিত এজন্য অন্যান্য কয়েদীদের অনিবার্য শ্রদ্ধামিশ্রিত মনোভাব বিশ্বেশ্বরকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর একদিকে গল্পকথক ও পর্যবেক্ষক এবং অন্যদিকে ঘটমান চরিত্র। তাছাড়া কারাজগতে সর্বদাই একটি রুদ্ধশ্বাস রহস্যজনক ঘটনার স্রোত কয়েদীদের আতঙ্কিত করে। শাসক ও শাসিতের বিপ্রতীপ সম্পর্কটিকে লেখক কাজে লাগিয়ে নবী নওয়াজ, সোলেমান ইত্যাদি চরিত্র-গুলিকে সাজিয়েছেন একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিপূরক করে।

' কাহিনীর কেন্দ্র চরিত্র বিশ্বেশ্বর। গ্রেপ্তার বরণ, তৃতীয় শ্রেণীর কারাবাস, সাহেব ওয়ার্ডে স্থানান্তর, স্ত্রী অমলার সুখস্মৃতি, মুক্তির প্রতীক্ষা, রোগাক্রান্ত

হওয়া, রাজবন্দীদের নেতৃত্ব দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা বিশ্বেশ্বরকে অবলম্বন করেই বিবর্তিত হয়েছে। তার একদিকে বিচিত্র কয়েদীজগৎ অন্যদিকে জেল-কর্তৃপক্ষ। চরিত্র পরিকল্পনা এবং মন্তব্য প্রকাশে লেখক সংযমী।

'পাষাণপুরী'[৫৫] (১৯৩৩) উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোড়ার দিকের রচনা হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারা উপন্যাস। এখানে কারাজগতের অধিবাসীরা একটি বিশেষ পারিবারিক আত্মীয়তায় গড়ে উঠেছে। লেখক একটি বিশেষ শিল্পদক্ষতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অদ্ভূত ও বিচিত্র চরিত্রের একত্রীকরণ, তাদের নৈতিক স্তরগুলির চিত্র ও ফেলে আসা জগতের বেদনাস্মৃতি—এই তিনটি দিককে জেলশৃঙ্খলার একটি নিয়মতান্ত্রিক খুঁটিতে বাঁধা হয়েছে। নিরানন্দ নৈরাশ্য, অবসাদ-আত্মমর্যাদা দমনকারী দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে কীভাবে সুকুমার হৃদয়বৃত্তি সহানুভূতি, প্রেম ও ভালবাসা অস্তিত্বের তীব্রতা প্রকাশ করে তা লেখক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চকর ভাষায় আঁকতে চেয়েছেন। কাহিনী বয়নে ধারাবাহিকতার আপাত বিচ্ছেদ ক্রমাগত সাইদ, কেষ্ট, গৌর, চৈতন্য, ওস্তাদ, গোঁসাই প্রভৃতি জেলে নিম্নস্তরের কয়েদীদের রুক্ষতা এবং মূল্যহীনতার বিচিত্র অনুষঙ্গে কাহিনী ও চরিত্রের একটি সাম্য সৃষ্টি করেছে।

লেখকের লক্ষ্য জেলজগতের তথাকথিত ইতর কয়েদীদের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের (যেমন সুরেশ, অমর) নৈতিক ও মানসিক মূল্যবোধের চরিত্র গৌরব প্রতিষ্ঠিত করা। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের অন্যতম চরিত্র চাটুজ্যে। তার নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে নরুর অনশনে মৃত্যু তাৎপর্যপূর্ণ হলেও উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে নরুর কোনো সম্পর্ক নেই[৫৬]—শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ আনলেও আসলে কারা উপন্যাসের বিশ্লেষণে এ'মত গ্রহণীয় নয়। নরুর জীবনাদর্শ কলুষিত জেল আবহাওয়ার প্রতিরোধক বিন্দু। জেলজগতের বিচিত্র চরিত্রগুলি এভাবেই উপন্যাসের লৌহ কঠিন যান্ত্রিকতার মধ্যে মানবত্মার চিরন্তন স্মৃতি-সৌধ রচনা করে।

'পাষাণপুরী'তে নরুর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং অন্যান্য কয়েদীদের উৎকেন্দ্রিক জীবনের বর্ণনা লক্ষণীয়—

'তিলে তিলে দীর্ঘ ত্রিশ দিনে তাহার দেহের উপর মরণ আপনার অশরীরী রূপের ছাপ সুপরিস্ফুট ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যেন কোন সুদক্ষ চিত্রকর তুলিকার পর তুলিকা চালাইয়া পটভূমির উপর একটী মৃত্যুর চিত্র আঁকিয়া চলিয়াছে—পাণ্ডুর, স্থির, জীর্ণ সেরূপ, কঙ্কালসার মুখখানি কিন্তু অপূর্ব আনন্দের

জ্যোতিতে উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত; হয়তো বা মরণ-ম্লান দেহেখানির মধ্যে অবশিষ্ট জীবনের দীপ্তি সেটুকু'![৫৭]

বনফুলের (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) 'অগ্নি'[৫৮] (১৩৫৩) মননধর্মী উপন্যাস। কাহিনীর প্রধান চরিত্র অংশুমান যতখানি মানসিক ততখানি শারীরিক নন। অংশুমান গতিশীল চরিত্র নয়, ফলে উপন্যাসের গতিধর্ম ব্যাহত হয়েছে। কাহিনী ও চরিত্র সংক্ষিপ্ত আধারে সংবদ্ধ। অস্তরাকে কেন্দ্র করে অংশুমানের মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদর্শ ও কল্পনা উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে কারা উপন্যাসের সম্ভাব্য প্রাপ্তিগুলি অর্থাৎ বিভিন্ন কারাচরিত্র, জেল-জগতের বর্ণন, চরিত্রগুলির নৈতিক সংকট প্রায় অনুপস্থিত। ফলে উপন্যাসটি আপাতভাবে এপিসোডিক মনে হলেও এর খণ্ড উপাখ্যানগুলি মনন সমৃদ্ধ। চিন্তা ও যুক্তি চরিত্রগুলির অন্তর্জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে চরিত্রপ্রধান। জেল জগতের বাইরে খোলা প্রাকৃতিক জগৎ চরিত্রগুলির মধ্যে ক্রমাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—

'জেলের বাইরে প্রকাণ্ড মাঠ।...দ্বিপ্রহরের উগ্র জ্যোতিতে চকচক করছে বেয়নেটের ডগাটা। জেলের গেটে খাকী পোশাক পরে নিঃশব্দে পদচারণ করছে পাঠান প্রহরী।'

'সেদিন পূর্ণিমা। শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অস্তরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিল সে।'

'জেনানা ফাটক'[৫৯] (১৩৭৫) রাণীচন্দের একটি সুলিখিত উপন্যাস। চরিত্র এবং চিত্রসম্পদ আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য। উপন্যাসটি ডায়েরিধর্মী এবং আত্মস্মৃতিমূলক। কোনো নিটোল কাহিনী আঁকার প্রচেষ্টা নয়—সময় ও ঘটনানুপাতিক বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্রের কথামালা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রীতি অনুসারে লেখিকা উপন্যাসের অধ্যায়গুলির নামকরণ করেছেন।

উপন্যাসটির তিনটি পর্ব—আলাপ, সঞ্চারী এবং অস্তরা। তিনটি পর্বের যোগসূত্র লেখিকা নিজেই। কারাজগৎকে তিনি দেখেন এবং দেখান। ফলে দুটি ঘটনা ঘটেছে—পারিবারিক গল্পের মতো কারগারের খণ্ড চরিত্রগুলি লেখিকার অনুভূতিতে গন্ধ ও স্পর্শময় হয়ে উঠেছে অন্যদিকে লেখিকার মনোজগৎ কথা ও কল্পনায় অবিরত ও অনর্গল হয়ে উঠেছে।

'আলাপ' অংশে ইনস্পেকটর, মায়া, ভাবি, ইন্দুমতী, নন্দিতা, ভবাণী এমন

অসংখ্য চরিত্র এসে ভিড় করেছে লেখিকার বর্ণনাশক্তি ও চিন্তাস্রোতের প্রতিনিধি হিসাবে। উপন্যাসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কারাজগতের বৈচিত্র্যময় নারী কয়েদীদের চিত্রাঙ্কন। নারী ঔপন্যাসিক নারী হৃদয় নিয়ে নারীজগতকে দেখছেন। সেই দেখায় লেখিকার নারীত্ব এবং চরিত্রগুলির নারীত্ব এক হয়ে ওঠায় নারীচরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে অনবদ্য, মনস্তাত্ত্বিক এবং বাস্তবসম্মত।

'সঞ্চারী' পর্বে সম্পূর্ণ ভাবে ডায়েরিরীতি অনুসৃত। ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ যে ডায়েরির শুরু—:৬ই মার্চ, ১৯৪৩ তার শেষ। এক মঙ্গলবার সকল থেকে আর এক মঙ্গলবার সকাল। প্রতিদিনের ডায়েরি অংশ সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যে এমন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত। লেখিকা কারাজগতের সুরটিকে আপাত নিষ্ক্রিয় করে উপন্যাসের 'সঞ্চারী' অংশে মনোজগতকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। যদি 'আলাপ' অংশের নাম দেওয়া যায় কারাসঙ্গিনীদের রূপকথা, 'সঞ্চারী'কে তাহলে বলা যেতে পারে এক বন্দিনীর আত্মকথা। এখানেও রূপজান, মরিয়ম, সরলা, অভিজিৎ, বিমলা, জামিনা এমন চরিত্র অনেক আছে। এরা লেখিকার প্রতিদিনের বন্ধু, প্রেমিক কিম্বা সঙ্গিনী হয়ে ডায়েরির পাতায় মুখর হয়ে উঠেছে। জেনানা ফাটকের বন্দিনীরা একটি দিনকে কীভাবে সমাপ্ত করে আর কেমন করে আগামী ভোরের কল্পনায় মুখর হয় তারই মরমী তৈলচিত্র রাণীচন্দের 'জেনানা ফাটক'।

'সঞ্চারী'র পর 'অন্তরা' পর্ব। লেখিকার ঘরে ফেরার পালা। এখানে ডায়েরির রূপ থেকে তিনি আবার কারাজগতের অন্যতম চরিত্র হয়ে উপস্থিত। সুখ দুঃখ হাসি কান্নার যে বন্দীজগৎ—

'তার পরেই তো জেনানা ফাটকের দরজা। সম্পর্ক সব ছিঁড়ল বলে। হঠাৎ পিছন হতে কে যেন আমায় টানল। ফিরে দেখি ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রাধা আমার আঁচল ধরে টানছে।'

'জেনানা ফাটকে'র লেখিকা ভ্রমণ কাহিনীর ঢঙে কারাভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। যে ফাটকে নিত্য নতুন চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান: যে বন্দিনী নতুন নতুন ফাটকে স্থানান্তরিতা সে জগতের কাহিনীতো ভ্রমণ কাহিনীরই মতো।

পূর্বেই বলা হয়েছে 'যে উপন্যাসটি আত্ম-স্মৃতি ও ডায়েরিধর্মের সংমিশ্রণ। এখানে কারাজগৎ লেখিকার মন ও কল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে। কারাজগতের প্রতিটি ঋতু, দিবারাত্রি, জ্যোৎস্না-অন্ধকার উপন্যাসের আখ্যানভূমি।

পরিবর্তনশীল রূপ এবং সূক্ষ্ম আবেদন এর মর্মকথা। অথচ ডায়েরি চিত্রনের মতো সমস্ত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক সুগভীর বস্তুনিষ্ঠ ব্যঞ্জনাময় রহস্য চঞ্চল শিল্পমন অবিচল কেন্দ্রবিন্দুর মতো স্থির। কারাজগৎকে নিবিড় ও বিচিত্রভাবে অনুভব করা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এঁকে চরিত্রগুলিকে বর্ণপ্লাবিত করা, মানবমনের ক্রমশ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলা অন্যান্য কারা উপন্যাসে বিরল, উপন্যাসটি চরিত্র-চিত্রময়। নিগূঢ় ক্রিয়াশীল কারা প্রতিবেশের মধ্যে মানুষের সংকুচিত উপস্থিতি, তাদের ক্ষুদ্র নগণ্য আশা আকাঙ্ক্ষা ধারাবাহিকতাহীন অথচ সামগ্রিক আবেদনে পরিপূর্ণ।

কারা উপন্যাসের প্রতিনিধিত্বকারী গ্রন্থের নাম 'জাগরী'[৮০] (১৯৪৫)। এই উপন্যাসের প্লট, চরিত্র এবং প্রকাশকলার নতুনত্ব লক্ষ্য করার বিষয়। উপন্যাসে ঘটনার বিস্তার অপেক্ষা চরিত্রগুলির চিন্তাস্রোতের বিবরণ 'জাগরী'কে বিশিষ্ট উপন্যাসের মর্যাদা দান করেছে।

জেল ওয়ার্ডে ফাঁসীর আসামী বিলু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত। মৃত্যুর অনিবার্য আহ্বান বিলুর সমগ্র চৈতন্যকে আলোড়িত করেছে। মনোজগতের চেতন ও অবচেতনের মধ্যস্তরে দাঁড়িয়ে আছে বিলু। বিলুকে কেন্দ্র করেই একটি পরিবারের অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত। আগস্ট আন্দোলনের পট-ভূমিকায় এই পারিবারিক আখ্যানটি চিত্রিত।

পরিবারের চারটি চরিত্র স্বতন্ত্র ধারায় বর্ধিত। চরিত্রগুলি কোন নিয়মতান্ত্রিক ছকে অঙ্কিত নয়। মুক্ত অনুষঙ্গের মতো অতীত ঘটনার নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ 'জাগরী' উপন্যাসকে চিন্তাধর্মী এবং তত্ত্বময় করে তুলেছে। ঘটনা উপস্থাপনে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো চরিত্রগুলির স্বগতোক্তি। নির্জন সেলে অতীত ক্রিয়া-কর্মের নিরীক্ষণ করার বিশেষ অবকাশ পেয়েছে, ফলে তাদের মানসিক জগতে ক্রমাগত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

'জাগরী'তে কারাজগতের দুঃসহ অন্ধকারময় চিত্র রয়েছে। নির্জন জেলের নিরানন্দময় পরিবেশে 'বিলু', 'বাবা' ও 'মা'র একাকীত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সেলগুলি অত্যন্ত ছোট, বায়ু চলাচলহীন, অস্বাস্থ্যকর এবং বসবাসের অনুপযোগী। আকাশের সামান্য কিছু অংশ দেখা যায়। এমন এক অবরুদ্ধ সেলের নির্জন একটি রাতে প্রতিটি চরিত্র তাদের পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করেছে। স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্যদিয়ে একদিকে যেমন বর্ণিত চরিত্রগুলির চিন্তা-ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে আদর্শগত সংঘাত,

আত্মবিশ্লেষণ, মান-অভিমান, মমত-স্নেহ চরিত্রগুলিকে মানবিক পরিচয়ে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

'জাগরী' সতীনাথের প্রথম উপন্যাস। '৪২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'জাগরী' লেখা সুরু এবং আগষ্ট আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হিসাবে জেলে অবস্থানকালে লেখক 'জাগরী'র পরিপূর্ণতা দান করেন। রাজনৈতিক চেতনা পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে 'বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্য-ম্ভাবী' এবং তা যে কোন কোন সময়ে পারিবারিক জীবনেও সংঘাত ও সংকট আনতে পারে, তারই সূক্ষ্ম রূপায়ণ 'জাগরী'।

'বাবা', 'মা' 'বিলু' ও 'নীলু'—পারিবারিক বন্ধনে কেবলমাত্র ঘনিষ্ট আত্মীয়ই নয়, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অচ্ছেদ্য। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার ব্যাপ্তি তথা জাগৃতির জন্য তারা প্রত্যেকেই আদর্শগত কর্মপদ্ধতিতে নিজেদের পরিচালিত করেছে। ফলে একই পরিবারের অন্তর্গত হওয়া সত্বেও আদর্শগত পার্থক্যের জন্য বাবা, বিলু ও নীলু স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হয়েছে।

মুক্তি আদর্শে বাবা পরিপূর্ণ বিশ্বাসী এবং তাঁর জীবনের সবকিছুই ঐ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত। মা তাঁর স্বামীর অদর্শকে বুঝে বা না বুঝে মনে প্রাণে গ্রহণ করেও সংসারের সকলকে নিয়েই সুস্থ সরল সুন্দর পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চান। বাবার অহিংসা নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট তত্ব ও সংগ্রামের আদর্শকে মেনে নিয়ে পথঘাট বন্ধ করে, থানা পুড়িয়ে ও আরও বিভিন্ন অপরাধে 'স্যাবটেজ'—এর জন্য বিলুর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়েছে, এখন বিলুর অবস্থান 'ফাঁসি সেল'। আর ছোট ভাই নীলু কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী—তাই সে বাবা ও দাদা'র আদর্শ থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করে কমি-উনিস্ট মতবাদের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠায় সে দাদা'র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে দাদা'র প্রাণদণ্ডের কারণ হলেও নীলু মনে করে যথার্থ কমিউনিস্ট হিসাবে সে তার কর্তব্য করেছে। একটি পরিবারের এই নিদারুণ সংকটের আঘাত ঐ চারজনকেই আলোড়িত করেছে।

আজই বিলুর জীবনের অন্তিম রাত্রি। কাল ভোরে তার ফাঁসি। উৎ-কণ্ঠিত, অনিদ্রিত উৎকর্ণ বিলু'র প্রতি মুহূর্ত কাটে অতীত জিজ্ঞাসায়। উত্তেজিত ও শঙ্কিত বিলুর মনোজগতেও তখন তুমুল আলোড়ন—

'প্রতি লোমকূপে প্রত্যাশিত আতঙ্কের সাড়া—প্রতি স্নায়ুতে টাইফনের বিক্ষোভ—এই আলোড়ন অক্ষিগোলকের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চায়।

তুমুল বাত্যাবিক্ষোভে আর বুঝি দাঁড়াইতে পারা যায় না।·· দৃঢ় মুষ্টিতে গরাদ চাপিয়া ধরিয়াছি।'

বাবা সর্বজনপূজ্য গান্ধীবাদী 'মাস্টার সাহেব'। জেলের আপার ডিভিসনে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় বিনিদ্ররজনী যাপন করেছেন। বিলুর মৃত্যুমুহূর্ত চিন্তা করে যন্ত্রণায় অস্থির হয়েও তাঁর কাতর প্রার্থনা—

'ভগবান মহাত্মাজী ; বিলুর মাকে আঘাত সহ্য করিবার শক্তি দাও, নীলুর মনে বল দাও, বিলুর আত্মাকে শান্তি দাও ··'

জেলের 'আওরৎ কিতা'য় বিলুর মা বন্দিনী। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর আশঙ্কায় যিনি প্রতি মুহূর্তে 'ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছেন' তাঁর কাতর জিজ্ঞাসা—

'গান্ধীজি, তুমি আমার একি করলে ?·· ·· নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে তোমার পূজো করেছি ; তার প্রতিদান তুমি খুব দিলে।'

'জেলগেট'—শেষ রাত্রি থেকে নীলু প্রতিক্ষারত। দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে সে তার আদর্শগত দায়িত্ব পালন করেছে, এখন সে দাদার দেহ সংকার করে পারিবারিক কর্তব্য পালন করবে। ঘৃণা এবং অভিশাপ এখন তার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো হয়ে বুকে বাজছে আত্মপীড়ন ও আত্মজিজ্ঞাসা—

'· দাদা এখন কী করিতেছে ? হয়তো গরাদ ধরিয়া অন্ধকার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিয়া চলিয়াছে। আমার কথাও কি একবার ভাবিবে ? দাদা কখনই আমাকে ভুল বুঝিতে পারে না। ···কিন্তু সকল যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্তরের ভিতর কোথায় যেন খচ্‌খচ করিয়া কি একটা বিঁধেতেছে।'

স্মৃতিচিত্রণের মধ্যদিয়ে এমন সুনিপুণ চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল। চারটি মানুষের স্মৃতিচিত্রণে কেবল নিজেরা বা পরস্পরকে মূর্ত করেছে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পরিজন ও ইতিহাসের বিস্তৃত পরিচয়ও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত হয়েছে। পারিবারিক সংকট একটি পরিবারের মধ্যে যে আবর্তন ও বিবর্তন এনেছে তারই মধ্যে বহু মানুষের চিত্র ফুটে উঠেছে লেখকের যথার্থ পর্যবেক্ষণ ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধে।

ফাঁসির আগের একটি রাত্রির বর্ণনায় স্মৃতিচারণের তুলিতে অসংখ্য 'চরিত্রের চিত্রশালা' সৃষ্টি হয়েছে। সহানুভূতি, মমত্ববোধ, অপরূপ ভাষাশৈলী, 'অনুভূতি আশ্রয়ী স্মৃতি ও ভাবানুষঙ্গ' সতর্ক শিল্পী সতীনাথকে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির

তাগিদে অনুশীলনের বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। চেতনাপ্রবাহ, স্বগতোক্তি, ফ্ল্যাশ ব্যাক, ক্লোজ আপ, বহু কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি রচনার নানা কলা-কৌশলে সতীনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'তেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

কারাগারকে কেন্দ্র করে ও স্মৃতিরোমন্থনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়, আঙ্গিকের সুনিপুণ কলাকৌশল ও জীবনভিত্তিক শিল্পধর্ম প্রয়োগে, সহৃদয় মানবতাবোধ ও শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি 'জাগরী'কে মর্যাদার আসনে চিরস্থায়ী করেছে।

অতীন্দ্রনাথ বসু'র বি-কেলাস'[৬১] (১৯৪৮) উপন্যাসটি বন্দীজীবনের দর্পণ। এটি দর্শনিক চিন্তা ও বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি। দার্শনিক নির্লিপ্ততায় মানবমনের বিচিত্র চিত্র-সম্পদ উদ্ধার করেছেন লেখক। প্লট ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা এখানে অনুপস্থিত। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ চরিত্র-গুলি বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে।

কারাজগতের অন্তরালে বি-কেলাসে আত্মপ্রকাশ করেছে মানু, ভিখন, গনি, সুনীল, মোহিত। গ্রন্থের আঙ্গিকধর্ম পাঁচালিগানের মতো। যে চরিত্র-চিত্রণ উপন্যাসকে জীবন্ত ও আস্বাদ্য করে, লেখক সেই অঙ্কন ক্রিয়া থেকে বিরত। বরং কয়েদীজগতের অন্তর-রহস্য, অস্বাভাবিকতা, যৌন-বুভুক্ষা এবং কান্নার মননশীল অনুসন্ধানই লেখকের লক্ষ্য। এজন্য বি-কেলাস ঠিক উপন্যাস নয়, অনেকটা ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। এর একদিকে চিত্র ও বস্তু অন্যদিকে দর্শন ও কল্পনা। চরিত্র হিসাবে স্থান পেয়েছে চাষী, মজুর, গুণ্ডা, খুনী, করণিক, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মানুষ। মুহূর্তের মনোবিকৃতি যাদের কারারুদ্ধ করেছে—অপরাধ তাদের বৃত্তি নয়। কলুষিত জেল আবহাওয়ার তাদের অবশিষ্ট মনুষ্যত্বের বিকৃতি ও মৃত্যু উপন্যাসের ভাব-বস্তু। চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় দার্শনিক বিশ্লেষণ ক্ষমতায় ও সাংকেতিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠা এক একটি রত্নহার।

বাংলার উপন্যাসে 'বি-কেলাস' একটি অনন্য সাধারণ পরিবেশ বিজ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছে। কারাপরিবেশের জ্যামিতিক কাঠামোটি দুঃসহ আত্মগ্লানির রঙ ও রেখায় নির্মিত। এই নির্মাণক্রিয়ার বাহন দার্শনিক গদ্যভাষা। লেখকের নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রণা ভাষাকে করেছে তির্যক ও ভাব-বাচনিক—

'দুঃখ মোচন না হলেও মোহিতের কলংক মোচন হোল। সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু মনে পড়তো ঝরণার কথা। দেহের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও ভুলতে পারেনি না-ভাকা ছোড়দির মুখ।'

তাগিদে অনুশীলনের বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। চেতনাপ্রবাহ, স্বগতোক্তি, ফ্ল্যাশ ব্যাক, ক্লোজ আপ, বহু কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি রচনার নানা কলা-কৌশলে সতীনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'তেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

কারাগারকে কেন্দ্র করে ও স্মৃতিরোমন্থনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়, আঙ্গিকের সুনিপুণ কলাকৌশল ও জীবনভিত্তিক শিল্পধর্ম প্রয়োগে, সহৃদয় মানবতাবোধ ও শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি 'জাগরী'কে মর্যাদার আসনে চিরস্থায়ী করেছে।

অতীন্দ্রনাথ বসু'র বি-কেলাস'[৬১] (১৯৪৮) উপন্যাসটি বন্দীজীবনের দর্পণ। এটি দর্শনিক চিন্তা ও বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি। দার্শনিক নির্লিপ্ততায় মানবমনের বিচিত্র চিত্র-সম্পদ উদ্ধার করেছেন লেখক। প্লট ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা এখানে অনুপস্থিত। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ চরিত্র-গুলি বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে।

কারাজগতের অন্তরালে বি-কেলাসে আত্মপ্রকাশ করেছে মান্নু, ভিখন, গনি, সুনীল, মোহিত। গ্রন্থের আঙ্গিকধর্ম পাঁচালিগানের মতো। যে চরিত্র-চিত্রণ উপন্যাসকে জীবন্ত ও আস্বাদ্য করে; লেখক সেই অঙ্কন ক্রিয়া থেকে বিরত। বরং কয়েদীজগতের অন্তর-রহস্য, অস্বাভাবিকতা, যৌন-বুভুক্ষা এবং কান্নার মননশীল অনুসন্ধানই লেখকের লক্ষ্য। এজন্য বি-কেলাস ঠিক উপন্যাস নয়, অনেকটা ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। এর একদিকে চিত্র ও বস্তু অন্যদিকে দর্শন ও কল্পনা। চরিত্র হিসাবে স্থান পেয়েছে চাষী, মজুর, গুণ্ডা, খুনী, করণিক, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মানুষ। মুহূর্তের মনোবিকৃতি যাদের কারারুদ্ধ করেছে—অপরাধ তাদের বৃত্তি নয়। কলুষিত জেল আবহাওয়ার তাদের অবশিষ্ট মনুষ্যত্বের বিকৃতি ও মৃত্যু উপন্যাসের ভাব-বস্তু। চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় দার্শনিক বিশ্লেষণ ক্ষমতায় ও সাংকেতিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠা এক একটি রত্নহার।

বাংলার উপন্যাসে 'বি-কেলাস' একটি অনন্য সাধারণ পরিবেশ বিজ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছে। কারাপরিবেশের জ্যামিতিক কাঠামোটি দুঃসহ আত্মগ্লানির রঙ ও রেখায় নির্মিত। এই নির্মাণক্রিয়ার বাহন দার্শনিক গদ্যভাষা। লেখকের নৈব্যক্তিক যন্ত্রণা ভাষাকে করেছে তির্যক ও ভাব-বাচনিক—

'দুঃখ মোচন না হলেও মোহিতের কলংক মোচন হোল। সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু মনে পড়তো ঝরণার কথা। দেহের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও ভুলতে পারেনি না-ভাকা ছোড়দির মুখ।'

অথবা—'ছলনার (ইলিউশন) সঙ্গে বাস্তবের (রিয়ালিটি) বিরোধ আছে, সত্যের (ট্রুথ) নেই। সত্য-ছলনাকে নিরাকরণ ক'রে দেওয়া অন্যায়, সমাজ বিরুদ্ধ। ধর্ম, ঈশ্বর, ইত্যাদি সত্য-ছলনা। নাস্তিকদের একটা সমাজ কি চলতে পারে? ভল্তের জবাব দিয়েছিলেন,—যদি তারা সবাই দার্শনিক হয়।'

অনেকটা মেঁাপাসা'র গল্পরীতির মতো ভাষার অন্তরঙ্গ শিল্পগুণও এখানে লক্ষণীয়—

'এক একটা রাত আসে কেমন যেন নেশায় ছোপানো, আকাশের চাঁদিনী জানালা দিয়ে চুপিসাড়ে ঘরে ঢোকে, নিশুতি নীরবতার মধ্যে গঙ্গার কুলুকুলু আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। এমন রাতে একা থাকা যায় না। আকাশের জ্যোছনা চোর, নদীর কুলুধ্বনি চোর, ঝরণাও চোর হয়। কাদুমাসী ইসারায় সম্মতি দেন। বস্তির ঝি দৌত্য করতে বেরোয়। অতিথি আসে, রাত আর নেশা একসঙ্গে কাটে।'

গোলাপ হালদারের 'একদা' (১৯৩৯) গ্রন্থটি ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে রোগশয্যায় লেখা। কারাজগতের নিরালা একাকীত্ব ঔপন্যাসিকের দর্শন ও শিল্পজগতকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সত্য কিন্তু কারাজগতের বর্ণনা ও চরিত্র এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটিকে—

'রাজনৈতিক বন্দীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উচ্চাঙ্গের মনন-শক্তি ও প্রখর জ্বালাময় অনুভূতির চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে'[৬২] বলে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু এই উপন্যাসে বন্দীর কারাভিজ্ঞতা অনুপস্থিত। অতীত স্মৃতিচিত্র উপন্যাসের বিষয় বস্তু, বর্তমান কারাগার নয়।

'প্রধূমিত বহ্নি' (১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৭) উপন্যাসটির পটভূমিকায় লেখক মণীন্দ্র রায় লিখেছেন—

'গ্রেপ্তার হয়ে জেলের মধ্যে কাজের অভাবে মন যখন হাঁফিয়ে উঠেছিল কিছু একটা করবার জন্যে তখন টুকরো টুকরো সেই সব স্মৃতি (আগষ্ট বিদ্রোহ) অনুভূতি ও উপলব্ধি একত্রে গেঁথে এই গল্প রচনা করি।' অর্থাৎ 'প্রধূমিত বহ্নি' আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাস, কারাজগতের পটভূমিকায় নয়।

ছোট গল্প

কারাস'হিত্যের অন্তর্গত ছোটগল্পগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনায় অনবদ্য। নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'জেল-ফেরৎ',[৬৩] অসমঞ্জস মুখোপাধ্যায়ের 'কারামুক্তি,'[৬৪] সুবোধ ঘোষের 'দণ্ডমুণ্ড'[৬৫] এবং কৃষ্ণা হাতি সিং-এর 'ছায়ামিছিলে'র[৬৬] (এই গল্পসংকলনটিতে অনুবাদকের নামের উল্লেখ নেই, আমরা ছোটগল্পের আলোচনায় গ্রন্থটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি) গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'জেল-ফেরৎ' চরণ নামে এক কৃষকের গল্প। গল্পটি নায়ক প্রধান। চরণের প্রথম পর্য্যায়েব কারাবাস ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবনকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কারাবাসকালে চরণের স্ত্রী স্বামীর আশ্রয় প্রার্থীনি হলেও চরণ তখন জেলে। গল্পটি বিয়োগান্ত। কারাজগৎ এই গল্পের মূল বিষয় নয়। কাহিনীর একটি অংশ চরণের কারাবাস। চরণের প্রথম কারাবাসের দেড়বছর দাম্পত্য বিচ্ছেদের কারণ।

লেখক গরীব কৃষক সমাজ থেকে চরিত্র তুলে এনেছেন এবং তার দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে বাস্তব করে তুলেছেন।

'কারামুক্তি'র গঠনরীতি অভিনবত্বহীন। সাতকড়ির দুঃখময় জীবনকে কেন্দ্র করে গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি। হতভাগ্য সাতকড়ির কারাদণ্ড ও মৃত্যু, সেইসঙ্গে পুত্রের হাহাকার গল্পটিকে সর্বাংশে করুণ করে তুলেছে। রচনারীতি বিবৃতিধর্মী, চিত্রসজ্জা স্বল্প। বাক্যবিন্যাস এবং শব্দচয়নে নতুনত্ব নেই, অবয়ব সংস্থানে ছোটগল্পের কাঠামো বর্তমান।

'দণ্ডমুণ্ড' কারাসাহিত্য ধারায় একটি আদর্শ গল্প। গল্পের প্লট, চরিত্র, ঘটনা এবং পরিণতি কারাজগতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। রূপরীতির আলোচনায় দণ্ডমুণ্ডকে তিনটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—(১) গল্পের খণ্ড কাঠামোর মধ্যে অখণ্ড মানবমনের আস্বাদ ও মানুষের অন্তর্জীবনের অলক্ষিত

রূপরেখাটিকে ফুটিয়ে তোলা (২) প্রাত্যহিক একঘেয়েমি থেকে একটু স্বতন্ত্র মুহূর্ত সৃষ্টি করা (৩) লেখক সুবোধ ঘোষের শিল্পনৈপুণ্য ও অসাধারণ গদ্যভাষা।

গল্পের সুরুতে লেখক রাজভক্ত ও সৎ, নির্ভীক ও একরোখা সিপাই অনুকূল গোঁসাই-এর ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস এবং মানসিক কাঠামোটি তুলে ধরেছেন এক ভয়ংকর রাতে অনুষঙ্গে। রাতের অনিবার্য নির্মমতার সংগে অনুকূলের সুদৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা যেন কোনো এক অজ্ঞাত ট্রাজিক পরিণামের পটভূমি রচনা করেছে।

অনুকূল সৎ, সুশৃঙ্খল, কর্তব্যপরায়ণ এবং কঠোর। এই কাঠিন্য আরোপিত নয়—মজ্জাগত, তার সমগ্র জৈবসত্তার সংগে উপরোক্ত চারিত্রিক লক্ষণগুলি সম্পৃক্ত। অনুকূলকে কেন্দ্র করে কারাজগতের অত্যাচার, নির্যাতন, নীতি-দুর্নীতির যে বিশেষ আবহাওয়াটি তৈরী হয়েছে সেখানে অনুকূলের চারিত্রিক দৃঢ়তার সংগে নিয়ম লঙ্ঘনকারী দুর্নীতি পরায়ণ জেলকর্মচারীর বৈপরীত্য অনিবার্য। সেই অনিবার্যতা এবং রাতের নির্মমতা এই দুটি অনুষঙ্গ গল্পের আলাপ অংশ। এর পর শেষ রাতে নিচ্ছিদ্র কঠোরতার মধ্যে অসহায়া গোপীর মা জেল চত্বরে প্রবেশ করে। ফাঁসি দণ্ডে দণ্ডিত গোপীর প্রাণহীন দেহটিকে ডোম তার মা-য়ের কাছে পৌঁছে দেয়। অপরাধী গোপীর লাশ যেন ফাঁসির পরেও অপরাধী হয়ে উঠে তার অপসারণ রোধ করছে। মৃতদেহকে কেন্দ্র করে একদিকে গোপীর মা অন্যদিকে জেল কর্মীদের হাল্কা কথাবার্তা, মায়ের স্নেহ-যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত যখন মৃতদেহের অপসারণকে অনিশ্চিত করে তুলেছে সেই সময় অনুকূলের উপস্থিতি গল্পের সম্ভাব্য পরিণতিকে সুতীক্ষ্ণ করে তুলেছে। অনুকূল তথাকথিত প্রশাসনিক শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে শবদেহকে গোপীর মা'র সঙ্গে বয়ে নিয়ে চললো। আর—

'অনুকূলের রাইফেলটা তুলে নিয়ে হাবিলদার কম্পাউণ্ডারকে ফিস ফিস করে বললো—ডিসমিস হবে অনুকূল নিশ্চয়;

কম্পাউণ্ডার—তবু ভাল, জেল যেন না হয়।'

জেলার, ওয়ার্ডার, সিপাই, কম্পাউণ্ডার, হাবিলদার এবং আসামী জেল-জগতের এই সব মানুষকে কেন্দ্র করে 'দণ্ডমুণ্ডে'র আখ্যান গঠিত হয়েছে। কারাজগতের একটি বিশেষ মুহূর্ত, একটি বিশেষ নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে গল্পের আদি ও অন্ত সুনির্দিষ্ট।

অনুকূলের কাঠিন্যের মধ্যে সুরু থেকেই কর্তব্যনিষ্ঠার তীব্রতা ছিল ; কিন্তু কোনো অমানবিক বা দুর্নীতির বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না। যে কর্তব্যবোধ তার দীর্ঘ জেলজীবনে শৃঙ্খলা ও নীতিজ্ঞানের মধ্যে লালিত হচ্ছিল সেই কর্তব্যবোধেই গোপীর মার অসহায় ও করুণ অবস্থার জন্য অনুকূলকে বিচলিত করেছে। তার নীতিজ্ঞানের কাঠিন্য মানবতার কাছে পরাজিত। তাই কারাশৃঙ্খলার বিধিনিষেধ অমান্য করে অনুকূল গোপীর লাশকে জেল ফাটকের বাইরে ফেলে দিয়েছে।

গল্পের উপস্থাপনরীতি থেকে মনে হয় লেখক একটি তির্যক প্রশ্ন তুলেছেন মানুষের দণ্ডমুণ্ডের নিয়ন্ত্রক শক্তি কে? নির্মম কারাব্যবস্থা না মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ?

সুবোধ ঘোষের বাক্‌রীতি প্রশংসনীয়। উপমা, সংকেত, ইডিয়ম সৃষ্টি ও শব্দার্থের ব্যঞ্জনা মূল্যবান রত্নের মতো। আমরা কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। জেল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

'সেকেলে পাঁচিলটা শুধু অটুট আছে। অজগরের পাকের মত।' বা 'রতন কম্পাউণ্ডার বলে—কলির কুম্ভীপাক।'

ওয়ার্ডার প্রসঙ্গে বলেন—

'রোগা রোগা ওয়ার্ডার, চিঁড়িতনের গোলামের মত জবরজং পোষাক। পিট্টিবিদ্যায় কী মজবুত হাত। ঝড়ের মত চড়—ঘুসি চালায়, হাতের গাঁট্টাগুলি লোহা হয়ে গেছে।'

জেলখানার ফাইল প্রসঙ্গে—

'কয়েদ, সাজা, মুক্তি। চাকুরী, পুরস্কার, পেন্সন, ভাতা ও ছুটি—ভবলোকের যত শুভাশুভ গচ্ছিত আছে ঐ ফাইলের পাতায় পাতায়।'

ফাঁসির আগের রাতের বর্ণনায়—

'আজকের রাতটা ভয় করার মতই। অন্ধকারটা যেন আজ হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এমনই নিরেট। ঝড়ের আলোতে জেল ফটকের গরাদগুলো চকচক করছে অতিকায় হাঙরের দাঁতের মত।'

বা 'কার্তিক মাসের রাত, তার ওপর কুয়াশার ঘোর। ফর্সা হতে অনেকক্ষণ। শিশিরের ফোঁটা ঝরে পড়ছে বটপাতা থেকে। ফটকের কার্ণিশ হিমে ভিজে উঠেছে। এখনও কাকেরা নেই, নেশা করে যেন ঘুমিয়ে পড়ে সব। আজ সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা কালাপানির বাষ্প থমকে রয়েছে।'

কৃষ্ণা হাতি সিং এর 'ছায়ামিছিল' অনূদিত গ্রন্থ। লেখিকা নেহরু পরিবারের

আলেখ্য 'কোন খেদ্ নাই' গ্রন্থটি রচনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। 'ছায়ামিছিলে' সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কারাবাসের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে রচিত বারোটি সত্যমূলক গল্পের সমষ্টি 'ছায়ামিছিল'। 'জেনানা-ফাটকে'র মত এখানে নারীর চোখ দিয়ে বারোজন নায়িকাকে দেখা হয়েছে। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রাজনৈতিক বন্দী বৃদ্ধা-মাতাজী, স্বামীহন্তা দুর্গা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গণিকা মলি, বিকৃতমস্তিষ্কা সবিতাদেবী, অসহযোগী বন্দিনী চিত্রা, প্রৌঢ়ানারী ফতিমার দুর্বিষহ জীবন, সন্ত্রাসবাদী মীনা-এমন বিচিত্র চরিত্রের চিত্রসম্ভার লেখিকা উপহার দিয়েছেন। চরিত্রগুলিকে মানবমনের এক একটি প্রবৃত্তির এবং আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে আঁকা হয়েছে। ভালো-মন্দ, সুস্থ-অসুস্থ, অপরাধী-নিরপরাধ এমন বিভিন্ন চরিত্রের আশ্চর্য চিত্রশালা 'ছায়ামিছিল'। চরিত্রগুলির জেল-প্রবেশের পূর্ব ইতিহাস এবং বর্তমান জেল-জীবনের বর্ণনা দুটি দিকই লেখিকা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ চরিত্রগুলির আচরণ জেলজগতের মধ্যে হলেও লেখিকা তাদের পূর্বজীবনের দিকটিকেও তুলে ধরেছেন। কারাজগতের বিচিত্র নারী চরিত্রগুলি তাদের নীচতা, ক্ষুদ্রতা কখনও বা মহানুভবতা নিয়ে উপস্থাপিত হলেও জেল-জগতের গ্লানিময় পরিবেশ যেভাবে বন্দিনীদের অসামাজিক ও অমানবিক করে তোলে কৃষ্ণা হাতি সিং সেই দিকগুলিকেও সচেতন ভাবে গল্পে স্থান দিয়েছেন।

ঘটনা ও চরিত্রে সাহিত্যগত দিক ছাড়াও একটি বাস্তব দিকও আছে। চরিত্রগুলি ব্যক্তিগত জেলজীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লেখা। সত্য ঘটনায় সামান্য বর্ণ সংযোগ ঘটলেও গ্রন্থ পাঠ কালে মনে হবে চরিত্রগুলি রক্তমাংসের জীবন্ত অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একই জেলে বারোটি বিভিন্ন চরিত্রের এক সমাবেশ জেল জগতের বন্দী-সমাজকে এক লহমায় অনুভব করার দর্পণ। বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ গল্পগুলির গতিশীল পরিণামী শক্তি প্রতিটি নায়িকার মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জগৎটিকে পূর্ণাঙ্গ করেছে।

গল্পগুলি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় বর্ণিত। সমাস-সন্ধির কাঠিন্যে শব্দবিন্যাস দুরূহ হয়ে ওঠেনি। সর্বপ্রকার জটিলতামুক্ত সহজ এবং মনোজ্ঞ ভাষা আলোচ্য গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ।

প্রবন্ধ

কারাজীবন এবং কারাজগতকে কেন্দ্র করে এক ধরণের সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। প্রবন্ধধর্মী এই রচনাগুলি অনেকক্ষেত্রেই নীরস তথ্য মাত্র, সাহিত্য নয়। তবু কারাসাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে এজাতীয় প্রবন্ধের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

নিবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। প্রতিটি নিবন্ধে জেলজগতের অত্যাচার ও অবিচারকে বিশেষ বিশেষ দিক থেকে দেখা হয়েছে। যেমন কয়েদি, কয়েদখানা, জেলচত্বর, জেলার, ওয়ার্ডর, খাদ্য, পরিশ্রম, নির্য্যাতন ইত্যাদি। আবার এমন কিছু প্রবন্ধ আছে যেখানে কারাগৃহকে কেন্দ্র করে স্বদেশীদের উদ্দেশ্য করে আদর্শ জীবনদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

আমরা রূপরীতির নিরিখে প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করছি :—

(১) **ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ রচনা**

'কয়েদীর আকাশ' ('পরিচয়'—জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ সালের গোপাল হালদার সংখ্যায় প্রকাশিত) ১৩৩৪ সালে প্রেসিডেন্সী জেলে লেখা। 'আকাশ' বলতে লেখক গোপাল হালদার কয়েদীর মনোজগৎকে বুঝিয়েছেন, যে মন উচু সুরে বাঁধা। এজন্য সূক্ষ্ম অনুভূতির তীব্রতা নিবন্ধটিকে অন্তরঙ্গ ও রসগ্রাহী করে তুলেছে—

'যখন সেই অঙিনাটুকুর মধ্যে আমি এসে দাঁড়াতাম কল থেকে আঁজলা করে জল পান করবার জন্য, দেখতাম ওপরের আকাশ আর কয়েক হাত ফাঁকা সেই জায়গাটুকু, তখন আমার বুক থেকে বেরোত এক অপূর্ব প্রার্থনা—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে! আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম—ওই আকাশে আর আঙিনায়!'[৩৭]

নিবন্ধটির অন্যতমগুণ ভাষার প্রসাধনকলা। আত্মরোমন্থনের সুরে এক বন্দীর কাছে বদ্ধ জেল জীবনে খোলা আকাশটুকু মুক্তির প্রতীক—

'আকাশ আর প্রশস্ততাতে আমরা মুক্তির স্বাদ পাই—যে মুক্তি মানুষের অনাদিকালের কামনা। কেন সে মুক্তি মানুষের মনে কোন্ আত্মীয়ের কথা জাগিয়ে তোলে?'

আকাশকে কেন্দ্র করে বন্দীর অনর্গল স্বগতোক্তি আপেক্ষিক ভাবে ছোটগল্প মনে হলেও আসলে 'কয়েদীর আকাশ' বন্দীমনের মুক্তিসংগীত।

(২) **তথ্যভিত্তিক ও ভাষ্যমূলক রচনা—**

ক. 'আন্দামান—ফেরতের চিঠি'—(লেখকের নাম নেই)—সাপ্তাহিক পত্র 'বিজলী'—১ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ১২চৈত্র, শুক্রবার, ১৩২৭ সাল, পৃ. ৩ :—

'·· কমিশনের মুখ দিয়ে একটা ধর্মকথা ফস্‌কে বেরিয়ে পড়েছে। The true aim of the settlements should be reformation of the inmates. কয়েদীদের ভাল করাই দ্বীপান্তরে পাঠানর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সাধু, সাধু, কিন্তু সেই ভাল করবার ব্যবস্থাটা কি? · এমন জায়গায় কয়েদীদের আড্ডা করা উচিত, যেখানে তাদের খাটিয়ে লাভ হতে পারে। এ লাভটা কার?—কয়েদীর নয়, সরকার বাহাদুরের। কেননা কর্তা বেশ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—A prisoner in jail has no right or claim to be paid for his labour.'

খ. 'কালাপানির কয়েদী'—(লেখকের নাম নেই)—'বিজলী' পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৩০শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩২৮ সাল, পৃ ৬ :—

'·····চুণো পুঁটি থেকে আরম্ভ করে বড বড় রুই কাতলা পর্যন্ত সবাই হাঁ করে বসে আছেন ঘুস খাবার জন্য। যে যত ঘুস দিয়ে কর্তাদের পেট ঠাণ্ডা রাখতে পারে সে তত কাজের লোক। আর সেখানে কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কাজে কাজেই দু দশবার সয়ে সয়ে যখন কয়েদীর মেজাজ বিগড়ে যায় তখন তারা খুনখারাপি করে বসে। কর্তারা তাদের ফাঁসিতে লট্‌কে দিয়েই নিশ্চিন্ত। কয়েদীর প্রাণ, টাকায় আঠার গণ্ডা।'

গ. 'ভারতের কারাগার'—ডাক্তার সত্যপালের অভিজ্ঞতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, সোমবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ :—

'কয়েদীদের প্রায় সবই অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন। সাবান ব্যবহার নিষিদ্ধ, শিখ ছাড়া আর কাহাকেও তেল দেওয়া হয় না। দাঁতনও কেহ ব্যবহার করিতে পায় না।······রাজনৈতিক বন্দীগণকে কাপড় কাচিবার জন্য যে সাজিমাটী দেওয়া হয়, উহাতে নাকি কাপড় আরও ময়লা হইয়া যায়।'

ঘ. 'জেলের কথা'—(সম্পাদকীয়)—'আনন্দবাজার পত্রিকা', নবপর্যায়, ২য় বর্ষ, ১৪ই কার্তিক, ১৩৩০ :—

'……অপরাধীর স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া, তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়া, তাহার মনে ভীতি উৎপাদন করিলে সে ভবিষ্যতে আর অপরাধ করিবে না, ইহাই যদি জেলের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, একথা বলিতেই হইবে। কেননা বর্তমান ব্যবস্থায় কারাগার হইতে ফিরিয়া বন্দীদের প্রকৃতি আরও বেশী অপরাধ-প্রবণ হইয়া উঠে।'

ঙ. 'হুগলী জেলার পুরাতন প্রসঙ্গ'—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরত্ন ; 'সমাচার', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৮ :—

'…পূর্বে হুগলী জেলে কাঁচা খাদ্য (রান্না করা নয়) কয়েদীদিগকে দেওয়া হইত। এই নিয়ম ১৮৩৬ সালে হয়। …১৮৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে রান্না খাবারের বন্দোবস্ত হয়।'

চ. 'বাঙ্গালার জেলখানা'—(সাময়িক প্রসঙ্গের অন্তর্গত), 'মাসিক বসুমতী', ১২শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪০ ; পৃ ৮৫০ :—

'১৯৩২ অব্দের বাঙ্গালার সরকারী জেল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্ট পাঠে মনে হয়, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে কয়েদীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য আধুনিক অবস্থানুযায়ী যে সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এ দেশের জেল-ব্যবস্থা এখনও তাহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।'

ছ. 'আন্দামানে অনশন'—(সাময়িক প্রসঙ্গের অন্তর্গত), 'মাসিক বসুমতী, ১৬শ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃ ৭৩৪—৭৩৫ :—

'…আন্দামানের বন্দীদিগের শতকরা ৯০ জন বাঙ্গালী। 'ভূ-স্বর্গ' আন্দামানে বন্দীরা স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা জীবনপাত করিবার জন্য প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তিন সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল, সে অনশন বন্ধ হয় নাই।…বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডল…বাঙ্গালারই অন্নজলে পুষ্ট, তাঁহারা বাঙ্গালার বন্দীদিগকে বাঙ্গালার কারাগারে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া শোচনীয় বিয়োগান্ত ব্যাপারের পথ বন্ধ করুন। সমগ্র দেশ একান্ত মনে তাঁহাদের কাছে এই দাবী জানাইতেছে।'

জ. 'রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি'—(সাময়িক প্রসঙ্গের, অন্তর্গত), মাসিক বসুমতী ১৬শ বর্ষ, মাঘ ১৩৪৪, পৃ ৬৪৭-৬৪৮—

'…কারাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রকার অভিযোগ শুনা

যায়। উহা যে বস্তুতান্ত্রিকতাহীন, ইহা খাজা সার নাজিমুদ্দীন স্বীয় অভিজ্ঞতাবশে বলিতে পারেন কি ? কারা সম্বন্ধে আমূল পরিবর্তন বর্তমান সভ্যযুগের কাম্য। গণতন্ত্রশাসিত দেশসমূহে কারাব্যবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এ দেশের যে সকল কারাগারে মধ্যযুগের ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে, তাহা রহিত করিবার আশু ব্যবস্থা দেশবাসী দাবী করিতেছে।'

(৩) যুক্তি ও বিশ্লেষণধর্মী রচনা

ক. 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'—অরবিন্দ ঘোষ—'ভারতী', ৩য় সংখ্যা, ৩৩শ খণ্ড, আষাঢ় ১৩১৬, পৃ ১৫১-১৫৭ :—

' যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোন অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান; আলিপুরে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা। আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বারমাস কাটাইলাম।'

খ. 'স্বরাজের পথ—কারাগারে'—মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী—'বাঙ্গালার কথা', ১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ :—

'.. সকলেই জেলে যাইতে পারিলে বা গবর্ণমেণ্টকে আমাদের মতে আনয়ন করিতে পারিলে স্বরাজ মিলিবে। সুতরাং আমাদের কারাবাসে গবর্ণমেণ্ট খুসীই হউক বা বাতিব্যস্তই হউক, কারাগারই আমাদের পক্ষে একমাত্র নিরাপদ ও সম্মানের স্থান।'

গ. 'জেল ভর্তি'—চিত্তরঞ্জন দাশ—'বাঙ্গালার কথা', ১ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ :—

'.. স্বরাজের চেয়ে বড় জীবনে আর কিছুই নাই, থাকতেই পারে না। এমনি করে স্বরাজের জন্য এতটা ব্যাকুলতা জাগলে আমরা চাইব আমাদের কারাগারের দরজা ভেঙ্গে বেরুতে—আমাদের জাতীয় জীবনযাপনকে স্বাধীন মুক্ত করে দিতে। এই আকাঙ্ক্ষা যার মনে জাগবে—এই আগুণ যার প্রাণে জ্বলবে, তাকে ত ইংরাজের কারাগারে ঢুকতেই হবে।'

ঘ. 'জেলের ভয়'—হেমন্তকুমার সরকার 'বাঙ্গালার কথা', ১ম ভাগ, ১১ সংখ্যা, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ :—

'. স্বরাজ লাভের তাই প্রথম পরীক্ষা জেলযাত্রা। জুজুর ভয় একবার ভাংলেই, এ পরীক্ষায় পাস করলেই—আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন আমরা যা চাইব তাই মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।'

ঙ. 'হিজলী হত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ'—'জয়শ্রী' পত্রিকা, ৭ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ, কার্তিক ১৩৩৮, পৃ ৫৯২-৫৯৪ :—

'...প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা প্রজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাহাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি? এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।'

চ. 'কারাবন্ধন'—সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র—'প্রবাসী', পৌষ ১৩৫৩, পৃ ২৭৬-২৮০ :—

'...জেলগুলি শুধু আটক রাখবার জায়গা না হয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র হওয়া উচিত। তাহলে অনুসন্ধানের সুযোগ যথেষ্ট বেড়ে যাবে। সমাজের পক্ষে সে ব্যবস্থা কল্যাণকরই হবে।'

ছ. 'কারাসাহিত্য'—ডঃ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ, ১ম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬৯ :—

....'বিপ্লববাদের অনিবার্য গৌণফল (bye-product) হইয়াছে কারাবরণ। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সব কয়টি স্বপ্নবিভোর তরুণপ্রাণ জেলখানার নিরাপদ আশ্রয়ে সংরক্ষিত হইয়াছে।.. ইহাদের চিন্তাধারাকে নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়াছে, ইহাদের রক্তের নেশাকে সাহিত্যরচনার পথে আত্মনিষ্ক্রমণের অবসর দিয়াছে।'

উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন রীতিতে লেখা। অধিকাংশ লেখকই কারা-জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য, দুঃসহ যন্ত্রণা এবং কারাব্যবস্থার নানা অমানবিক দিক তুলে ধরেছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় উপস্থাপন রীতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকায় এগুলিকে আমরা কারাকেন্দ্রিক প্রবন্ধের অন্তর্গত করেছি।

৭

অনুবাদ

বাংলা কারাসাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে কিছু বিখ্যাত বিদেশী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থগুলির লেখক

সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, বিপ্লবী এবং দেশনায়কগণ আছেন। এগুলি বাংলা কারাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং কারাসাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছে।

অনূদিত গ্রন্থগুলির তালিকা :—

(১) **জীবনীধর্মী** :—

প্লেটো—"Trial and death of Socrates"

"সক্রেতিসের বিচার ও মৃত্যু"-অনুবাদক : সুধাকান্ত দে, ১ম সং ১৯৭১।

(২) **ইতিহাসধর্মী কাহিনী** :—

(ক) Chambers Miscellany—'The little Captive King'

"কারাস্থবালরাজ"

অনুবাদক : মাধব চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত। ১ম প্রকাশ ১২৯৪ সাল।

(খ) সুভাষ চন্দ্র বসু—'Indian Struggle'

"ভারতের মুক্তি সংগ্রাম"

১ম ও ২য় খণ্ড।

প্রথম খণ্ডের অনুবাদক : গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ম সং—মাঘ ১৩৭৩

দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদকবৃন্দ :—গৌরাঙ্গ বন্দোপাধ্যায় ও বিমলেন্দু সেনগুপ্ত

১ম সং—বৈশাখ ১৩৭৫

(৩) **কারাস্মৃতি**

ক. মহাত্মা গান্ধী—'কারাকাহিনী'

মূল পুস্তকটি গুজরাতী ভাষায় লিখিত, হিন্দী সংস্করণ থেকে অনাথবাবু বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

অনুবাদক : অনাথনাথ বসু

১ম সং—১৩২৯

খ. মহাত্মাগান্ধী—'য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা'।

অনুবাদক : সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত; ১ম সং ১৯৩২

গ. জওহরলাল নেহরু—'Prison Land and peeps from prison window'

'কারাজীবন'—অনুবাদক : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ১ম সং—১৯৩৪।

ঘ. জওহরলাল নেহরু—'আত্মজীবনী' (বাংলা অনুবাদ)

অনুবাদক : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ; ১ম সং—১৯৩৭।

ঙ. মহম্মদ্ জাফর থানেশ্বরী—'তাওয়ারীখ-ই-আজিব'

(মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় লিখিত)

'আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী'—অনুবাদক : মওলানা হাছান আলী ; ১ম সং-১৯৬৩।

(৪) <u>উপন্যাসধর্মী কারাস্মৃতি</u> :—

ক. ভিক্টর হুগো—'ফাঁসির আগের দিন' (বাংলা অনুবাদ)

অনুবাদক : হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত ; ১ম সং—১৯৫০

খ. জুলিয়াস ফুচিক—'ফাঁসীর মঞ্চ থেকে' (বাংলা অনুবাদ)

অনুবাদক : অশোক গুহ ; ১ম সং-১৯৭৩

(৫) <u>গল্প</u> :—

লিও টলস্টয় : 'What for এবং The divine and the Human or Three More Deaths'

(ইংরেজী ভাষা থেকে এই দুটি গল্প একত্রিত করে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে)

'বিপ্লবের আহুতি'—অনুবাদক : বিনয়কৃষ্ণ সেন, ১ম সং—১৩৩৫

(৬) <u>ডায়েরি</u> :—

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—'রুদ্ধকারার দিনগুলি'।

(অনুবাদকের নাম নেই) ; ১ম সং—১৯৪৬

(৭) <u>চিঠি</u> :—

ক. 'ফ্রান্সিস বেকনের পত্র' (বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী)

অনুবাদক—মাখনলাল রায় চৌধুরী

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা, মাঘ ১৩৫৬, পৃ ১০৪-১০৫

খ. আর্নেষ্ট টলার—'কারাপ্রান্তর থেকে',

(অনুবাদকের নাম নেই), ১ম সং—১৯৫৬

বিভিন্ন রাজবন্দীর কারাস্মৃতির তুলনামূলক আলোচনা

বাংলাসাহিত্যে কারাসাহিত্য রচনার তিনটি দিক :

(১) যাঁরা ১৯০৫—১৯৪৭ কালপর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে কারাবরণ করেছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতার লেখ্যরূপ।

(২) এমন কিছু লেখক আছেন যাঁরা জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন নি; যে কোনো ধরণের সামাজিক অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন তাঁদের লিখিত কারাসাহিত্য।

(৩) আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁরা কারাসাহিত্য রচনা করেছেন—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নয়, পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় বা কল্পনায়।

কিন্তু বাংলা কারাসাহিত্যে আমাদের আলোচ্য কালপর্বে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী লেখক সম্প্রদায়। মূলতঃ ১৯০৫-১৯৪৭ এই সময়কালে যে কারাসাহিত্য রচিত হয়েছে তা রাজনৈতিক। ব্রিটিশ রাজশক্তির অত্যাচারের গৌণ ফল।

ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন কারায় রাজনৈতিক বন্দীগণের কারাস্মৃতির তুলনা কেবলমাত্র বিশেষ একটি রাজনৈতিক যুগের চরিত্র জানার পক্ষেই জরুরী নয়—বন্দীগণের রাজনৈতিক-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, উপস্থাপনার পার্থক্য, বিষয় নির্বাচনের পার্থক্য ইত্যাদির জন্যও জরুরী। কারাজগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এক একজন লেখক এক একভাবে দেখেছেন। কারাগারের নীচু-তলার দাগী কয়েদী, সাধারণ ও উচ্চপদস্থ জেল কর্মচারী, তাদের অত্যাচার, কারাগারে প্রচলিত দণ্ডব্যবস্থা এবং সহবাসী রাজবন্দীর প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃই বিভিন্ন। কারো কাছে বন্দীমন বেশি সক্রিয়, কারো বা জেলজগৎ। অনেকে জেলজগতের বস্তুসত্য অপেক্ষা অভিজ্ঞতা ও অনুভবে সমৃদ্ধ ভাবসত্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার এমন অনেক লেখক আছেন যাঁরা বন্দীদশার অভিজ্ঞতাকে কারাজগতে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। জেলজগতের সীমা অতিক্রম করে বাইরের মুক্তজীবন, আত্ম-পরিবার বা সমাজই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। কেউবা বন্দীজীবনের ভিতরেই প্রকৃতি, নারী, প্রেম ও যৌন কামনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, শিল্পচেতনা, শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ ও অপকর্ষবোধ, জীবন বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন আকারে পরিবেশিত হয়েছে। সেই পরিবেশনার তুলনামূলক সমীক্ষার রূপরেখা অঙ্কনই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

'নির্বাসিতের আত্মকথা'র (১৯২০) মৌল বৈশিষ্ট্য হলো ভাষা, ভাব এবং বিষয় বৈচিত্র্যের গতি। ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে বিপ্লবীশক্তির রণ-রীতি ও রণ-কৌশলের বস্তুনির্ভর বর্ণনা এখানে সক্রিয়। ব্যক্তিমনের অনুভূতিগুলি ছোট

ছোট ঘটনার ফাঁকে বিদ্যুতের মতো প্রবাহী হয়ে ওঠে। উপেন্দ্রনাথের রচনা ধারাভাষ্যের মতো কোনো একটি বিষয়কে দীর্ঘায়িত না করে তিনি ছোট ছোট বিষয়ের অবতারণা করেন। তাঁর গ্রন্থে কয়েদী প্রসঙ্গ বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। দণ্ড ব্যবস্থার নিখুঁত বর্ণনার আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি। কেননা কারাগারে নির্যাতন একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। এই গ্রন্থে কল্পনার অতিরঞ্জন নেই, বন্দীমনের কান্নাও অনুপস্থিত। উপস্থাপনায় তিনি গল্পরসের দিকে নজর রেখেছেন। দণ্ডব্যবস্থা, কয়েদী, বিপ্লবপন্থী, জেলার ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলিকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য তিনি অভিজ্ঞতাকে ঘটনাত্মক করেছেন। অথচ গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিঅহং তীব্র হয়ে ওঠেনি। তিনি যেন নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। এ জাতীয় লেখকসত্তার সংযুক্তি এবং বিযুক্তি কাহিনীকে গতিশীল এবং কৌতূহলপ্রদ করেছে। বিপ্লবীজীবনের দীক্ষা গ্রহণ থেকে সুরু করে কারাদণ্ড ও কারামুক্তির পূর্ণাঙ্গ আখ্যানটি নিটোল। জেলজগতের বস্তুসত্য তাঁর বর্ণনায় আপন প্রাণশক্তিরই অংশ হয়ে উঠেছে।

'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় রাজনৈতিক জগৎ অপেক্ষা বন্দীজগৎ বেশী সক্রিয়। বন্দীদের জেলবিরোধী কর্মসূচী এবং বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা থাকলেও উপেন্দ্রনাথ যেন সেই রাজনৈতিক জগৎ থেকে নির্লিপ্ত। একজন স্বদেশপ্রেমিক বিপ্লবী কেমনভাবে কারাজীবন অতিবাহিত করলেন সেই কথাই আত্মকথার সুরে উপন্যাসের ফ্রেমে ছোটগল্পের রং ও তুলিতে পরিবেশিত।

অন্যদিকে সমকালীন অপর রাজবন্দী অগ্নিযুগের নায়ক বারীন্দ্র কুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের কথা'য় (১৯২০) উপেন্দ্রনাথের মতো বর্ণনায় নির্লিপ্ততা নেই। ধারাবাহিক বর্ণনার ক্ষেত্রটি এতই তথ্যবহুল যেখানে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাব 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র মতো 'দ্বীপান্তরের কথা'কে গল্পরসে পরিণত করেনি। সেলুলার জেলের বর্ণনা, ব্যারীসাহেবের চরিত্র, দশম পরিচ্ছেদে কয়েদী জীবনের কয়েকটি চরিত্রের আলোচনা থাকলেও যে মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং শিল্পবোধ কোনো জীবনের অপ্রকাশিত রন্ধ্রগুলিকে উন্মুক্ত করে সেরকম চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা বারীন্দ্রের নেই। কয়েদীজীবনগুলি যে প্রকৃত অবস্থায় সেলুলার জেলে দিন যাপন করেছে লেখকের বর্ণনায় ততটুকু প্রাকৃতচরিত্রই স্থান পেয়েছে। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্ব, সংগ্রামপ্রবণতা ইত্যাদি মানবমনের গভীর ও অজ্ঞেয় জগতের ব্যাখ্যায় তিনি বিরত থেকেছেন। 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র কেজো ইতিহাসটুকু বাদ দিলে সাহিত্যের যে বোধ লক্ষ্য করা যায় বারীন্দ্র-

কুমার সেখানে ব্যর্থ। তাঁর ক্ষিপ্র সচেতন দৃষ্টি সর্বদাই জেলের আকস্মিক অংশে; তাকে অতিক্রম করে এমন কোনো মানসিক সংবাদ নেই যা দ্বীপান্তরের অসহায় মানুষগুলিকে চিরন্তন করতে পারে। মন ও বাক্যের মধ্যে কোনো সাহিত্যিক বোঝাপড়া না থাকলেও সত্যশিবের বোঝাপড়া আছে। এজন্য সেলুলার জেলের কয়েদী সমাজ যে দণ্ডভোগ করেছে বারীন্দ্রকুমার অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে তা তুলে ধরেছেন।

সমকালীন অপর রাজনৈতিক বন্দী শ্রীঅরবিন্দের 'কারাকাহিনী' (১৯২১) অনেক পরিণত এবং রসসমৃদ্ধ। এখানে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, মূর্ত ও বিমূর্ত— এই দু'জগতের কথাই স্থান পেয়েছে। তিনি জেল জগতের বর্ণনায় যেমন আগ্রহী, তেমনই আগ্রহী আত্মোপলব্ধির স্বরূপ ব্যাখ্যায়। সব কাজে ব্যবহার যোগ্য একটি পাত্র লেখককে দেওয়া হয়েছিল। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঐ বাসনটিকে কেন্দ্র করে ইংরেজ কারার নির্মম অথচ হাস্যকর বিধিব্যবস্থার কথা সরসভাবে বর্ণনা করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্য জেলজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চিত্রগুলিকে পরপর উপস্থাপিত করে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যজীবনই যে আসলে একটি কারাগার এমন একটি দার্শনিক উপলব্ধিতে পৌছানো।

'কারাকাহিনী' (১৯২১) তাই অরাজনৈতিক গ্রন্থ। এখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা লেখকের লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য কারা অভিজ্ঞতাকে একটি অদৃশ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া।

শ্রীঅরবিন্দ ১৩১৬ সালের 'সুপ্রভাতে' মাসিক কিংতে 'কারাকাহিনী' প্রকাশ করতে থাকেন। এর অনেক আগে থেকেই তিনি ধর্মচর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সে সংবাদ আমরা 'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী'তে পেয়েছি। 'কারাকাহিনী' ঈশ্বর জিজ্ঞাসার প্রথম স্বীকৃত কাহিনী। বারীন্দ্র যেভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং কারাচিত্রের অনুপুঙ্খ বর্ণনা বিশ্বস্ত ভাবে তুলে ধরেছেন অরবিন্দ সেখানে ইন্দ্রিয়াতীত অস্তিময়জগতে প্রবেশলাভ বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। বারীন্দ্র বস্তুসত্যের কথায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন; শ্রীঅরবিন্দ সেই বস্তু সত্যকেই ভাবসত্যে উন্নীত করেছেন চিন্তা-ভাবনা, ভাষা এবং সরস ব্যঙ্গের ইন্দ্রজালে। প্রসঙ্গত: 'কারাকাহিনী'র সঙ্গে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র তফাৎটুকু আলোচিত হতে পারে। 'কারাকাহিনী'তে যেমন কাহিনী বা গল্প অংশ প্রাধান্য পায়নি, উপেন্দ্রনাথের আত্মকথায় তেমনই ব্যক্তিমনের উপলব্ধি, অনুভব প্রাধান্য পায়নি। উপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য কারাঅভিজ্ঞতাকে 'ফিচার' ধর্মী

করা। এক কথায় অভিজ্ঞতার অবয়ব সৃষ্টি। দৈনিক পত্রের কলম-লেখকের মতো তিনি আকর্ষণীয় করেছেন তাঁর কাহিনীকে। খুঁটিনাটি বিবরণ, চিত্ররস ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রহস্যগন্ধী গল্পকথন এবং ভাষায় আলংকারিক সৌকুমার্য বক্ষ্যমান রচনাকে ভ্রমণ কাহিনীর মতো চিত্তাকর্ষক করেছে। 'কারাকাহিনী' সেই অর্থে জনপ্রিয় নয়। এখানে শ্রীঅরবিন্দ ক্রমাগত আপন অনুভূতিময় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলায় উৎসুক। জেল জগতের বর্ণনায় যখন তিনি কৌতুকরসের অবতারণা করেন তখন গভীর শৈল্পিক গাম্ভীর্য কথাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত 'ডেটিনিউ' (১৯৩৯) গ্রন্থে এক স্থানে বলেছেন—

'আমাদের কবি বলিয়াছেন—'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।'—জেলখানায় আসিয়া এ-জিনিসটির প্রকোপ বড় বেশি দেখিতেছি।' নিরালা একাকীত্ব এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় শক্তি। 'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা' যখন অমলেন্দুর অন্তরের কথা তখন আমাদেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, স্মৃতি ও কল্পনার জাল বোনাই এ গ্রন্থের লক্ষ্য। 'ডেটিনিউ'-এ রাজনৈতিক চিন্তার স্তর বহিরাবরণ মাত্র। অন্তর্জগতে এসেছে বিভিন্ন রসের সমাবেশ এবং তার সংঘাতে এক অতৃপ্ত লেখকমনের যন্ত্রণা। রুদ্রকে সুন্দর করতে গেলে যে স্থির ধারণাশক্তির প্রয়োজন সে পরীক্ষায় অমলেন্দু উত্তীর্ণ। এ'গ্রন্থের বড় গুণ সংগীতধর্মিতা, যে সংগীত ধর্ম 'কারাকাহিনী'তে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। গ্রন্থে অনেক চরিত্র এসেছে, অবশ্য লেখক চরিত্রগুলিকে কোনো স্থায়ী পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। ফলে উপন্যাসের কাহিনী-আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না। গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখক অমলেন্দু ও দণ্ডিত অমলেন্দু সমান্তরালে স্মৃতিরোমন্থন করে চলেছেন। ফল হয়েছে একদিকে ঘটনা ও তথ্যের মজুত উপকরণ অন্যদিকে তাকে ভাব ও সৌন্দর্যের পরিণত করার ক্ষেত্রে লেখকের শিল্পগত কোনো অস্বস্তি নেই। লেখকের কাছে কারাজগৎ বিশ্বসংসারের মতোই একটি নিত্যসত্য ; যে সত্য থেকে জীবনে সুখ-দুঃখ, নীচতা-উদারতা এমন কতদিক উঠে আসতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিগত জীবন মহাকাব্যের মতো বিশাল। তিনি নিজেই একজন ঘটমান ইতিহাস। তাঁর 'জেলে ত্রিশবছর' (১৯৪৮) গ্রন্থে পরাধীন অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসটি ব্যাপক ও সুগভীর। জেল অভিজ্ঞাতায় সহকর্মী রাজবন্দীদের প্রসঙ্গ এবং গোপন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে লেখক

অধিক মনোযোগী। অমানবিক কারাবিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, রাজবন্দীদের রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ে আলোচনা, উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারীদের সাংগঠনিক এবং ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ আলোচনা ত্রৈলোক্যনাথের লক্ষ্য।

গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বৈপ্লবিক জীবন নিষ্ঠা লেখককে অমলেন্দু দাশগুপ্তের মতো একাকীত্বের যন্ত্রণায় বিক্ষত করে নি। কর্মযোগী সন্ন্যাসীর মতো এই গ্রন্থে এক বিপ্লবীর বিচিত্র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ছবি এঁকেছেন তিনি। শিল্পীমনের অকারণ বিচ্ছিন্নতাবোধ ও একাকীত্ব 'কারাকাহিনী' এবং 'ডেটিনিউ'-এ যে ঐন্দ্রজালিক আবহ সৃষ্টি করে ত্রৈলোক্যনাথের অন্তঃপ্রকৃতি তেমন কাব্যিকছন্দে বাঁধা নয়; ফলে গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের ইতিহাস জেলজগতের বস্তুধর্মকে সুতীক্ষ্ণ করেছে। বস্তুধর্মিতা এবং বৈপ্লবিক সচেতনতা নৈষ্ঠিক ত্রৈলোক্যনাথকে স্মৃতি ও কল্পনার বিমূর্ত সুর সৃষ্টি থেকে বিরত রেখেছে। প্রকৃতি, নারী, প্রেম এ কারণেই ত্রৈলোক্যনাথের বর্ণনীয় বিষয় নয়। এক বিপ্লবীসত্তা লাভাস্রোতের মতো এখানে বহ্নি উদ্গীরণ করেছে। ফলে আগ্নেয়-গিরির আগুন বুকে নিয়ে জেলসমাজের অন্তঃপুরে সন্তর্পণে প্রবেশ করা লেখকের পক্ষে অসম্ভব। জেলজগতের পরিবর্তে ব্যাপক রাজনৈতিক জগৎ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিয়ন্ত্রিত করেছে জেল জীবনের ত্রিশটি বছরকে। ব্যক্তিগত রোজনামচার কোমলমাধুর্য গ্রন্থের স্থানে স্থানে থাকলেও আসলে তা তথ্যসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ, অনুভবের নিবিড় রসনির্যাস নয়।

'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' (১৯৪৮)—এর লেখিকা বীণা দাসের লক্ষ্য কারা-অভিজ্ঞতাকে শিল্পসত্যে পরিণত করা। ফলে বিষয় নির্বাচনে তিনি জেলজগৎকে বেছে নিয়েছেন। জেলসমাজ ও ব্যক্তিমন জীবনধর্মী এই আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু। রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা উপকাহিনীর মতো মূল কেন্দ্রের পরিপূরক বিন্দু। স্কেচ্ আঁকার মতো কারাজগতের চিত্রটিকে তিনি ছুঁয়ে গেছেন, ভেতরে প্রবেশ করেন নি। যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি জেলসমাজের অন্তর্নিহিত নির্মমতাকে জীবন্ত করে তোলে সেই শক্তি বীণা দাসের থাকা সত্ত্বেও শিল্পশ্রমের আলস্য আলোচ্য কারাস্মৃতিটিকে উপন্যাসসুলভ গভীর বিস্তৃত অথচ সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক করে তোলেনি। কয়েদখানা, নির্যাতন, উচ্চপদস্থ জেলকর্মচারী, সাধারণ কয়েদী-এ সব প্রসঙ্গ 'শৃঙ্খল-ঝঙ্কারে' নাতিদীর্ঘ বর্ণনায় পরিবেশিত হলেও 'আবার আসতে থাকে ক্লান্তি, ধীরে ধীরে অবসাদের মেঘ মনের মধ্যে জমে উঠে'—এ বোধ এত প্রবল যে মেঘ সরিয়ে জেল দেখার চোখ সৃষ্টি হয়নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'শৃঙ্খল-ঝঙ্কার' অথচ শৃঙ্খলের রুদ্র সংগীত ভৈরবী রাগিণীতে বেজে ওঠেনি। যে সংগীত বেজেছে কমলা দাশগুপ্তের 'রক্তের অক্ষর' (:৯৫৫) গ্রন্থে।

• কমলা দাশগুপ্তের লক্ষ্য ইতিহাসের আলোকে বন্দীজীবনের চিত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করা। লেখিকার মনোভঙ্গী রাজনৈতিক দিক থেকে নিত্য ক্রিয়াশীল। তাঁর জীবন, জেল-জগৎ এবং অপরাপর সহযোগী বন্দিনীগণ সবকিছুই রাজনৈতিক চিন্তায় বিবর্তিত। এখানে বর্ণনীয় বিষয় শৃঙ্খলিত বীরাঙ্গণা'র অবরুদ্ধ জগৎ—

'অদ্ভুত এই ডেটিনিউ জীবন। জিনিসপত্রের অভাব নেই, খাবার কষ্ট নেই, তবুও কেমন যেন বদ্ধ জল, রুদ্ধ বাতাস। স্রোতহীন, আবর্তহীন জগত— একেবারে অপরিচিত এক ঘেয়ে।'

অথচ বীণা দাসের মতো কমলা দাশগুপ্তের রচনা স্রোতহীন আবর্তহীন হয়ে ওঠেনি। তাঁর স্মৃতিকথায় একদিকে যেমন কারার স্মৃতিটুকু, স্পর্শটুকু কথা বলে অনর্গল—তেমনই বীণা, শান্তি, কল্যাণী, জ্যোতিকণা, শোভারাণী লাবণ্য এমন অনেক বীরাঙ্গনার স্মৃতি খণ্ড অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ ক'তে তিনি ভোলেন না।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় কৃষ্ণা হাতি সিংয়ের 'ছায়ামিছিলে' (১৩৫৫) যে বিচিত্র সাধারণ বন্দীনারীর জীবনতরঙ্গ ওঠানামা করেছে তাদের মানসিক বিকৃতি ও কামনা, ঔদার্য ও প্রেম, কাঠিন্য ও কোমলতা লেখিকার অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণ শক্তির যে গভীর পরিচয় বহন করে সাধারণ নারীবন্দীর এমন বিচিত্র চিত্রসম্ভার 'রক্তের অক্ষরে', 'শৃঙ্খল ঝঙ্কারে' এমন কি 'অরুণবহ্নি' (১৯৫১) তেও নেই। যদিও নারীর চোখ দিয়ে বন্দী নারী সমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করার একটি খোলা ক্ষেত্র এই তিনজন নারী লেখিকার সম্মুখেই খোলা ছিল। তাঁরা রাজনৈতিক জীবনকে এবং গ্রহণযোগ্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে এতো গুরুত্ব দিয়েছেন যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অবরুদ্ধ ব্যক্তিমনের রুদ্ধকামনা, যন্ত্রণা, প্রেমানুভব ইত্যাদি জীবনধর্মের সত্যোচ্চারণে। কারাসমাজের ইতর-ভদ্র, মানুষ-পরিজন তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা এমন অনেক কথাই চিত্রিত হলো না এঁদের রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য।

স্পর্শকাতরতা এবং সংবেদনশীলতা আত্মকথার একটি বিশেষ শক্তি যা বিচ্ছিন্ন এবং নিরপেক্ষ স্নায়বিক অনুভূতিগুলিকে একত্রিতভাবে আমাদের বস্তুধর্মী

'অভিজ্ঞতা গ্রহণে সহায়তা করে। কারাজগৎ এমন একটি উদ্দীপক যা প্রাথমিক অবস্থায় সরল মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবেদনে পরিণত হয়।

প্রথমশ্রেণীর শিল্পী সরলতম অভিজ্ঞতার ধারকক্ষমতাকে সৃজনশীল সাহিত্যে পরিণত করেন জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায়। নিকুঞ্জ সেনের 'জেলখানা কারাগার' (১৯৫২) লেখকের মানসিক জগতে প্রাথমিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেও শিল্পীর জারকরস স্মৃতিকে নবতর সৃষ্টি সম্পদে পরিণত করেনি। জেলজগতে সাহিত্যউপাদান অপ্রতুল নয়। কয়েদী বা ওয়ার্ডার থেকে সুরু করে কয়েদঘর, খাদ্য ইত্যাদি এমন প্রচুর কাঁচামাল মজুত থাকে যা থেকে সহজেই আখ্যান রচনা করা যায়।

লেখকের স্মৃতিজগতে ঘটনাগুলির (কখনও বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা) স্তরীভূত রূপ কালক্রমে স্মরণকার্য সৃষ্টি করলেই আমরা তাকে স্মৃতিনির্ভর সাহিত্য বলতে পারি না। নিকুঞ্জ সেন অবশ্য অভিজ্ঞতার মূল উপাদানগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য যে সামর্থ্য বিষয়ের প্রত্যাহার এবং নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বিষয়বস্তুকে সাহিত্য করে তোলে নিকুঞ্জ সেনের সেই শক্তি থাকা সত্বেও তিনি তা কাজে লাগান নি।

গ্রন্থটিতে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা লক্ষ্য নেই। লেখকের রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা, সামাজিক জিজ্ঞাসা বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে ক্রিয়াত্মক আধারে প্রতিষ্ঠিত করা অথবা মনোজগতের গান রচনা করা—এমন কোনো লক্ষ্যই লেখকের নেই। জেলজগতকে তিনি সামগ্রিকভাবে দেখতে চেয়েছেন। কোনো একটি বিশেষ চরিত্র বা চিত্র ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য দানা বেঁধে ওঠে না। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন চিত্র, ঘটনা ও চরিত্রসম্পদ পাঠকের আন্তর্জগতকেও স্পর্শ করছে না কেননা উপস্থাপন রীতি গল্পাত্মক হলেও তা অতি-সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। জীবনের গভীর তলগুলি স্পর্শ করার শৈল্পিক যন্ত্রণা তিনি বোধ করেন না। রাজনৈতিক কয়েদী, সাধারণ কয়েদী, জেল কর্মচারী এমন অসংখ্য চরিত্রের বর্ণনা জীবন-পল্লীর মতো আলংকারিক বাক্-চতুর্যে সাহিত্যে পরিণত হতে চাইলেও লেখকের অতি-মিতব্যয়ী মনোভাব ছবি আঁকার পথ রুদ্ধ করেছে—

'আকাশের দিকে সকলে তাকাইয়া আছি। এই বুঝি বর্ষা নামে, এই বুঝি বারিপাত হয়। মেঘের পরে মেঘ শুধু জমিতেছেই, অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু, কৈ, বৃষ্টির তো নামগন্ধও নেই! দেউলীর

আকাশে বর্ষণ সম্ভবা ঘন কালো মেঘ! আমরা সকলে চাতকের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া আছি আকাশের দিকে, চাহিতে-চাহিতে ঘাড়ে ব্যথা ধরিয়া গেল।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার তাৎপর্যটি আলো আঁধারি নয়, বাক্য-গুলিতে প্রতীয়মান অর্থের আবেশ নেই বরং 'চাহিতে চাহিতে ঘাড়ে ব্যথা হইয়া গেল তবু বৃষ্টির নামগন্ধ নাই'—এজাতীয় সরলবাক্য উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাণীচন্দ লেখেন না। গ্রন্থের মাঝে মাঝে শিথিল বাক্য-বিন্যাস শিল্পধর্মকে বিপর্যস্ত করেছে। লেখক কয়েদী চরিত্রকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, জেলখানার অন্যান্য প্রসঙ্গ (কয়েদঘর, নির্যাতন, বন্দীমনের নিঃসঙ্গতা) হয়ে উঠেছে গৌণ।

কারাজগৎ বহির্ভূত দার্শনিক বা শৈল্পিক জিজ্ঞাসা (যেমন শ্রীঅরবিন্দের 'কারাকাহিনী'তে) এখানে সক্রিয় নয়। বন্দীমনের হাহাকারকে আলংকারিক করার চেষ্টা হাহাকারের স্বাভাবিকতাকেই ক্ষুণ্ণ করেছে। 'ডেটিনিউ'-এ একাকী-ত্বের যন্ত্রণা যতো সূক্ষ্ম এবং আন্তরিক 'জেলখানা কারাগারে' তার কোন পরিচয় নেই।

তবে একথা সত্য যে, রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদীদের সম্মিলিত পদক্ষেপে দেউলীজেলের দিনগুলি ব্যথা-বেদনায় যেভাবে মুখর ছিল তার চিত্রটি তুলে ধরেছেন একজন সৎ ও মহৎ দেশসেবক রূপে।

'জাগরী' (১৯৪৫) কাল্পনিক উপন্যাস হলেও এর চরিত্রগুলি রাজনৈতিক। বিলু, নীলু ও বাবা এরা সকলেই আগষ্ট আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেছে এবং বিলু, বাবা ও মা কারারুদ্ধ হয়েছেন। চরিত্রগুলি তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থার উপর দাঁড়িয়েই কথা বলেছে।

কারাস্মৃতি যে অর্থে আত্মস্মৃতিমূলক কাহিনীগুলিতে জেলজগতেব বিচিত্র মানুষগুলির স্মৃতিরোমন্থন করে নীলু ও বাবার স্মৃতি চিত্রণে সে সুযোগ কম। চরিত্র দুটি কারা অন্তরালে চিন্তাস্রোতে কারাপ্রাচীর অতিক্রম করে বহুবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক জিজ্ঞাসায় উপস্থিত। তারই ফাঁকে ফাঁকে একাকীত্ব, অশথ্ব গাছের ডগায় সিঁদুরে আকাশ, সেলের চুনকাম করা সাদা দেওয়াল, জেলের পলিটিক্স, ওয়ার্ডর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এদের কথা স্মৃতির পাতায় এসেছে।

লেখকের অভিপ্রায় কারারুদ্ধ একটি পরিবারের অখণ্ডতা কীভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্লিষ্ট হচ্ছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ। অর্থাৎ তাঁর বিষয়

ঠিক কারাজগৎ নয়—কারারুদ্ধ একটি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন পরিবারের মনোজগৎ। চরিত্রগুলি চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়ে যখন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাত্রা করে তখন তাদের স্মৃতিজগতে লক্ষণীয় হয় রাজনীতি, সমাজনীতি এবং জীবনানুভূতির সংশ্লেষগুণ। তাছাড়া এখানকার বন্দী চরিত্রগুলি জেলজগতের বর্তমানে দাঁড়িয়ে। তাঁদের অতীত রাজনৈতিক কর্মজীবনে জেল সমাজের বিভিন্ন চিত্রগুলি এজন্য কখনই অতীত স্মৃতি নয়, ঘটমান বর্তমানের অভিজ্ঞতা।

বাবা তাঁর বর্তমান কারা অবস্থান থেকে অপরাপর রাজবন্দী, কমিউনিস্ট বন্দীর উগ্রতা, গান্ধীবাদ, মার্কসবাদের পল্লবগ্রাহী কিছু বন্দী,—যোগাড়ানন্দ, ঝপট্টানন্দ, বেকুফানন্দ নামক লেখক চিহ্নিত রাজবন্দী এমন অনেকের কথাই চিত্রিত করেছেন।

আসল কথা, সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ব্যক্তিগত কারা অভিজ্ঞতাকে 'জাগরী' র বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ফলে উপন্যাসের বিষয় কাল্পনিক হলেও বিশ্লেষণগুণ বাস্তব নির্ভর। জেলজগতের বস্তুসত্য যেমন রাজনৈতিক তেমনি বন্দীদের আচারণ, সাধারণ কয়েদীজগতের নৈমিত্তিক জীবন, জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ওয়ার্ডার, সিপাহী জগৎ, বিভিন্ন সেলে অবরুদ্ধ বন্দীমনের কর্মক্লান্তি, একাকীত্ব, নীতিজ্ঞানভ্রষ্টতা এক অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় ভাবসত্যে রূপান্তরিত। এরই সঙ্গে সুপরিচিত রসজ্ঞান শিল্পীমনের অনুভব ও কল্পনায় কারাস্মৃতির বিমূর্ত ভাবপুঞ্জকে অনবদ্য কবিতায় পরিণত করেছে। স্মৃতিচিত্রণে এমনই সার্বভৌম শিল্প-নৈপুণ্যের প্রবর্তক সতীনাথ ভাদুড়ী।

'জাগরী' র সঙ্গে 'ডেটিনিউ', 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কিম্বা 'করাকাহিনী'র বিন্যাস ও সংস্থাপন প্রণালীর আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও এর অবয়ব-কৌশল সম্পূর্ণভাবে মৌলিক। কারাস্মৃতির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাহিনীর ক্রমিক সংযুক্তি থাকে না। খণ্ডকাহিনীগুলির সংযুক্তিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে কারাঅভিজ্ঞতার সামগ্রিক স্মৃতি। উপন্যাসের কাহিনী যেখানে অপরিহার্য অবয়ব—চাহিদায় পরিণতিমুখীন, সেখানে 'নির্বাসিতের আত্মকথা', 'কারাকাহিনী', 'ডেটিনিউ' সে চাহিদামুক্ত। 'জাগরী'র কারাস্মৃতি আপাতভাবে উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মতোই নিরাবয়ব, কাহিনীর চাহিদা অনুপস্থিত। তবুও 'জাগরী' স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড ঘটনায় যুক্ত মোর্চা নয়—চরিত্রগুলির চিন্তাস্রোতের ধারকতল একটি পরিবার, গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ কাঠামো এজন্য অনায়াসেই আত্মস্মৃতিমূলক কারা-গ্রন্থগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক জগৎ, ব্যক্তিজীবনের মনস্তত্ত্ব এবং

জীবনানুভূতির জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া 'জাগরী'কে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত করেছে—যা পূর্ব প্রকাশিত কারাস্মৃতিগুলিতে নেই।

বনফুলের 'অগ্নি'র (১৩৫৩) জ্যামিতিক ধর্ম চরিত্রের নিরিখে একমাত্রিক। অংশুমান কেবল কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, একস্বরা। কারাজগৎ অংশুমানকে প্রভাবিত করেনি। অংশুমান জেলে বসে থাকলেও তার দিবাস্বপ্নকেন্দ্র অস্তরা এবং 'জেলের প্রাচীর ভেদ করে দূর দূরান্তে অতীতে-ভবিষ্যতে আশা আকাঙ্ক্ষার কল্পলোকে।' অংশুমানের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বটুকু কারাস্মৃতির অন্তরায়। বদ্ধ জেলজীবনে থেকে অংশুমান অন্তরা ও নীহার সেনের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে—

'ইন্দ্রের বজ্রে, মদনের কুসুমশরে, নক্ষত্রের কিরণে, খদ্যোতের দীপ্তিতে, তপস্বীর তপস্যায়, প্রেমিকের প্রেমে, কবির প্রেরণায়, বীরের বীরত্বে বৃক্ষে লতায় জড়ে চেতনে অনুতে পরমানুতে সর্বত্রই আমার প্রকাশ'—অংশুমানের জীবনসত্য। ইলেকট্রিসিটির ইতিহাস পড়তে পড়তে সে জেলনিরপেক্ষ জীবনসত্যে বহুক্রমিক মনস্তত্ত্বে প্রবেশ করে। জেল কর্মচারী, সাধারণ কয়েদী, অত্যাচার, নির্যাতন, আহার স্বভাবতঃই কারাস্মৃতির অনুষঙ্গ থাকে না। 'জাগরী'র কারাজগৎ সমাজজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের গভীরতর মনস্তত্ত্বে প্রবেশ করলেও ঘটনা, চরিত্র এবং চিন্তাস্রোতের নিহিত শক্তি কারাজীবন ও কারাজগৎ।

'অগ্নি'র নায়ক শারীরিকভাবে কারারুদ্ধ হলেও মানসিক ভাবে সাধারণ সামাজিক জীবের মত আচরণ করে। অংশুমানের কারারুদ্ধ জীবন সম্পর্কে পাঠক-প্রত্যাশিত প্রাপ্তি অতৃপ্ত থাকে।

তারাশঙ্করের 'পাষাণপুরী'তে (১৯৩৩) একদিকে আছে রাজনৈতিক আদর্শবাদ অন্যদিকে কয়েদী জীবনের বাস্তব চিত্রণ। বিশেষ কোনো চরিত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। কয়েদী জীবনের সামগ্রিক ছন্দটির প্রতি লেখকের আগ্রহ। কারাজগৎ এখানে উৎসবের বিচিত্র সুরে বেজে উঠেছে—গ্রাম্য মেলার মতো। সতীনাথের গ্রন্থে আছে একটি বিপরীত ও মিশ্র রাজনৈতিক প্রতিন্যাস—পারিবারিক প্রতিবেশ। এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে আনুষঙ্গিক জেল-প্রতিবেশ। অতীতের স্মৃতি বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে অভিভূত করেছে। উপন্যাসের সময়-কাল একটি দিন। অথচ অতীত সঞ্চরণের প্রবৃত্তি ও প্রেরণা দেহের শৃঙ্খলকে আশ্রয় করে মানস বিহারে স্ফূর্তি লাভ করেছে।

লেখক সতীনাথের লক্ষ্য সাধারণ কয়েদীর চরিত্রচিত্রণ নয়, উপন্যাসে এরা গৌণ অংশ, স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদা নেই। ফাঁসির পূর্বক্ষণে আতঙ্ক ও একাকীত্ব বিলুর রক্তপ্রবাহে মৃত্যুর শীতল ঘোর সৃষ্টি করেছে। বিলু ফিরে গেছে প্রাক্ কারাজীবনে, তার মূল্যায়নে।

অতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাক্-কারাজীবনের মূল্য নির্ভর নয়। প্রাচীবের অভ্যন্তরে মানবমনের বিচিত্র ও ব্যতিক্রম সমাবেশেই লেখককে আকৃষ্ট করেছে। এখানে কয়েদীদের ঠিক চরিত্রচিত্রণ নেই, তাদের অন্তর রহস্যের খুঁটিনাটি বর্ণনাই লেখকের লক্ষ্য। যেহেতু কারাস্মৃতি এখানে জেল কেন্দ্রিক, লেখক কেন্দ্রিক নয়—এজন্য মননশীলতার ক্ষেত্রেব উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি। এমন কি সন্ত্রাসবাদের কর্মকাণ্ড-নৈপুণ্য লেখকের কর্মবিমুখ অবরুদ্ধ মনে কোনো উৎসাহ সৃষ্টি করেনি। কয়েদীজীবনের জটিলতা, মনস্তত্ব, কৌতুক প্রতিযোগিতার দার্শনিক সমীক্ষক লেখক অতীন্দ্রনাথ। ডাকাত সর্দারের আত্মমর্যাদা, মুসলমান বন্দীর অধ্যয়ণলিপ্সা, বি-কেলাস বন্দীর পারস্পরিক সমবেদনা এবং সহানুভূতিবোধ কয়েদীজগতের এমন অসংখ্য অনুভূতি ও মনস্তত্বের চিত্রশালা 'বি-কেলাস' (১৯৪৮)। স্বভাব অপরাধী খুনী, পত্নীপ্রেমিক, নীতিজ্ঞানী চাষী, নিরক্ষর খেত-মজুর এমন আরো বন্দী রয়েছে যারা লৌহকপাটের অন্তরালে মানবধর্মের বহুবর্ণ মূল্যবোধের পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। লেখকের অবস্থান তাদেব থেকে অনেক দূরে। তাঁর লক্ষ্য সাংকেতিক, সুতীক্ষ্ণ ও পর্যবেক্ষণধর্মী।

একটি ছোট গ্রন্থে এতো বিচিত্র কয়েদীস্বভাব পর্যবেক্ষণ এবং তার স্মৃতি-সংরক্ষণ বর্তমান স্মৃতিকথাকে মহিমান্বিত এবং কীর্তি সমৃদ্ধ করেছে। বক্ষ্যমান স্মৃতির আর একটি লক্ষণ কয়েদী সমাজের গোপন অতৃপ্ত যৌন-বুভুক্ষা। অচরিতার্থ কামনা ভোগস্পৃহার বৈধ ব্যবস্থার কারা নিরোধ অনেক কয়েদীর যৌন নৈতিকতাকে কুরুচিপূর্ণ বিকৃত এবং ব্যভিচারের লিপ্ত করেছে। সহবাস বর্জিত বন্দী মানুষগুলি উৎকেন্দ্রিক যৌন আচরণে পুলকিত হয়। অশ্লীল গান, বিকৃত চিত্রদর্শন, অপভাষা প্রয়োগ ইত্যাদি বদ্ধমানুষগুলির অদমিত আচরণের অনেক প্রসঙ্গই লেখক অতীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় এই সব বন্দী মানুষগুলির আচরণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। যে চিত্র অন্যান্য লেখকের স্মৃতিকথায় এরকম সর্বাধিক গুরুত্ব পায়নি।

আসলকথা লেখক ব্রিটিশ ভারতের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে একটি বিপর্যস্ত

পরাধীন জাতির দু'শো বছরের নিপীড়ন ইতিহাস তুলে ধরেছেন তাঁর স্মৃতি-কথায়। কারাগৃহ সৃষ্ট কলুষিত আবহাওয়া বন্দী কয়েদী মানুষগুলির অবশিষ্ট মনুষ্যত্বটুকুকেও বিলুপ্ত করতে চেয়েছে।

লেখকের মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা সেই ক্রমাবলুপ্ত মনুষ্যত্বের জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করেছে।

রাণীচন্দের পথটি স্বতন্ত্র। কারাগার থেকে তিনি দেখেন শরতের মেঘ, কাশফুল, শোনেন ট্রেনের হুইসেল, জেলের পাঁচটা বাজার ঘণ্টা। তাঁর অভিজ্ঞতা কেবল মস্তিষ্কের নয়, হৃদয়ের। কারাজগতের তথ্য-সত্য, সুন্দর-অসুন্দর, মাটি ও আকাশ সমগ্র সত্তার মধ্যে এমন একটি দ্রবণক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যা পরিচিত জেল অভিজ্ঞতা থেকে ছুটে চলেছে চিরসুন্দরের জগতে, প্রকৃতির নিবিড় অনুভবে—

'হাওয়ার দাপটে বৃষ্টির ধারা ভেঙেচুরে ধোঁয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে;—আছড়ে পিছড়ে সব একাকার। শব্দ দিচ্ছে কেবলই শোঁশোঁ। শোঁ। শোঁ; শুনে বুক দুরুদুরু করে। কোথাকার কত রকমের গাছের পাতা, ডালের টুকরোয় ঘর ভরে গেল।'

কয়েদঘরে যেখানে ছিল ঝুলকালো অন্ধকার, ভাঙা বাটি, মানবতার অবরুদ্ধ আর্তনাদ—রাণীচন্দের স্মৃতিজগৎ সেখানে সংগ্রহ করেছে—ঝড়ো বাতাসের গর্জন, চন্দ্রমল্লিকার গন্ধ এবং 'দুর্দান্ত মহাশিশুর দুর্বিনীত খেলা।'

'ভেটিনিউ'য়ের নিঃসঙ্গতা 'জেনানা ফাটকে' বিপর্যস্ত হয়েছে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলায়। আবার 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র মত লেখিকা আবেগ-নিস্পৃহ নন। বন্দীজগৎ, বন্দীমন, অবসর, উন্মুক্ত প্রকৃতি, বিচিত্র কয়েদী চরিত্র, জেলকর্তৃপক্ষ—গ্রন্থের পাতায় পাতায় দিনলিপির মতো ফুটে উঠছে; কখনও বা লেখিকা অন্তরঙ্গতায় প্রগলভ্‌ হচ্ছেন ঘরোয়া কথোপকথনে। লেখিকার লক্ষ্য রাজনৈতিক যুগটিকে চিহ্নিত করা নয়। 'জেনানাফাটকে'র অন্তরালে এক নারীমনের অন্তর্কথাই তাঁর লক্ষ্য, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র মতো বর্তমান গ্রন্থে অনেক উপাখ্যান প্রতিফলিত হয়েছে যার মধ্যে কাহিনীবয়ন ও চরিত্র-চিত্রণের সতর্কতা লক্ষণীয়। কিন্তু বন্দীমনের খেয়ালখুশী এতো সক্রিয় যে, উপাখ্যানগুলি শেষপর্যন্ত উপন্যাস গুণে মণ্ডিত হয়নি।

'বি-কেলাসের' অতীন্দ্রনাথ বসু যেখানে মনস্তাত্ত্বিক বস্তুবিশ্লেষণে এবং চরিত্র উপস্থাপনে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন রানীচন্দ সেখানে আত্মর

নিয়েছেন কল্পনার জ্যোৎস্নালোকে। রক্তমাংসের চরিত্রগুলি এক অজ্ঞাত শিল্পক্ষুধায় নবতর কল্পচিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। শৈল্পিক পরিনমণে এমন সার্থক গ্রন্থ কারাসাহিত্যে খুব অল্পই আছে। অবশ্য একথা ঠিক অত্যাচার ও নির্যাতনের কোনো রঞ্জিত চিত্র 'জেনানা-ফাটকে' পরিবেশিত হয়নি।

ভূমিকা

১। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতা স্পৃহার ফলশ্রুতি। স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎপত্তি সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যে কয়েকটি মূল্যবান সূত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' গ্রন্থে তা এখানে লক্ষণীয়—

'বাঙ্গালার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না; কারণ ইহা বঙ্গের একসোটিক নহে। ইহা জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তর মাত্র। (১) রামগোপাল ঘোষের সময় হইতে (নব্যবঙ্গের) ইয়ং বেঙ্গলের অভ্যুদয়। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হিন্দুসমাজের ও বঙ্গীয় চিন্তার উপর তাহার প্রভাব; রাজনারায়ণ বসুর '২) বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দুমেলা, ৩) 'নেশনেল পেপারের' সংস্থাপনা, 'নেশনেল থিয়েটারে' স্বদেশপ্রেমমূলক নাটকসমূহের অভিনয়, তৎপরে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থানকারীদের অভ্যুদয়; বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (৪) প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলীর চারিদিকে লাঠি খেলার আখড়া-স্থাপনা, শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশসেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক চেষ্টা (৫) ও 'স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন' স্থাপনা ও শেষে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও কংগ্রেসের কার্য্য, শিশির কুমার ঘোষের বৈপ্লবিক কল্পনা-জল্পনা, তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের 'আক্রমণশীল হিন্দু-ধর্মের' মতবাদ এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দলস্থাপনা ও কর্ম-এইগুলি বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পরপর স্তর।' (পৃ ৬)

২। তদেব, পৃ ১৭

৩। তদেব, পৃ ১৯

৪। দিলীপ মজুমদার—'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ'; পরিশিষ্টাংশ। প্রকাশক: নবাঙ্কুর প্রকাশনী; ২৩।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, ১ম সং—১৯৭৭।

আলোচ্যগ্রন্থের 'পরিশিষ্টাংশে' ১৮৮৪ সাল থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাগারে মৃত্যুর কারণ সহ ৫৩১ জন কারা-শহীদের তালিকা লেখক পেশ করেছেন। এবং 'যে সব কারা শহীদদের মৃত্যু সাল পাওয়া যায় নি' এমন কারা শহীদের তালিকায় ১৪১ জনের নাম আছে। যদিও মনের হয়, এই তালিকা সম্পূর্ণ নয় তবু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন যে দুর্বার হয়ে উঠেছিল এবং দেশের আপামর জনসাধারণ যে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করেছিল এবং কারাগারেই তাঁদের অনেকের মৃত্যু হয়েছিল, এই তালিকা থেকে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

৫। ' In Bengal itself hundreds of men are interned without trial-a great number of them to insanity or suicide. The misery that is carried into numerous households is deep and widespread, the greatest sufferers being women with their children who are stricken at and rendered helpless. '

(দিলীপ মজুমদার—'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ—৪৭)

৬। নেপাল মজুমদার—'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,' ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং, পৃ ২২১

৭। তদেব, পৃ ২২৪

প্রথম অধ্যায়

৮। 'The Theatre of the Absurd' (Martin Esslin, Penguin 1972) গ্রন্থের 'Introduction' অংশ (পৃ ১৯-২০)।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-'সাহিত্য', ১ম প্রকাশ ১৩১৪, বিশ্বভারতী সং ১৯৬৯, পৃ ১৩।

১০। যেমন বিপিনচন্দ্র পালের 'জেলের খাতা' (১৯১০) গ্রন্থটি কারা-সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। ১৯০৭ সালে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদিতে বিপিনচন্দ্র অস্বীকার করেন; ফলে ইংরেজ সরকার তাঁকে ছ'মাসের জন্য কারারুদ্ধ করে। 'জেলের খাতা' এই সময়ের রচনা। এই গ্রন্থে 'সাকার ও নিরাকার', 'খৃষ্টীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব', 'অবতারবাদ ও সাকারবাদ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। জেল-জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য গ্রন্থটি কারাসাহিত্য আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

১১। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে', বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ ২৭২

১২। দিলীপ মজুমদার-'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', ১ম সং ১৯৭৭, পৃ ৭৭

১৩। কেদারনাথ দত্ত-'সচিত্র গুলজার নগর', ১ম প্রকাশ-১৮৭১, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পুস্তক বিপনি সং জুলাই ১৯৮২

১৪। তদেব, পৃ ১১০

১৫। তদেব, পৃ ১১১

১৬। তদেব, পৃ ১১২

১৭। যোগেন্দ্রনাথ বসু—'আমাদের হাজত', 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত; ১২৯৭ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

১৮। তদেব, ৫ম অধ্যায়, পৃ ৬৪২

১৯। তদেব, ৯ম অধ্যায়, পৃ ৬৫

২০। তদেব, ৯ম অধ্যায়, পৃ ৬৬

২১। সুরথকুমার বসু—'স্বদেশীর কারাবাস', ১ম প্রকাশ : বঙ্গাব্দ ১৩১৩, ৩০শে আশ্বিন (১৯০৬)

২২। তদেব, পৃ ২৫

২৩। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা—'নির্ব্বাসন কাহিনী'। প্রকাশক—নিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা, গিরিডি। ১ম প্রকাশ—১৫ই চৈত্র, ১৩১৭।

২৪। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—'দ্বীপান্তরের কথা' ১ম ভাগ। প্রকাশকাল —১৫ই ভাদ্র, ১৩২৭

২৫। তদেব, পৃ ৩১

২৬। তদেব, পৃ ৩১

২৭। তদেব, পৃ ৩৪

২৮। তদেব, পৃ ৪১

২৯। তদেব, পৃ ৪৬

৩০। তদেব, পৃ ৪৭

৩১। তদেব, পৃ ১০৮

৩২। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী'। ডি. এম. লাইব্রেরী কলিকাতা-৬। ১ম সং—১৯২২

৩৩। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ—'কারাকাহিনী', প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর। ১ম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

৩৪। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা', ১ম সং জুলাই ১৯২১ ; বসুমতী সাহিত্য মন্দির সং ১৩৫৭

৩৫। 'সবুজপত্র', আশ্বিন ১৩২৮, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১২৯-১৩৪

৩৬। 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা', পৃ ২৬

৩৭। তদেব, পৃ ৩২-৩৩

৩৮। তদেব, পৃ ৪২

৩৯। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—'স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আটমাস', প্রকাশক—শ্রীগোপীনাথ .ভারতী, কলিকাতা। ১ম প্রকাশকাল ১৩২৯ (১৯২২)

৪০। 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা', দ্বিতীয়োধ্যায় :, শ্লোক ১৯ ও ২০

৪১। উল্লাসকর দত্ত—'আমার কারাজীবনী', প্রকাশক-শ্রীললিত চন্দ্র চৌধুরী, সিংহ প্রেস, কুমিল্লা ; ১ম সং ১৯২৩

৪২। নজরুল ইসলাম—'রাজবন্দীর জবানবন্দী', ডি, এম. লাইব্রেরী। প্রকাশকাল ১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৩

৪৩। তদেব, পৃ ৪

৪৪। মদনমোহন ভৌমিক— 'আন্দামানে দশ বৎসর', যুগবানী সাহিত্যচক্র কলিকাতা। ১ম সং ১৯৩০

৪৫। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—'কারামুক্তি', মাসিক বসুমতী, ৯ম বর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ ১৭-২৪

৪৬। সরোজকুমার রায়চৌধুরী—'শৃঙ্খল', সাহিত্য চয়নিকা, কলিকাতা। ১ম সং ১৪ই মার্চ, ১৯৩৩

৪৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'পাষাণপুরী', মিত্রালয়, কলিকাতা। ১ম সং ১৪ই জুলাই, ১৯৩৩

৪৮। "১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে যেদিন জেলখানা থেকে বের হল'ম সেই দিনই মনে মনে সংকল্প করেছিলাম। জেলখানাতেই তখন 'চৈতালি ঘূর্ণি' এবং 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দুখানি পত্তন করেছি, এবং তখন জেলখানায় রাজনীতিসর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি, চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে তখন রাজনীতির দিকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ হিন্দু সংস্কৃতির পথে জীবনযাত্রা শুরু করেছি। কোনো মতেই মিথ্যাচরণের আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পথে অগ্রসর হতে মন রাজী হলো না। আত্মাই যদি কলুষিত হয় তবে স্বাধীনতার মধ্যে কি পাব আমি ?"
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য জীবন', পৃঃ ১১।

৪৯। গোপাল হালদার—'কয়েদীর আকাশ', ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে লিখিত। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ সালের গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত।

৫০। অমলেন্দু দাশগুপ্ত—'ডেটিনিউ', ১ম সং—২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত ৩য় সং—আশ্বিন ১৩৭৩।

৫১। তদেব, গ্রন্থকার—পরিচিতি, পৃ ১৩

৫২। তদেব, পৃ ৯২

৫৩। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—'মুখর বন্দী'; এবং 'বন্দীর মন'।
'মুখর বন্দী' গ্রন্থের প্রকাশক—বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। ১ম সং—১৩ই জানুয়ারী ১৯৪০, নতুন সং-শ্রাবণ ১৩৮২। 'বন্দীর মন' গ্রন্থের প্রকাশক—ন্যাশন্যাল্ লিটারেচার, ৬২ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা। ১ম সং—২রা এপ্রিল ১৯৪০

৫৪। 'বন্দীর মন,' পৃ ১, পেশোয়ার জেল ৬।৩।৩৪

৫৫। তদেব, পৃ ৫৬, পেশোয়ার জেল ১২।৯।৩৪

৫৬। 'আরোগ্য'—'ঘণ্টা বাজে দূরে'।

৫৭। 'বন্দীর মন', পৃ ৭০, পেশোয়ার জেল ২০।১।৩৫

৫৮। 'মুখর বন্দী', পৃ ২০, পেশোয়ার জেল ২০।৬।৩৫

৫৯। সতীনাথ ভাদুড়ী—'জাগরী', প্রকাশভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩, ১ম সং—অক্টোবর ১৯৪৫; চতুর্দশ মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৮৮

৬০। পাষাণপুরী, পৃ ৫-৬

৬১। বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)—'অগ্নি', ১ম প্রকাশ—১৩৫৩, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত বনফুল রচনাবলী'র প্রকাশকাল—১লা বৈশাখ ১৩৮২, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১-৮৭।

৬২। তদেব, পৃ ৭৯-৮০

৬৩। তদেব, পৃ ৮৪

৬৪। অতীন্দ্রনাথ বসু—'বি-কেলাস', ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৫৫ (১৯৪৮)।

৬৫। 'প্রবাসী', মাঘ ১৩৫৫, পৃ ৩৮৪

৬৬। 'পাষাণপুরী', পৃ ৫১

৬৭। তদেব পৃ ৩২

৬৮। 'বি-কেলাস', পৃ ৩৭

৬৯। তদেব, পৃ ৯৫

৭০। তদেব, পৃ ১০১

৭১। 'জেলে ত্রিশ বছর', ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ১ম প্রকাশ—১৯৪৮, পৃ ১১৪

৭২। তদেব, পৃ ১১৫

৭৩। তদেব, পৃ ১১৮-১১৯
৭৪। 'বি-কেলাস', পৃ ৩
৭৫। বন্দীমনের স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যরচনা একটি পৃথক সাহিত্যিক মূল্যায়নের দাবী রাখে। যে মূল্যায়নের মধ্যে থেকে আমরা কয়েদী জগতের দুঃখকষ্ট সমস্যা বিকৃতি এরকম নানা সাহিত্য এবং সমাজ মনস্তত্ত্বের দিক খুঁজে পাবো। কারান্তরালের সংস্কৃতি, কারাব্যবস্থার নির্মম চিত্র কয়েদীমনস্তত্ত্বে কতখানি প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ·ডঃ এস, পি, শ্রীবাস্তব তাঁর "The Indian Prison Community"—গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে তিনি কয়েদীদের 'কম্পোজিং পোয়েট্রি' শিরোনামায় এই বিষয়ের উপরে অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন—

"Every prison without exception confines within its walls a certain number of inmates who are gifted with abundant literary talents and abilities. These inmates compose songs and verses in their leisure time and scribble them in their diaries and note-books·· The complete record of such pieces of poetic expression was, however, not available, as some such "inmate poets" were either too shy or too unwilling to pass on their creative works to any outsider. They understandably believed in the dictum that their songs and verses were meant to satisfy their own tortured selves and not for others who might make fun of them or might not appreciate the spirit in which their poems were composed. Nevertheless, these "inmate poets" were too well known in the prison's community. In their private gatherings, or on some officially recognized festive occasions, these inmates enthusiastically came forward·to recite their literary compositions in the presence of an admiring mob. The researcher after an

intense persuasion got some such peems (covering a large variety of topics) which concerned the life in-prison or dealt with themes that fascinated the most. Informal conversations with such "inmate poets" revealed that some of them knew the art of composing poetry ever since early childhood. They cultivated the poetic skill in their school days and got published a few of their poems in their college magazines Others who had no college or school education were those who despite their educational handicap trained their halting pen to express their feelings and emotions in a language which may loosely call 'poetry'. The prison poetry, these inmates observed was the expression of their deep personal feelings and emotions that most prisoners recollect in tranquility. This literary exercise, as they themselves said, gave them bountiful personal satisfaction The emotional Catharsis that this exercise provided was·extremely gratifying. They read and re-read their poems everyday.

Prison poetry may not be implecable and flawless when judged from any standard literary criterion. It may have lousy language, incorrect diction and imperfect poetic style. But the fact remains that for the "inmate poets" this is a great literary feat and great personal triumph. It is a powerful medium of expression that gives vent to their pleasures and pains and enjoyments and frustrations. For the Cathartic value that prison poety has in enormity, it deserves careful attention and appreciation. The prison poetry, in other words, is the expression of inmates

psychic sufferings and emotional torments. Above everything, it expresses enormous volume of prisoners repentance for their misdeeds and their unqualified prayers for clemency, pardon and conditional release."

(Dr S P. Srivastava M S W, Ph. D—'The Indian prison community' Published by Pustak Kendra, 72 Hazratganj, Lucknow, U. P, first edition : 1977).

৭৬। রানী চন্দ—'জেনানা ফাটক', ১ম সং—১৯৪৮ (?), প্রকাশ ভবন কর্তৃক প্রকাশিত নতুন সং—কার্তিক, ১৩৭৫

৭৭। পুস্তক পরিচয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা মাঘ, ১৩৯০

৭৮। 'জেনানা ফাটক', পৃ ১১

৭৯। তদেব, পৃ ২০

৮০। কল্যাণী ভট্টাচার্য—'জীবন অধ্যয়ন', প্রকাশক—অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, ২২৭ ১, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা—৪। প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ কালিদাস নাগে লেখিকা—পরিচিতির শেষে যে তারিখ আছে তাহল ১৯শে নভেম্বর ১৯৫১।

৮১। তদেব, পৃ ৫

৮২। তদেব, পৃ ৩

৮৩। নিকুঞ্জ সেন—'জেলখানা—কারাগার', প্রকাশক—গণদীপায়ন পাবলিশার্স, ১৭০-এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৭; প্রথম মুদ্রণ—মাঘ ১৩৫৮ (১৯৫২)।

৮৪। তদেব, পৃ ২

৮৫। সতীশচন্দ্র দে -'নিঃসঙ্গ', প্রকাশক—সলীলকুমার দে, ১৩।ডি ক্র্যাইস লেন, কলিকাতা—১৪ ; ১ম সং—১৯৫৬

৮৬। তদেব, পৃ ৯৪

৮৭। দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়—'তখন আমি জেলে', প্রকাশক—জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭ :, ১ম সং—৭ই কার্তিক, ১৩৬৩ (১৯৫৬)।

৮৮। তদেব, পৃ ৯১

৮৯। ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তাঁর 'অপরাধ জগতের ভাষা' গ্রন্থটিতে পেশা-দারী অপরাধ জগতের ভাষার চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই লেখকের 'ডিকসনারি অফ দি আণ্ডার ওয়ার্লড আরগট' গ্রন্থটিও এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়)—'সচিত্র গুলজার নগর'; ১ম প্রকাশ—১৮৭১ সাল, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পুস্তক বিপণি সং—জুলাই ১৯৮২।

২। মনোরঞ্জন গুহ—'নির্বাসন কাহিনী'; ১ম প্রকাশ—১৩১৭

৩। এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার তাঁর 'অগ্নিযুগ' ১ম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "অগ্নিযুগের ত্রিমুখী পাঞ্চজন্য—বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা ও যুগান্তর" শিরোণামায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি এই তিনটি পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের গতিতে কি বিপুল প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল তার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক ঐতিহাসিকই যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। বারীন্দ্রকুমার তাঁর আলোচনায় সেই অলিখিত কাহিনীকে 'ত্রিমুখী পাঞ্চজন্যে' প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৪। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—'দ্বীপান্তরের কথা', ১ম সং—১৩২৭

৫। অরবিন্দ ঘোষ—'কারাকাহিনী'; ১ম সং—১৩২৮

৬। 'ভারতী', আষাঢ়, ১৩১৬, ৩৩শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৫১-১৫৭

৭। প্রকৃতপক্ষে যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ আসলে একটি বিশাল কারাগার এই ধারণা সেই সময় অরবিন্দের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ পেতে গেলে জেলে যেতে হবে কেন এই প্রশ্নের উত্তর জানালেন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীন ও জেল-জীবনে কোনই পার্থক্য নেই। এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় জননেতা শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের অভিমত হল—

"...আমাদের জাতীয় জীবনের এমন কক্ষ নাই, যেটাকে স্বাধীন

বলিতে পারি এবং যার উপরে পরের হাতের বা পায়ের ছাপ নাই। ছেলেদের শিক্ষাকার্য্য থেকে আরম্ভ করে বুড়াদের ধর্ম্ম আচরণ পর্য্যন্ত এমন কোনও কাজ নাই যাহা আমরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্ররূপে আমাদের নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্ম অবলম্বন করে সমাধা করতে পারি। তাই ভাবি সমস্ত দেশটাই এক বৃহৎ কারাগার। ·" ('বাঙ্গলার কথা' (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ। ১ম ভাগ, কলিকাতা, শুক্রবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮; ৮ম সংখ্যা)

৮। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'নির্বাসিতের আত্মকথা', ১ম প্রকাশ —১৯২১, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সং ১৩৫৭

৯। 'যুগান্তর' নীতি-নির্ধারণে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা "দশপন্থা" নামক নিবন্ধ থেকে জানা যায়—

"ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য এবং ভারতকে পাশ্চাত্যজাতির দুর্দ্দান্ত কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপাততঃ আমাদিগকে দশটি পন্থা নিরূপণ করিতে হইতেছে।

১। দেশ-ভক্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ।

২। পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করা ও বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা।

৩। ভারতের রপ্তানী বন্ধ করা।

৪। ভারতের অধিবাসীগণের সামরিক শিক্ষা। প্রত্যেক ভারতবাসী যেন সমর-নিপুণ হয়।

৫। মদ্য ও মাদক দ্রব্যমাত্র সেবন পরিত্যাগ।

৬। স্ট্যাম্প ইত্যাদি বিক্রয় বন্ধ করা ও মোকর্দ্দমা সালিসীতে নিষ্পত্তি করা।

৭। ভারতের খান ভারতবাসীর নিজের দখলে আনা।

৮। নেতৃ নির্ব্বাচন করিয়া শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা।

৯। হিন্দু মোসলমানের জন্মভূমি বাসভূমি ভারতবর্ষে হিন্দু ও মোসলমানের একত্র রাজনীতি ক্ষেত্র সম্মিলন। ·

('যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা। কলিকাতা, ২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩১৪ সাল)।

১০। স্বাদেশিকতা যে কেবলমাত্র একটি জাতির সংকীর্ণ স্বাধীনতার আকাংক্ষা নয় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত করেছিলেন। বিপিন চন্দ্র পাল স্বাদেশিকতার চিন্তাকে রবীন্দ্র-ভাবধারা থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। দেশাত্মবোধ যে একটি মানবিকবোধ, যাকে জাতির সীমাবদ্ধ ধারণায় আবদ্ধ রাখা যায় না—এই মতবাদ স্বদেশী যুগে দানা বেঁধে উঠেছিল। এ সম্পর্কে বিপিন চন্দ্রের অভিমত 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় 'জাতীয় দিবস' উপলক্ষে প্রকাশিত হয়—

"১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখ যখন 'জাতীয় দিবস' বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল, তখন তাহার প্রথম সাম্বৎসরিক পর্ব্ব উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"We dedicate this day to that Patriotism which finds its fulfilment in Humanity."

('মাসিক বসুমতী'—১১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুক্তিমন্ত্রের পুরোহিত বিপিনচন্দ্র' নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৩৮-৩৪০)।

১১। 'নির্বাসিতের আত্মকথা'; ভূমিকা

১২। তদেব, ভূমিকা

১৩। তদেব, পৃ ৪

১৪। তদেব, পৃ ১৭

১৫। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী', ১ম প্রকাশকাল—১৯২২

১৬। তদেব, পৃ ৪৩

১৭। মাণিকতলার বোমার মামলায় ধৃত শ্রীঅরবিন্দ জেলে বসে নানা ধরণের বিপ্লবী কর্মপন্থার নির্দেশ, বিপ্লবী প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করতেন। এ রকমই একটি গুপ্ত তথ্যের উল্লেখ করেছেন 'স্মৃতির পাতা' গ্রন্থের লেখক নলিনীকান্ত গুপ্ত—'বোমা তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা তিনি দিলেন চারিটি প্রবন্ধে, তাদের নাম আমার এখনো মনে আছে—

1. The Message of the Bomb 2. The morality of

the Bomb 3. The psychology of the Bomb 4. The policy of the Bomb.'

১৮। ক্ষীরোদকুমার দত্ত—'বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার'; ১ম সং—১৯৬৫

১৯। 'Dawn of India' পাক্ষিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'India on the crossward of her destiny' প্রবন্ধে বারীন্দ্রের মন্তব্য। ১৯৩১ সালের ১৪ই জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত।

২০। 'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী', পৃ ৪৮

২১। তদেব, পৃ ৫৯

২২। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— গৃহাগত উপেন', 'হিন্দুস্থান', ১ম বর্ষ, ২১ ফাল্গুন, ১৩২৬ (১৯২০) সংখ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে উপেন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

২৩। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—'স্রোতের তৃণ বা স্ববাজ আশ্রমে আটমাস', ১ম প্রকাশ-১৩২৯, প্রকাশক- গোপীনাথ ভারতী, ভবানীপুর, কলিকাতা। পৃঃ ৭

২৪। হেমচন্দ্র কানুনগো—'বাংলার বিপ্লব কাহিনী', 'মাসিক বসুমতী'তে ১৩২৯ আশ্বিন থেকে ধাবাবাহিক রচনার সুরু, শেষ হয় ১৩৩৪ সালের মাঘ মাসে।

২৫। নেতৃত্বের সংকট বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। 'যুগান্তরে'র 'কালের ভেরী' নিবন্ধে সেই সময় বলা হয়েছে—'
মহামরু কুরুক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, বিপ্লববিদ্যুৎবিনির্ম্মিত সুবিস্তৃত নীলচন্দ্রাতাপ তাহার উপর শোভা বিকীর্ণ করিতেছে, কিন্তু সেই বিদ্যুচ্ছক্তি সঞ্চালনী শক্তি কই? সে তূর্য্যধ্বনি কই? কালের ভেরী বাজিয়াও ত বাজিল না।....'

('যুগান্তর সাপ্তাহিক পত্র', ২য় বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা; কলিকাতা, ১৮ই মাঘ, শনিবার, ১৩১৪ সাল)।

২৬। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বরাজলাভের জন্য তত্ত্বগত ভিত্তি কী হবে এই বিষয়ে সব সময় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে বিপ্রতীপ

দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। একপক্ষ বলতেন আগে মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে স্বরাজলাভের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে হবে। অন্য পক্ষ মনে করতেন স্বরাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বরাজ লাভের যোগ্যতা আসবে। হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন প্রথম মতবাদের সমর্থক। দ্বিতীয় মতবাদের পক্ষে নেতৃবৃন্দ যে কত সক্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ পাই সেইসময়কার 'মাসিক বসুমতী'তে—" লর্ড মরলে বলিয়াছিলেন, 'It is liberty alone which fits men for liberty. অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ দ্বারাই মানুষ স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।' জগতে কোন জাতি প্রথমে যোগ্য হইয়া তাহার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত লর্ড আরউইন দেখাইতে পারেন কি? জাতি ক্রমাগত পরাধীন এবং পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া পরের নিকট "স্বাধীনতা বিদ্যা" লাভ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের কথা ত আমরা জানি না। হাতে কলমে কার্য্য করিতে করিতে লোকের সেই অভ্যস্ত কার্য্যে ব্যুৎপত্তি জন্মে। ভুলের ভিতর দিয়াই মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। জলে না নামিয়া কেহ সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারে না। মেকলের মত মনীষী ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—··· no people ought to be free until they are fit for their freedom. The maximum is worthy of the fool in the old story who resolved not to go into the water until he had learned to swim. If men are to wait for liberty had till they become wise and good in slavery, they may indeed wait for even. (Essay on Milton)"

('মাসিক বসুমতী'—১৩৩৫, ৭ম বর্ষ, মাঘ। 'সাময়িক প্রসঙ্গ'-এর অন্তর্গত একটি রচনা 'সহযোগের অভাব'—এর অংশবিশেষ।

২৭। নলিনীকিশোর গুহ—'বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃ ২০২

২৮। 'পুস্তক-পরিচয়', 'প্রবাসী', ১৩৩৫ আশ্বিন সংখ্যা

২৯। 'মাসিক বসুমতী', ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৫

৩০। হেমচন্দ্র কানুনগো-'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা', ভূমিকা

৩১। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে হেমচন্দ্র কানুনগো প্রণীত 'বাংলার বিপ্লব কাহিনী' সে যুগের ইতিহাসে গঠনমূলক সমালোচনা নয়। ব্যক্তিগত আক্রমণের ঝোঁক লেখককে রাজনৈতিক সমালোচনার দিকটিকে দুর্বল করেছে। অন্যদিকে ঐসময় 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রে স্বাধীনতার 'অন্তরায়' প্রসঙ্গে রাজনৈতিক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে—

" আমরা অন্তরায়গুলির বিশদ করিয়া বুঝিলেই তাহার প্রতিবিধানের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিব।

১ম। বিদেশীয় শিক্ষা (বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় নয়)

২য়। ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ানস্— (ঐ)

৩য়। বিদেশীয় ভেদনীতি (ঐ)

৪র্থ। বিদেশীয় শাসক শক্তির শাসনের ভয়। জেল, ফাঁসী ইত্যাদি। (ঐ)

৫ম। নিরস্ত্র (ঐ)

৬ষ্ঠ। নিজেকে হীন মনে করা এবং বিদেশীয় মোহে আপনাকে ডুবাইয়া রাখা (ঐ)

৭ম। চাকুরীর লোভে আপন ভায়ের বুকে যাহাতে ছুরি না মারিতে পারে তাহা আমাদের রাম, কালী ইত্যাদিকে বোঝানো। (ঐ)

৮ম। হিন্দু-মুসলমান ভেদ-নীতি (ঐ)

('যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্র, ২য় বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, কলিকাতা, ৭ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩১৪ সাল)।

৩২। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল—'বন্দী-জীবন', ১ম সং-১৯২২, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা।

৩৩। মহাত্মা গান্ধী 'কারাকাহিনী'; অনুবাদক—শ্রীঅনাথনাথ বসু, ১ম সং-১৯২৩, বিচিত্রা প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা।

৩৪। তদেব, পৃ ৫৯-৬০

৩৫। Profiles of Gandhi' edited by Norman Cousins.
'On peace and Gandhi'—Albert Einstein, P. 99.
Published by Indian Book Company, Delhi, 1969.

জীবন চক্র

সত্যাগ্রহের গঠনমূলক ভূমিকা সম্পর্কিত এই ছক গান্ধীজী'র নির্দেশে অঙ্কিত হয়। সত্য ও অহিংসাকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া জাতীয় উন্নতির জন্য "জীবন চক্রে"র পরিকল্পনা।

(গান্ধী-রচনাসম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬ই পৌষ ১৩৭৬, সম্পাদনা—শ্রীশৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত)।

৩৭। সতীনাথ ভাদুড়ী—'জাগরী', ১ম প্রকাশ—১৯৪৫, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

৩৮। সতীশ পাকড়াশী—'অগ্নিদিনের কথা'; ১ম সং— ১৯৪৭। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা-১২।

৩৯। তদেব, পৃ ১৮।

৪০। তদেব, পৃ ২০

৪১। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর চিন্তাশীল মহলে বিপ্লব ও জাতীয়তাবোধের সংজ্ঞা নির্ধারণে নানা বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সতীশবাবুর মতন প্রমথ চৌধুরীও মনে করেন—

'·· বাঙ্গালীর কাছে ন্যাশনালিজমের অর্থ হচ্ছে জাতির স্বধর্মের চর্চা, এবং সেই শাসনতন্ত্রই ঈপ্সিত ও বরণীয়, যার অন্তরে একটি বিশেষ জাতির স্বধর্ম পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠবার পূর্ণ অবসর পায়। অতএব প্রতি দেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যই তার ন্যাশনালিজমের অটল ভিত্তি।·· ·স্বরাজলাভ আর স্বদেশরক্ষা যে একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। তবে তার কোনটি সদর আর কোনটি মফঃস্বল, এই নিয়ে দেখতে পাচ্ছি মতভেদ আছে। এর কোনটি আগে কোনটি পরে, এই নিয়ে আমাদের পলিটিকাল দলে এমন একটা তর্ক বেঁধেছে· যার ফলে ভ্রাতৃবিরোধ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, গুরু-শিষ্যে মনান্তর প্রভৃতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে।

('সবুজপত্র' বৈশাখ ১৩২৫, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত 'দেশের কথা'র অংশবিশেষ)।

৪২। সতীশ পাকড়াশী—'অগ্নিদিনের কথা', পৃ ১১৯

৪৩। তদেব, পৃ ১৮০

৪৪। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর স্বদেশী কার্যক্রম এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজতন্ত্রের দ্বিমুখী প্রতিযোগিতা অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর থেকেই সুরু হয়েছিল। বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং গান্ধীয় অর্থনীতি—এই দুই অর্থনৈতিক মতবাদে বিভক্ত হয়ে যায়। অনেক কংগ্রেসী দলত্যাগী না হলেও সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তা কংগ্রেসের মধ্যে সুরু করেন। জওহরলাল নেহরু তাঁদের পথপ্রদর্শক বলা যেতে

পারে। এ প্রসঙ্গে জওহরলালের 'কোন পথে ভারত' (হুইদার ইণ্ডিয়া) পুস্তিকাটি স্মর্তব্য—'এশিয়ার অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মত, ভারতবর্ষে আজ পুরাতন জাতীয়তার আদর্শের সঙ্গে এই নতুন অর্থ-নৈতিক মতবাদের সংঘর্ষ বেধেছে।··· অথচ এও আমরা বুঝেছি যে, পুরাতন জাতীয়তার আদর্শ অসম্পূর্ণ·' (পৃ ৮৩)।

৪৫। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের সংগ্রাম,' ৫ম সং—১৯৮১। (১ম সং—১৯৪৮, 'জেলে ত্রিশ বছর') মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘটক কর্তৃক প্রকাশিত। ২ গ্রীক চার্চ রো একস্‌টেনশন, কলিকাতা-২৬।

৪৬। তদেব, পৃ ২২২

৪৭। তদেব, পৃ ২৪২-৪৩

৪৮। বীণা দাস—'শৃঙ্খল—ঝংকার', ১ম সং—১৩৫৫, সিগনেট প্রেস, কলিকাতা-২০ থেকে প্রকাশিত।

৪৯। তদেব, পৃ ২০

৫০। তদেব, পৃ ৭৫

৫১। তদেব, পৃ ১২১

৫২। শান্তি দাস—'অরুণ বহ্নি', ১ম সং—১৩৫৮, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সং-১৩৭৪

৫৩। তদেব, পৃ ১০৪

৫৪। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—'বিপ্লবের পদচিহ্ন', ১ম প্রকাশ-১৯৫৩, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২।

৫৫। তদেব, পৃ ২১৩-১৪

৫৬। তদেব, পৃ ৩৭৫

৫৭। কমলা দাশগুপ্ত—'রক্তের অক্ষরে'; ১ম সং-১৯৫৫, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

৫৮। তদেব, পৃ ১৮

৫৯। গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন তাঁর নির্দেশমত অহিংস অসহযোগ পরিচালিত হলে এক বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২২ সালের মধ্যে) ভারতবর্ষ স্বরাজ অর্জন করবে। গান্ধীজীর উক্তিকে বিপ্লবীরা কী গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বিশ্বস্ত ছিল তার প্রমাণ

পাওয়াযাবে হেমন্তকুমার সরকারের 'বন্দীর ডায়েরী' গ্রন্থে। কোর্টের বিচার কালে তিনি বলেছিলেন—

As I consider myself a free Indian I deny the jurisdiction of this Court set up by the British falsely in the name of law and order. I hope to be released when the prison gate will be opened by the first President of the Indian Republic and that's on the 31st of December.

('বিচারের দিন'—চতুর্থ পরিচ্ছেদ. পৃ ১৯)

৬০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্বে গান্ধীজী যে রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশ ও জাপান থেকে সম রাজনৈতিক দূরত্বে অবস্থান করেছিলেন তার আরও প্রমাণ—"১৯৪২ সালের ১০ই মে তারিখে তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন,—"ব্রিটিশের ভারতে অবস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানানোরই সামিল। ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে গেলেই এই প্রলোভন বিদূরিত হবে।"

(ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য—"নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা", পৃ ১২)।

এ বিষয়ে গান্ধীজীর স্ববিরোধিতা নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবের সন্ধানে' গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে করা হয়েছে।

৬১। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', ১ম সং-১৩৬৩, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

৬২। তদেব, ভূমিকা

৬৩। "Jadugopal Mukherji's reminiscences contain much information about the Jugantar groups and show considerable critical insight, unfortunately both fact and criticism are entombed in a mass of verbiage and repetition"

(Sumit Sarkar—'The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908', P-467).

৬৪। 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', পৃ ৭

৬৫। যাদুগোপাল বারীন্দ্রের পরিচালিত বিপ্লবীসন্ত্রাসকে গ্রহণ করতে পারেননি। বিপ্লবী গণ আন্দোলনকে একটি যুক্তিসম্মত পন্থায় চিন্তার সরল রৈখিক পথে সপ্রস্তুত করতে চেয়েছেন তিনি ধৈর্যসহকারে—
"Jadugopal Mukherji claims that he was always opposed to Barindra Kumar's adventurist ways; revolution, he had urged, must have four wings-students, peasants, workers and soldiers-and required years of patient preparation"

(Sumit Sarkar—'The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908', P—489)

৬৬। 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', পৃ ৪১০

৬৭। তদেব, পৃ ৪১৩

৬৮। 'Thus despite alleged plans for revolution based on peasants and workers, in practice, Jadugopal concentrated on getting arms from abroad—he sent his brothers Khirod-gopal to Burma and Dhanagopal to Japan and America in 1908 for the purpose'

(S. Sarkar—'The Swadeshi Mov. In Bengal 1903-08', P-490)

তাছাড়া সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) মেভারিক জাহাজে অস্ত্র আনার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ঐ অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল।

(ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়—'বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ'। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১ম সং—১৯৪৭)।

৬৯। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকের অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে—
'The 'obstructive co-operation' of the Swaraj Party with government was neither fully obstructive nor co-operative. By refusing to accept offices in the government the Swarajists had denied themselves the means of applying government machinery to public service.

Their merely vocal opposition to the government, on the other hand, had yielded no results. This caused a sense of frustration among them and some of the Swarajists realising the frutility of their negative role, devided in 1925 to accept offices in the provincial government. Motilal Nehru, who after the death of C. R. Das in June 1925 had become the president of the party, expelled these members from the Swaraj Party. The party, therefore, was weakend due to the split, and in the general election of 1926 it fared badly. The Swarajists interlude virtually came to an end in March 1926, when in protest against the Government's failure to respond to their demand for responsible self-government, the Swarajists walked out of the legislatures.'

(B. N. Pandey—'The Braak-up of British India' Macmillan Indian Ltd. New Delhi. p. 122-23).

৭০। কালীচরণ ঘোষ—'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', ২য় খণ্ড, ১ম সং—১৩৮০ পৃ ৬৭৭

৭১। পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত—'বিপ্লবের পথে', ১ম সং—১৯৫৭।

৭২। কালীচরণ ঘোষ—'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', ২য় খণ্ড, পৃ ৬৬৭

৭৩। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বিপ্লবের সন্ধানে', ১ম সং—১৯৬৭, প্রকাশক —ডি এন বি এ ব্রাদার্স, ৮৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

৭৪। তদেব, পৃ ৩১৪

৭৫। 'A letter to President Roosevelt'—M. K. Gandhi ; 'Profiles of Gandhi' edited by Norman Cousins, P 227, India Book Co , Delhi.

৭৬। 'বিপ্লবের সন্ধানে', পৃ ৩১৫

৭৭। সুভাষচন্দ্র বসু—'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম', ১ম ও ২য় খণ্ড, ১ম প্রকাশকাল—১৩৭৩। ১৩৭৫, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত।

৭৮। কংগ্রেসে নেতৃত্বের সংকট প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই একটি খোলা প্রশ্ন। সুরাট কংগ্রেসে যে বিরোধের শুরু '৪২ এর ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়েও সেই বিরোধ প্রশমিত হয়নি। নেতৃত্বের প্রশ্নে হরিপুরা কংগ্রেসে গান্ধীজী সুভাষ-বিরোধী যে মন্তব্য করেছিলেন তা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও গুরুবাদের পক্ষে ঐ মন্তব্য স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতির পদে আসীন হওয়ার অনেক আগেই হেমন্তকুমার সরকার গুরুবাদের এই বিপদজনক দিকের কথা লিখেছিলেন—'··মহাত্মার অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র All India Leader হয়েছেন। ইনিই চৌরিচৌরায় গিয়ে রিপোর্ট করেছিলেন—'After Chaurichaura father should forget the Punjab wrongs'—চৌরিচৌরার পর পিতৃদেবের পঞ্জাবের অত্যাচারের কথা ভুলে যাওয়া উচিত। এই রিপোর্টের উপর কাজ করেই ভারতের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। চৌরিচৌরার ভয়ে বর্দ্দোলি রোজালিউসান যদি না হত, তাহলে ভারতের সুদিন এতদিনে যে ফিরে আসতো না এমন কথা কে বলতে পারে? দেশের সকলে যখন প্রস্তুত তখন উৎসাহ না ভেঙে দিলে হয় তো বড় একটা কিছু হ'য়ে যেতো।·····

(বাঁশরী, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃ ১৭, শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার লিখিত 'কংগ্রেসে গুরুবাদ' নামক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত)।

৭৯। 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম', ২য় খণ্ড, পৃ.৩৬২

৮০। হেমন্তকুমার সরকার—'সুভাষচন্দ্র' ১ম সং—১৩৩৪, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬।

৮১। সন্তোষকুমার অধিকারী—'শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন', ১ম প্রকাশ—১৯৭২; প্রকাশক—শ্রীমতী কমলা দাস, ১ অমিতা ঘোষ রোড, কলিকাতা-২৯

৮২। তদেব, পৃ ৮৭

৮৩। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা' (১ম পর্ব ১৯২৭-১৯৪৫), ১ম প্রকাশ-১৯৭৩, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকতা-১২।

৮৪। চরমপন্থী ও নরমপন্থী গোষ্ঠিদ্বয়ের স্বরূপটি ঐ সময় পত্র-পত্রিকায়

গভীরভাবে আলোচিত হত। চরমপন্থী দল এবং বিপ্লবী সংস্থাগুলি বিপ্লবের জন্য আত্মশক্তি অর্জন করতে হবে এই বাণীকে প্রবঞ্চনা বলতেন। এই সম্পর্কে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত "প্রবঞ্চনা বাক্য" নামক রচনায় লেখা হয়—"... "First deserve then desire" প্রবঞ্চনা বাক্য। ইচ্ছাশক্তি কর্মশক্তির চালিকা, যদি উচ্চ আদর্শ স্থির না থাকে তাহা হইলে কেহ কখন বড হইতে পারে না।... তীব্র আকাঙ্ক্ষাই শক্তি জাগ্রত করে; মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি বর্তমান। যে যে ভাবে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিবে, সেই লক্ষ্যের জন্য সে ততই উপযুক্ত হইবে। আদর্শ আগে, সাধনা পরে, সিদ্ধি সর্বশেষে; ইহাই বিধাতার নিয়ম!"

('যুগান্তর সাপ্তাহিক পত্র', ১ম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, কলিকাতা ১১ই কার্ত্তিক, রবিবার ১৩১৩ সাল)।

৮৫। 'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা', পৃ ২৭৩

৮৬। ফণিভূষণ ভট্টাচার্য—'নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা', ১ম সং-১৯৭৩, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা-১২।

৮৭। সুমিত সরকার তাঁর 'Modern India 1885-1947' গ্রন্থে নৌ-বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে লেখকের অভিমতকে সমর্থন করেছেন—

"The ratings elected a Naval Central Strike Committee, headed by M. S. Khan, and formulated demands which combined issues of better food, equal pay for white and Indian sailors, etc., with the national political slogans of release of I. N. A. and other political prisoners and withdrawal of Indian troops from Indonesia."

৮৮। রমাঁ রলাঁ-'ভারতবর্ষ', অনুবাদ-অবন্তীকুমার সান্ন্যাল, র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, কলিকাতা-১২; ১ম সং-১৯৭৬, পৃ-২৭

৮৯। প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী—'বিপ্লবীর জীবন দর্শন', ১ম প্রকাশ-১৩৮৩, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা-৭৩

তৃতীয় অধ্যায়

১। ভাণ্ডার, ১ম ভাগ, ফাল্গুন ১৩১২, পৃঃ ৩৪৩ ; রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদক)।

২। যুগান্তর সাপ্তাহিক, ২য় বর্ষ, ১৮ই মাঘ শনিবাব, ১৩১৪ , 'কালের ভেরী' রচনার অন্তর্গত।

৩। ভারতী, আষাঢ় ১৩১৬, 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'—অরবিন্দ ঘোষ , পৃ ১৫১-১৫৭।

৪। যোগীন্দ্রনাথ বসু—'আমাদের হাজত', জন্মভূমি, ১ম বর্ষ, ১২৯৭-৯৮।

৫। হেমন্তকুমার সরকার—'বন্দীর ডায়েরী', ১ম সং—১৯২২।

৬। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—'বিদ্রোহে বাংলা বা আমার জীবন চরিত', ১ম প্রকাশ—১৩৩৮।

৭। রাণীচন্দ—'জেনানা ফাটক', ১ম সং—১৯৪৮ (?)

৮। অনন্ত ভট্টাচার্য—'আন্দামান বন্দী', ১ম সং—১৯৪৮।

৯। সুবোধ কুমার লাহিড়ী—'বিপ্লবের পথে', ১ম সং—১৯৫০।

১০। নিকুঞ্জ সেন—'জেলখানা কারাগার', ১ম সং—১৯৫২।

১১। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী—'সে যুগের আগ্নেয় পথ', ১ম সং—১৯৬০।

১২। সতীশ পাকড়াশী—'অগ্নিযুগের কথা', ১ম সং ১৯৭১।

১৩। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে স্বাধীনতা পূর্বযুগে ব্রিটিশ রাজশক্তি বন্দীদের যে ধরণের খাদ্য পরিবেশন করত তা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জেলখানার ক্ষেত্রেই সত্য নয়, কেন না পৃথিবীর সব দেশেই বিপ্লবীদের প্রতি রাজশক্তি একই ধরণের অমানবিক আচরণ করে থাকে। জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাসির মঞ্চ থেকে' নামক বাংলা অনূদিত গ্রন্থে আমরা সেই একই চিত্র পেয়েছি।

প্যানক্রাটস্ বন্দীশালার অতিথি হয়ে জুলিয়াস ফুচিক জেলখানায় আহারের বর্ণনা দিয়েছেন—'সেই দুর্দিনে যখন আমাদের পাকস্থলী ক্ষিদের জ্বালায় ককিয়ে উঠতো, যখন হপ্তার ধারাস্নানের সময় দেখা যেত চামড়া মোড়া কংকালদের এমনকি ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও

তখন তোমার খাবার চুরি করতে দ্বিধা করত না, অন্ততঃ চোখের দৃষ্টি দিয়েও তো করতো। আমাদের কাছে তখন শুটকি শাকসব্জির ঘণ্ট আর জল দিয়ে গোলা টোমাটো সস্‌ও উপাদেয় খাদ্য। তখন হপ্তায় আমাদের খাবার ভাঁড়ে আলু দেখতে পেতাম বৃহস্পতি আর রোববার, আলুর উপরে এক চামচে গুলাসের ঝোল আর মাংসের পাতলা টুকরো। চমৎকার লাগত খেতে—স্বাদের চেয়েও এর মধ্যেই পেতাম মানুষের জীবনের বাস্তব স্পর্শ। গেষ্টাপো কয়েদখানার অস্বাভাবিকতার মধ্যে এইটিই যেন খানিকটা সভ্যতার ছোঁয়া, স্বাভাবিক জীবনের দান। কি আনন্দেই না গুলাস নিয়ে কথা বলতাম। এক চামচ মাংসের ঝোল মুমূর্ষুর দৈনন্দিন ভীতির সঙ্গে মিশে যে কত মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে তা কে বুঝবে!'

বন্দী কয়েদীদের বিচারের আগে চরম শাস্তি জেলকর্তৃপক্ষই পূর্ণ করতেন। বরাদ্দ খাদ্যের সিকিভাগও জুটতো না কয়েদীদের ভাগ্যে। নির্জীব দুর্বল বন্দীদের উপর চলতো অমানুষিক অত্যাচার, খালি পেটে উদয়াস্ত চালানো হতো পরিশ্রমের নামে পীড়ন। বর্বরতা আর পাশবিক নির্যাতনই প্যানক্রাটস জেলের একমাত্র মূলধন, আহার বা মনুষ্যসুলভ ব্যবহার অলীকস্বপ্ন মাত্র।

১৪। অতীন্দ্রনাথ বসু—'বি কেলাস', ১ম সং—১৯৪৮।

১৫। কল্যাণী ভট্টাচার্য—'জীবন অধ্যয়ণ', ১ম প্রকাশ—১৯৫৪ (?)

১৬। ফণিভূষণ ভট্টাচার্য—'নৌ বিদ্রোহের ইতিকথা', ১ম সং—১৯৭৩।

চতুর্থ অধ্যায়

১। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ—'কারাকাহিনী' ;
প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর। ১ম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

২। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ—'বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী'। প্রকাশক—ডি এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা—৬। ১ম সংস্করণ—১৯২২ সাল।

৩। উল্লাসকর দত্ত—'আমার কারাজীবনী'। প্রকাশক—শ্রীললিত চন্দ্র চৌধুরী, সিংহ প্রেস, কুমিল্লা। ১ম সং—১৯২৩

৪। বিধুভূষণ বসু—'পুরাণো জেলের কথা'। মাসিক বসুমতী, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, পৃ ২৪৭-২৪৯
" " —'স্মৃতিকথা'। ৫ই আগস্ট, ১৯৫৯। লেখকের জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারিত।

৫। যোগেন্দ্রনাথ বসু—'আমাদের হাজত'। 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। ১২৯৭ সালের 'পৌষ সংখ্যা থেকে ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

৬। সুরথ কুমার বসু—'স্বদেশীর কারাবাস'। প্রকাশক—কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস; ৩৬ বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা। ১ম প্রকাশ—বঙ্গাব্দ ১৩১৩, ৩০ শে আশ্বিন (১৯০৬)

৭। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ—'দ্বীপান্তরের কথা', ১ম ভাগ।
১ম প্রকাশকাল—১৫ই ভাদ্র, ১৩২৭ (১৯২০)

৮। মদনমোহন ভৌমিক—'আন্দামানে দশ বৎসর'। প্রকাশক—যুগবাণী সাহিত্য চক্র, ১৪ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা। '১ম সংস্করণ—১৯৩০।

৯। কল্যাণী ভট্টাচার্য—'জীবন অধ্যয়ন'। প্রকাশক—অবিনাশচন্দ্র

মজুমদার, ২২৭।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪। ১ম সংস্করণ—১৯৫৪ (?)

১০। সুধীর চন্দ্র দে—'সাগর ঘেরা পাথর কারা'। বিপ্লবী প্রকাশনী থেকে শ্রী অশোক চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম সংস্করণ—২৩ শে মার্চ, ১৯৭২।

১১। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা—'নির্ব্বাসন কাহিনী'। প্রকাশক—নিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা, গিরিডি। ১ম সংস্করণ—১৫ই চৈত্র, ১৩১৭।

১২। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'নির্বাসিতের আত্মকথা'। ১ম সংস্করণ—২রা জুলাই, ১৯২১। বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ—১৩৫৭।

১৩। অমলেন্দু দাশগুপ্ত—'ডেটিনিউ'। ১ম সংস্করণ—২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। সাহিত্যসংসদ, ৩য় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৭৩।

১৪। বীণা দাস—'শৃঙ্খল ঝঙ্কার'। প্রকাশক: সিগনেট প্রেস, কলিকাতা-২০। ১ম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫ (১৯৪৮)।

১৫। শান্তি দাস—'অরুণ-বহ্নি'। ১ম সংস্করণ—২০ শে জুন, ১৯৫১। বসুমতী সংস্করণ—১৩৭৪।

১৬। তদেব, গ্রন্থশেষে কথা-সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীর মন্তব্য।

১৭। নিকুঞ্জ সেন—'জেলখানা কারাগার'। প্রকাশক—অনিল কুমার পাল, গণদীপায়ন ; ১৭০ এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪। ১ম মুদ্রণ—মাঘ ১৩৫৮ (১৯৫২)।

১৮। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত—'বিপ্লবের পথে'। প্রকাশক—পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত ; ৯৯, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। ১ম সংস্করণ—১৯৫৭

১৯। কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা—'কারাস্মৃতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম'। প্রকাশক—শ্রী জগবন্ধু সেন, এম. এ., বি, এল। এড্ভোকেট। প্রাপ্তিস্থান—বইঘর, চট্টগ্রাম। ৩য় সং ১৯৭৪।

২০ তদেব, পৃ ২০২

২১ তদেব, পৃ ২৪১-২৪২

২২ শ্রী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—'স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আটমাস। ১ম সং ১৩২৯

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়—'তখন আমি জেলে'। ১ম সং ১৩৬৩

সুবোধ কুমার লাহিড়ী—'বিপ্লবের পথে'। ১ম সং ১৩৫৭

২৩। শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—'বন্দীজীবন' ১ম ও ২য় খণ্ড। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী; ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১ম সং ১৯২২।

২৪। হেমচন্দ্র কানুনগো—'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'। 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, ৩০ শে জুন, ১৯২৮।

২৫। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—'জেলে ত্রিশ বছর'। ১ম সং ১৯৪৮; অনুশীলন ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ৫ম সং ১৯৮১।

২৬। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—'বিপ্লবের পদচিহ্ন'। প্রকাশক—সুবোধ গুহ, সরস্বতী লাইব্রেরী; ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১ম সং ১৯৫৩

২৭। কমলা দাশগুপ্ত—'রক্তের অক্ষরে'। প্রকাশক—নাভানা; ৪৭, গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩। ১ম মুদ্রণ ১৯৫৪

২৮। গণেশ ঘোষ—'মুক্তিতীর্থ আন্দামান'। প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩। ১ম মুদ্রণ—১৯৭৭।

২৯। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—'নেপোলিয়নের কারাবাস' 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত—১ম ভাগ, অগ্রহায়ণ ১২৯৮, ১২ শ সংখ্যা।

৩০। মণীন্দ্র নারায়ণ রায়—'কাকোরী ষড়যন্ত্র'। প্রকাশক—বর্মণ পাবলিশিং হাউস; ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ১ম সং ১৯২৮ (?), ২য় সং—১৯৪৮

৩১। ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়—'বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ'। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১ম সং ভাদ্র ১৩৫৪।

৩২। মতিলাল রায়—'বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল'। প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১ম প্রকাশ—৭ই জুলাই ১৯২৩, ৩য় প্রকাশ—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭।

৩৩। পদ্মনাভ—'বিপ্লবের সপ্তশিখা'। প্রকাশক—সৌরেন্দ্র মিত্র, ৫ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। ১ম সং, ২৫ শে নভেম্বর ১৯৪৭

৩৪। হীরালাল দাশগুপ্ত—'জননায়ক অশ্বিনীকুমার'। প্রকাশক—দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড; ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১ম প্রকাশ—১লা জানুয়ারী ১৯৬৯।

৩৫। তদেব, পৃ ৭২

৩৬। তদেব, পৃ ৭৩

৩৭। বিশ্ব বিশ্বাস—'বিপ্লবী সূর্য সেন' (মাস্টার দা)। প্রকাশক—পরিমল বিশ্বাস, ৭০ মহেন্দ্রচন্দ্র গার্ডেন রোড, কলিকাতা-৩০। ৩য় সং জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ (১৯৭২)।

৩৮। তদেব, পৃ ১১৪

৩৯। তদেব, পৃ ১১৯

৪০। নজরুল ইসলাম—রাজবন্দীর জবানবন্দী। প্রকাশক: ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। ১ম সং—১৯২৩। চতুর্থ সংস্করণ—১৩৮১।

৪১। হেমন্তকুমার সরকার—সুভাষচন্দ্র। প্রকাশক—ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। ১ম সং—২১ শে জুলাই, ১৯২৭।

৪২। তদেব পৃ ২১। ইংরাজি হরফেই মূল চিঠিতে শব্দগুলি আছে। টাইপের সুবধার জন্য এখানে প্রতিবর্ণীকৃত।

৪৩। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—বন্দীর মন। প্রকাশক—ন্যাশনাল লিটারেচার এম্পোরিয়াম, ৬২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

৪৪। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—মুখর বন্দী ও বন্দীর মন। প্রকাশক বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-১। নতুন প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৮২।

৪৫। প্রকাশকের নিবেদন এবং গ্রন্থে মুদ্রিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পুস্তক সমালোচনা থেকেও গ্রন্থ দুটি ডায়েরী না পত্র বা একটি স্বতন্ত্র স্টাইল কিনা তা বোঝা যায় না।

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় সমালোচক বলেছেন রচনাগুলি—"bunch of lyrical poems"

'হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড' (১৬.৩.৪০)—"collection of the choicest thought"

'ভারত পত্রিকা' (১৪ই মাঘ ১৩৪৬) বলেছেন—"গ্রন্থকার সময় সময় যে স্বপ্নকে মুখরতার অধিকার দিয়াছেন তাহারই ছান্দসীমূর্তি "মুখরবন্দী"।

৪৬। দীনেশ গুপ্তের চিঠিগুলির মৌলিক রীতি বৈশিষ্ট্যের যে আলোচনা করেছি তার উৎস ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় প্রণীত 'বিপ্লব তীর্থে' (বিনয়-বাদল-দীনেশ) গ্রন্থটি। বীণা লাইব্রেরী। কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, ১ম সং—১৯৫৩। এছাড়া এই চিঠিগুলি অন্যত্রও সংগৃহীত হয়েছে; যেমন প্রসন্ন কুমার পাল সম্পাদিত 'বিপ্লবী বীর দীনেশ গুপ্ত' এবং কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের 'দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র' পুস্তিকা দুটিতে। এছাড়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে লেখা ১০ ও ২০ জুলাই, ১৯৩১) রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের দুটি অন্তরঙ্গ চিঠিও আছে যা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত (বৈশাখ, ১৩৫৬)।

৪৭। বন্দীর চিঠি (ভূমিকা—নওশের আলি)—শ্রীকুমার চৌধুরী কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক স্টুডেন্টস্ ব্যুরো' পক্ষ থেকে প্রথম প্রকাশিত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে। পি আর কুণ্ডু (এজেন্টস্) এণ্ড কোং —এর পক্ষে শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ।

৪৮। রাজসাহী জেল থেকে লেখা (১২।১২।১৯৪২ ইং) চিঠিতে সত্য গুপ্তের এই মানসিকতাই ফুটে উঠেছে—

"ভোরের সোনালী রোদ আমাদের সংকীর্ণ অঙ্গনে এসে পড়ে। সেথায় খানিক দাঁড়াই। সামনে একটা প্রাচীন প্রকাণ্ড গাছ মাথা উঁচু করে আছে, শীতের-স্পন্দন ওর-ও সুর অঙ্গে দিয়েছে ছোঁয়া, শুকিয়ে গেল ওর ডালপালা, ঝরে ঝরে পড়ছে শুকনো যত পাতা।"

৪৯। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'।

৫০। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' গ্রন্থের 'কারাসাহিত্য' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। প্রকাশক—মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড; ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১ম সং—বৈশাখ, ১৩৬৯।

৫১। কেদার নাথ দত্ত (ভাঁড়)—সচিত্র গুলজারনগর। ১ম প্রকাশ—১৮৭১ সাল। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সং—জুলাই, ১৯৮২।

৫২। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—জেলখানা। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম সং—২০শে অক্টোবর, ১৯১৯।

৫৩। প্রফুল্ল সরকার—অনাগত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ১ম সং—১৯২৭।

৫৪। সরোজকুমার রায়চৌধুরী—শৃঙ্খল। প্রকাশক—সাহিত্য চয়নিকা; ৫৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। ১ম সং—১৪ই মার্চ, ১৯৩৩।

৫৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—পাষাণপুরী। মিত্রালয়; ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। ১ম সং—১৪ই জুলাই, ১৯৩৩।

৫৬। "অনশন-ব্রতে মৃত্যু-বরণকারী নরুর মধ্যে মানবত্বের উচ্চতম গৌরব মূর্ত হইয়াছে। উপন্যাসে তাহার কোন সক্রিয় অংশ নাই।" ('বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৪র্থ সংস্করণ পৃ ৫৩৮)

৫৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—পাষাণপুরী, পৃ ৮৪।

৫৮। বনফুল—অগ্নি। ভাগলপুর, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৩। বনফুল রচনাবলী থেকে গৃহীত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ। ১৩৮২ বৈশাখ সংস্করণ। পৃ ১—৮৭। ১ম প্রকাশ—১২ই মে, ৯৪৭।

৫৯। রাণীচন্দ—জেনানা ফাটক। প্রকাশভবন; ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। নতুন সং—কার্তিক, ১৩৭৫।

৬০। সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী। ১ম সং—অক্টোবর, ১৯৪৫। প্রকাশভবন প্রকাশিত চতুর্দশ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৮৮।

৬১। অতীন্দ্রনাথ বসু—বি-কেলাস। প্রকাশক—গোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। ১ম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৫৫।

৬২। ডঃ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৭ম সংস্করণ, পৃ ৬৫৯।

৬৩। নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—জেলফেরৎ। নারায়ণ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩২৫। পৃ ৫৫—৬৩।

৬৪। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—কারামুক্তি। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ ১৭—২৪।

৬৫। সুবোধ ঘোষ—দণ্ডমুণ্ড। সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, প্রাইমা পাবলিকেশনস্। পৃ ১৪৪—১৫৯।

৬৬। কৃষ্ণা হাতি সিং—ছায়ামিছিল। সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ২০। ১ম সং—বৈশাখ ১৩৫৫।

৬৭। পরিচয়, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, ৪৯বর্ষ, পরিশিষ্ট, গোপাল হালদার—'কয়েদির আকাশ', পৃ ৪।

গ্রন্থপঞ্জী

আলোচিত গ্রন্থ-তালিকা

কারাসাহিত্যের মূল্যায়নে আমরা নিম্নবর্ণিত গ্রন্থগুলিকে তালিকাভুক্ত এবং গ্রন্থ বিশেষ বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনার অন্তর্গত করেছি। এর কারণ বিষয়কে একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে ধরে রাখা। যে বিস্তৃত গ্রন্থ আলোচ্য কালসীমার অন্তর্ভুক্ত তার ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, গ্রন্থের গ্রহণ-বর্জন প্রয়োজন। ভাষাগত, ভাবগত, কালগত এবং সর্বোপরি ঐতিহাসিকপ্রেক্ষায় কোন কোন গ্রন্থের সঙ্গে অপর গ্রন্থের সামীপ্য, সাযুজ্য এবং অপরাপর মিল ও অমিল থাকায় গ্রন্থ নির্বাচনের প্রশ্ন এসে পড়ে। যেমন ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর 'জেলে ত্রিশ বছর' গ্রন্থে যতখানি যুগ ও ইতিহাস সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় রাণীচন্দের 'জেনানা ফাটকে' তা অনুপস্থিত। এর অর্থ এই নয় রাণী চন্দ যুগের সঙ্গে মিথ্যাচার করেছেন। দুটি মানুষের রাজনৈতিক কর্মপরিধি কেবল স্বতন্ত্র নয়—তাঁদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রটিও আলাদা। আবার ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের মতো বিপ্লবী 'মুখর বন্দী'তে বন্দীমনের সিমফনি সৃষ্টি করলেন—তাঁর কাছে 'মুক্তি' মানবাত্মার চিরন্তন আকৃতির মতো সপ্রাণ, মুখর ; যন্ত্রণাদগ্ধ ব্যথা এখানে অশরীরী-অব্যক্ত, অশ্রু ও লবণের রোম্যান্টিক নির্যাসে পরিণত। লেখক ব্যক্তিত্বের ভিন্নতায় একই কারাজগৎ বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে নানা রঙে রঞ্জিত, আকৃতি ও প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র। এজন্য সাহিত্যিক মূল্যায়নে নির্বাচিত গ্রন্থগুলি ছাড়া অপরাপর গ্রন্থগুলিকেও আলোচনার অন্তর্গত করা যেতে পারে কিন্তু আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে একটি বিশেষ নীতি অবলম্বন করেছি তা হলো অধ্যায়টিকে পরিস্ফুট করার জন্য গ্রন্থগুলির বিষয়কেন্দ্রিক নির্বাচন। এই নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়ে গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্যায়ন, রাজনৈতিক চিন্তা, নির্যাতন দণ্ড-ব্যবস্থা এবং রূপরীতির আলোচনা করা হয়েছে।

কেবলমাত্র এই জাতীয় গ্রন্থই নয়—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কারা সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প, পুস্তিকা, পত্র, জীবনী এবং কিছু কিছু অনূদিত গ্রন্থও আলোচনার সামগ্রিক প্রয়োজনে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

১। কেদারনাথ দত্ত—সচিত্র গুলজারনগর (১৮৭১)।
২। যোগেন্দ্রনাথ বসু—আমাদের হাজত (১৮৯১)।
৩। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—নেপোলিয়নের কারাবাস (১৮৯১)।
৪। সুরথ কুমার বসু—স্বদেশীর কারাবাস (১৯০৬)।
৫। বিপিন চন্দ্র পাল—জেলের খাতা (১৯১০)।
৬। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা—নির্বাসন কাহিনী (১৯১১)।
৭। ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—জেলখানা (১৯১৯)।
৮। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ—দ্বীপান্তরের কথা (১৯২০)।
৯। অরবিন্দ ঘোষ—কারা কাহিনী (১৯২১)।
১০। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা (১৯২১)।
১১। হেমচন্দ্র কানুনগো—বাংলার বিপ্লব কাহিনী (১৯২১)।
১২। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ—বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী (১৯২২)।
১৩। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল—বন্দী জীবন (১৯২২)।
১৪। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আটমাস (১৯২২)।
১৫। হেমন্ত কুমার সরকার—বন্দীর ডায়েরী (১৯২২)।
১৬। উল্লাসকর দত্ত—আমার কারাজীবনী (১৯২৩)।
১৭। নজরুল ইসলাম—রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩)।
১৮। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্রোহে বাংলা বা আমার জীবন-চরিত (১৯২৪)।
১৯। হেমন্ত কুমার সরকার—সুভাষচন্দ্র (১৯২৭)।
২০। প্রফুল্ল সরকার—অনাগত (১৯২৭)।
২১। মনীন্দ্রনারায়ণ রায়—কাকোরী ষড়যন্ত্র (১৯২৮)।
২২। মদনমোহন ভৌমিক—আন্দামানে দশবৎসর (১৯৩০)।
২৩। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—কারামুক্তি (১৯৩০)।
২৪। সরোজ কুমার রায়চৌধুরী—শৃঙ্খল (১৯৩৩)।
২৫। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—পাষাণপুরী (১৯৩৩)।
২৬। গোপাল হালদার—কয়েদীর আকাশ (১৯৩৪)।
২৭। কৃষ্ণকুমার মিত্র—আত্মচরিত (১৯৩৭)।
২৮। অমলেন্দু দাশগুপ্ত—ডেটিনিউ (১৯৩৯)।

২৯। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—মুখর বন্দী ও বন্দীর মন (১৯৪০)।

৩০। সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী (১৯৪৫)।

৩১। সৈয়দ নওশের আলি—বন্দীর চিঠি (১৯৪৬)।

৩২। পদ্মনাভ—বিপ্লবের সপ্তশিখা (১৯৪৭)।

৩৩। ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়—বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ (১৯৪৭)।

৩৪। বনফুল (বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়)—অগ্নি (১৯৪৭)।

৩৫। সতীশ পাকড়াশী—অগ্নিদিনের কথা (১৯৪৭), অগ্নিযুগের কথা (১৯৭১)।

৩৬। অতীন্দ্রনাথ বসু—বি-কেলাস (১৯৪৮)।

৩৭। রাণী চন্দ—জেনানা ফাটক (১৯৪৮)।

৩৮। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী— জেলে ত্রিশ বছর (১৯৪৮)।

৩৯। বীণা দাস—শৃঙ্খল-ঝংকার (১৯৪৮)।

৪০। অনন্ত ভট্টাচার্য—আন্দামান বন্দী (১৯৪৮)।

৪১। সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার —বন্দীজীবন (১৯৪৯)।

৪২। সুবোধ কুমার লাহিড়ী—বিপ্লবের পথে (১৯৫০)।

৪৩। বিধুভূষণ বসু—পুরানো জেলের কথা (১৯৫০) ও স্মৃতিকথা (১৯৫৯)।

৪৪। শান্তি দাশ—অরুণ-বহ্নি (১৯৫১)।

৪৫। নিকুঞ্জ সেন—জেলখানা কারাগার (১৯৫২)।

৪৬। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—বিপ্লবের পদচিহ্ন (১৯৫৩)।

৪৭। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—বিপ্লবতীর্থে (১৯৫৩)।

৪৮। কল্যাণী ভট্টাচার্য—জীবন অধ্যয়ন (১৯৫১)?

৪৯। নলিনী কিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লববাদ (১৯৫৪)।

৫০। কমলা দাশগুপ্ত—রক্তের অক্ষরে (১৯৫৪)।

৫১। সুবোধ ঘোষ—দণ্ডমুণ্ড (২য় সং, ১৯৫৪)।

৫২। সতীশ চন্দ্র দে—নিঃসঙ্গ (১৯৫৬)।

৫৩। দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়—তখন আমি জেলে (১৯৫৬)।

৫৪। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (১৯৫৬)।

৫৫। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত—বিপ্লবের পথে (১৯৫৭)।

৫৬। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী—সে যুগের আগ্নেয়পথ (১৯৬০)।

৫৭। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিপ্লবের সন্ধানে (১৯৬০)।

৫৮। নলিনী কান্ত গুপ্ত—স্মৃতির-পাতা (১৯৬৩)।

৫৯। ক্ষীরোদকুমার দত্ত—বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার (১৯৬৫)।

৬০। হৃষীকেশ শীল—বীর সাভারকর (১৯৬৬-২য় সং)।

৬১। মতিলাল রায়—বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (১৯৬৭)।

৬২। সুভাষচন্দ্র বসু—ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, ১/২ খণ্ড (১৯৬৭/১৯৬৮)।

৬৩। হীরালাল দাশগুপ্ত—জননায়ক অশ্বিনী কুমার (১৯৬৯)।

৬৪। সুধীর চন্দ্র দে—সাগর ঘেরা পাথর কারা (১৯৭২)।

৬৫। সন্তোষ কুমার অধিকারী—শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন (১৯৭২)।

৬৬। বিশ্ব বিশ্বাস—বিপ্লবী সূর্য সেন (১৯৭২)।

৬৭। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা (১৯৭৩)।

৬৮। ফণিভূষণ ভট্টাচার্য—নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা (১৯৭৩)।

৬৯। বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত—সেই মহাবরষার রাঙা জল (১৯৭৪)।

৭০। কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা—কারাস্মৃতি (৩য় সং, ১৯৭৪)।

৭১। প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী—বিপ্লবীর জীবনদর্শন (১৯৭৬)।

৭২। গণেশ ঘোষ—মুক্তিতীর্থ আন্দামান (১৯৭৭)।

অনুবাদ

১। কারাস্থ বালরাজ—(১৮৮৭)।

২। কারাকাহিনী—(১৯২৩)।

৩। বিপ্লবের আহুতি—(১৯২৮)।

৪। য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা—(১৯৩২)।

* ৫। কারাজীবন ও কোন পথে ভারত—(১৯৩৪)।

৬। আত্মচরিত—(১৯৩৭)।

৭। রুদ্ধকারার দিনগুলি—(১৯৪৬)।

৮। কোনো খেদ্ নাই—(১৯৪৭)।

৯। ছায়ামিছিল—(১৯৪৮)।

* ১০। ফাঁসির মঞ্চ থেকে—(১৯৪৯)।

* ১১। ফ্রান্সিস বেকনের পত্র—(১৯৫০)।

* ১২। ফাঁসির আগের দিন—(১৯৫১)।

* ১৩। কারাপ্রান্তর থেকে—(১৯৫৬)।

১৪। আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী—(১৯৬৩)।

১৫। সক্রেতিসের বিচার ও মৃত্যু—(১৯৭১)।

অনূদিত গ্রন্থগুলিকে আমরা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি, তবে (*) চিহ্নিত গ্রন্থগুলি আলোচনার সামগ্রিক বিচারে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থ-তালিকা [আলোচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে]

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে
(২) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

২। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—অগ্নিযুগ

৩। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম

৪। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—আনন্দমঠ (রচনার প্রেরণা ও পরিণাম)

৫। মাখনলাল সেন—স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র

৬। নেপাল মজুমদার—ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১-৬ষ্ঠ খণ্ড)

৭। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙার স্বদেশীযুগ

৮। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—বাঙ্গলার ইতিহাস

৯। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—প্রতিরোধ প্রতিদিন

১০। রম্যাঁ রলাঁ—ভারতবর্ষ (দিন পঞ্জী ১৯১৫—১৯৪৩)
অনুবাদ—অবন্তী কুমার সান্যাল।

১১। প্রফুল্ল কুমার সরকার—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

১২। দিলীপ মজুমদার—বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ

১৩। গান্ধী রচনাবলী ১—৬ খণ্ড
সম্পাদনা—শ্রী শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪। সুপ্রকাশ রায়—(১) ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম
(২) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ১/২ খণ্ড

১৫। কার্লমার্কস—ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী (৬৬৪—১৮৫৮)।

১৬। মনোরঞ্জন ঘোষ—চট্টোগ্রাম বিপ্লব

১৭। হিরন্ময় ভট্টাচার্য—নির্বাসিত সাহিত্য
১৮। নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা
১৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—উদ্বোধন কার্যালয়।
২০। অম্লান দত্ত—ব্যক্তি মুক্তি সমাজ।
২১। কমলা দাশগুপ্ত—স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী।
২২। ডঃ অরুন বসু—রবীন্দ্র বিচিন্তা
২৩। জগদীশ ভট্টাচার্য—বন্দেমাতরম্
২৪। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—ভারতে জাতীয় আন্দোলন।
২৫। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—(১) সবার অলক্ষ্যে ১—২ পর্ব
(২) ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব।
২৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস ১-৪ খণ্ড।
২৭। কালীচরণ ঘোষ—জাগরণ ও বিস্ফোরণ ১—২ খণ্ড।
২৮। কার্লমার্কস্, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস—প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা—যুদ্ধ ১৮৫৭—১৮৫৯।
২৯। নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়—মুক্তি পীঠ আন্দামান।
৩০। শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সত্যাগ্রহের কথা।
৩১। শিশির কর—নিষিদ্ধ বাংলা (আনন্দ বাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮১)
৩২। রবীন্দ্রনাথ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ (পুস্তিকা)—টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১) স্বদেশী সমাজ। (৩) সঞ্চয়িতা।
(২) সাহিত্য। (৪) গীতাঞ্জলি।
৩৪। মুজফ্ফর আহমেদ—আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি'।
৩৫। শংকরী প্রসাদ বসু—(১) সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ।
(২) নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন।
৩৬। চিন্মোহন সেহানবীশ—রুশ বিপ্লবী ও ভারতীয় বিপ্লবী।
৩৭। জীবনতারা হালদার—অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
৩৮। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।
৩৯। যোগেশচন্দ্র বাগল—(১) মুক্তি সন্ধানে ভারত
(২) ভারতের মুক্তিসন্ধানী

৪০। উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়—ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ।
৪১। ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস
৪২। গোপালচন্দ্র রায়—কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত (১৮৮৫-১৯৪৭)
৪৩। সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য
৪৪। শ্রী অরবিন্দ স্মারকগ্রন্থ—বর্ধমান জেলা শ্রী অরবিন্দ জন্ম শতবার্ষিকী কমিটি।
৪৫। তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য—সম্পাদনা উজ্জ্বল কুমার মজুমদার
৪৬। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়—সমালোচনার কথা
৪৭। ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ—বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য
৪৮। ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়—সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (১ম পর্ব)
৪৯। প্রমথনাথ বিশী —রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
৫০। ডঃ বিজিতকুমার দত্ত—বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস
৫১। ডঃ গোপীকামোহন রায়চৌধুরী—দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য
৫২। ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায়—সাহিত্য বিবেক
৫৩। ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক—অপরাধ জগতের ভাষা
৫৪। গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ—স্বপন বসু
৫৫। সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার
৫৬। স্রোতের বিরুদ্ধে—শিবনারায়ণ রায়

* * * * *

1. K. C. Ghosh—The Roll of Honour.
2. Anil Seal —The Emergence of Indian Nationalism (Competition and Collaboration in the later Nineteenth century)
3. M. N. Roy —Reason Romanticism and Revolution (Vol. I+II).
—Memoirs

4. G. Adhikari—Documents of the History of the CPI (Ed).

5. Dr. Ramesh Chandra Mazumdar—History of Freedom Movement in India.

6. Abul Kalam Azad—India Wins Freedom.

7. Leonard Mosely—The Last Days of British Raj.

8. Michael Edwards—The Last years of British India.

9. K. M Munshi—Pilgrimage to Freedom.

10. Dr. Bhupendra Nath Datha—Swami Virekananda, Patriot Prophet.

11 Dr. Pattavi Sitaramyya—The History of the India National Congress (I-IV).

12. Hara Prasad Chatterjee—The Sepoy Mutiny, 1857

13. Kalyan Kumar Banerjee—Indian Freedom Movement : Revolutionaries in America.

14. Dr. A.K. Sur—History & Culture of Bengal

15. Saumendranath Tagore—Raja Rammohun Roy.

16. Profiles of Gandhi—Edited by Norman Consins

17. Sumit Sarkar—Modern India 1885-1947.

18. B. N. Pandey—The Break-up of British India, The Indian Nationalist Movement 1885-1947, select documents—Edited by B. N. Pandey

19. R. Palme Dutt—India To-day.

20. Studies in the Bengal Renaissance—Edited by Atulchandra Gupta.

21. Letter of Swami Vivekananda—Published by Advaita Ashrama. 5 Dehi Entally Road, Calcutta-14.

22. Bipan Chandra, Amales Tripathi, Barun De—Freedom Struggle.
23. Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume-Editor—R. C. Majumdar.
24. Marks of Modern India—Indian Council of Historical Research.
25. Sumit Sarkar—The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908.
26. Cassell's Encyclopedia of Literature Vol-I & II, Edited by—S. H. Steinberg.
27. Amales Tripathi—The Extremist Challenge.
28. B. B. Majumder—(1) Indian Political Associations and Reform of Legislature (1818-1917)
(2) History of Political Thought (From Rammohan to Dayananda).
29. C F, Andrews—Andrew's Papers (Bunch of letters to Rabindranath Tagore and M. K. Gandhi).
30 Dr. S. P. Srivastava—The Indian Prison Community.
31. Inder J. Singh—Indian Prison-A Sociological Enquary.
32 Uma Mukherjee—To great Indian Revolutionaries.
33. Absurd Drama—Penguin plays (1958).
34. The Theatre of the Absurd--Penguin (1972), Introduction by Martin Esslin.
35. Dr. B. S. Haikerwal—Economic and Social Aspects of Crime in India.
36. Sisir Kumar Ghosh—A Story of Patriotism in Bengal.
37. William Wedderburn—Allan Octavian Hume, Father of Indian National Congress.
38 Sashi Bhusan Chaudhuri—Civil Rebellion in Indian Mutinies.

39. W. C. Bonnerjee—Introduction to Indian Politics.

40. Dr. B. P. Mallick—Dictionary of the under world argot.

41. Dr. K. C. Chaudhuri—History of india.

42. Dr. Kalyan Chaudhuri—Role of the Indian National Congreess in Bihar (1908-1932), (unpublished Thesis).

43. Ed. Bipan Chandra—India's Struggle for Independence (1857-1947).

44. Ed. Gyanendra Pandey—The India Nation in 1942.

45. A. R. Desai—Social Background of Indian Nationalism.

46. Ainslie T. Embree—Imagining India.

47. Dr. Nemai Sadhan Bose—Indian Awaking in Bengal.

48. Leonard A. Gordon—Bengal-The Nationalist movement.

॥ পরিশিষ্ট ॥

১

জেলখানায় বিয়ে

"—জেলের জেটি থেকে ষ্টীমলঞ্চে চড়লাম। কয়েক মাইল সমুদ্রের খাঁড়ি বেয়ে শোর পয়েন্টে গিয়ে উঁচু পাড বেয়ে পাকা রাস্তায় উঠলাম। সমুদ্রেই পারেই পাহাড়ের উপর একটা ছোট টাবু বা ব্যারাক আছে। সেই শোর পয়েন্ট বা শুয়ারের পেটে ঢুকতে হল মিতা সুধীরকে। আমি গেলাম দু'তিন মাইল দূরে বাজা জাগডা টাবুতে। চারদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। টাবুর পাশেই সমুদ্রের খাঁড়ি খালের মতো। পাহাড় থেকে একটা বেশ বড় ঝরণা বেয়ে এসে সেই খাঁড়িতে পড়েছে। টাবুর পাশ দিয়ে এক পাকা রাস্তা ভাইপার দ্বীপ পর্যন্ত গিয়েছে। বর্ত্তমান সেলুলার জেলের আগে ভাইপার দ্বীপে জেল ছিল। সেখানেই কয়েদীদের রাখা হত। আন্দামানের সব দ্বীপ আগ্নেয় পাহাড় এবং ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ। কয়েদীদের সাহায্যে সেই জঙ্গল কিছুটা পরিষ্কার করে ইংরেজ সরকার নর্থ ও সাউথ দুই জেলায় ভাগ করে শাসন ভার দিয়েছিলেন দুজন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর। জেলা দুটি আবার কয়েকটি মহকুমায়—ভাগ করা হয়েছে। এদের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন টাবু ও কয়েদী গ্রাম। ১০ বছর পার হলে যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদীদের এখানে স্বাধীনভাবে বাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন সে দেশ থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসে কয়েদী গ্রামে বাস করতে পারে। আসতে কোন খরচ লাগে না। এই ভাবে বহু কয়েদী এখানে চাষ আবাদ বা চাকরী করে বাস করছে। তাদের সন্তানেরা স্বাধীন বা Free। তারা স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করতে পারে। ৫।৬ টা টাবু ও কয়েদী গ্রামের উপর একজন করে অবসর প্রাপ্ত গোরা সৈন্য থাকে মহকুমা হাকিমের অধীনে। সে আইনও শৃংখলা রক্ষায় সাহায্য করে। এখানে কয়েদীর দশ বছর কাটলে সে মেয়ে জেল থেকে পছন্দ মতো মেয়েকে নিয়ে বিয়ে করে বসবাস করতে পারে।"

(সুধীর চন্দ্র দে—'সাগর ঘেরা পাথর কারা', পৃ ১১৩—১১৪)।

২

" THE CHITTAGONG BRIGADE "

(1)

Slowly, Slowly, mile by mile,
Marched forward to the grave,
To The dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.
'ONWARD' the Chittagong Brigade
To the yonder hills, cried the Captain brave
To the dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.

(2)

ONWARD the Chittagong Brigade ;
Was anybody a bit afraid ?
Not though all the soldiers knew
Survive of them will but few
But the pain of bondage
Robbed them of their peaceful age.
And it was freedom they did crave
To the dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.

(3)

HUNGER to them was constant mate
DRINK they did not find so tasty
SUMMER did its cruelty best
Fried them in its hot air's wave,

Cheerfully did they take them all,
Slowly all their force did fall,
But alive they were to the motherland's call
For the cause, her to save.
To the dale of death, to the field of fame
Marched the five dozen youths brave.

(4)

Towards beaming they found at last
The holy 'Jalalabad' off mournful Past
Where the army settled them at first
In wait for the enemy fiendish Knave.
The Sun poured molten fire on them
The rifles turned up hot as flame
With hunger and thirst the delusion came
Only the carrie clinking broke the solitude grave
To the dale of death, to the field of fame
Kept in wait the five dozen youths brave.

(5)

At last when the Sun did bend
And the painful day was at an end
On April mid twenty-second
The enemy was in sight.
'Halt' shouted the Captain dare
'Comrade fire' came the next order
When the sixty guns boomed together
To the dale of death, to the field of fame
Fought grave the five dozen youths brave.

(6)

Screened off the midst off dust and smoke
The guns sent the humble stroke.
And put to fight the enemy's tolk
While some amidst them fell down rolled
"Segra" opened the martyrdom's gate
And was followed by ELEVEN in haste
While the fight ceased in the evening late
They marched down lest their comrades cold
Came down the fifty eight bold.

(7)

When can their glory ceased to be said
Oh : the wild fight they made
All the people astound
Honour the attempt they made
Blessed the Chittagong Brigade
NOBLE ONE DOZEN DEAD

"Ganesh Da"

['প্রবাসী' .৩৫৬, পৃ ৪৬৩]

৩
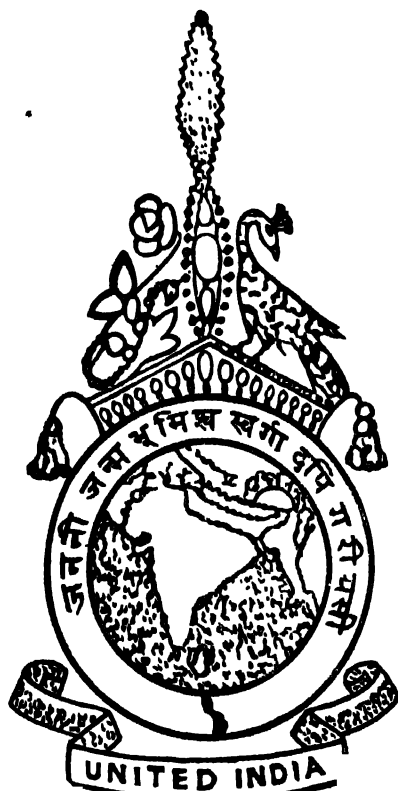
"......বিপ্লবীদিগের একটি শিলমোহর ছিল। তাহাতে ভারতবর্ষে বাংলার উপর সূর্যোদয় হইতেছে—এই চিত্রটিকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এবং তাহার নিম্নে 'United India' কথাগুলি লিখিত ছিল।"

(শ্রী ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়—'বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ', বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১ম সং—ভাদ্র, ১৩৫৪, পৃ ৫৯)।

৪

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কারা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি'র তালিকা ঃ—

---

(১) **বঙ্গদর্শন**

ক 'রাখি বন্ধনের উৎসব' (লেখকের নাম নেই)
৫ম বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩১২ ; পৃ ৩০৭

খ) 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা'—বিপিন চন্দ্র পাল।
৫ম বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩১২ ; পৃ ৩০০—৩০৯

গ) 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'
৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১২ ; পৃঃ ২৭৯—২৯৬

ঘ) 'পথ ও পাথেয়'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ ; পৃঃ ৯২—১১১।

ঙ) 'রবীন্দ্রনাথ'—যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।
নবপর্য্যায়, ১১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ ; পৃ ৯০—৯৮

(২ **ভাণ্ডার**

ক) 'উদ্বোধন'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক)
৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২ (২য় খণ্ড) ; পৃ ২১৫—১৭

খ) 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতের প্রতি নিবেদন'—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক)
১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১২ ; পৃ ৩৪৩

গ) 'বন্দী'—(কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ ; পৃ ৬৭—৬৮

(৩) **যুগান্তর**

ক) 'প্রবঞ্চনা বাক্য'—১ম বর্ষ, রবিবার ১১ই কার্ত্তিক ১৩৮৩।

খ) 'অন্তরায়'—২য় বর্ষ, শনিবার ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৪।

গ) 'দশ পন্থা'—২য় বর্ষ, শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৪।

ঘ) 'কালের ভেরী'—(৩য় সংখ্যা)—২য় বর্ষ, শনিবার ১৮ মাঘ ১৩১৪।

ঙ) 'বন্দীগণের বর্ত্তমান অবস্থা'—৩য় বর্ষ, শনিবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫।

(৪) ভারতী

ক) 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'—শ্রী অরবিন্দ ঘোষ
৩৩শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১৬, পৃ: ১৫১—১৫৭

(৫) হিন্দুস্থান

ক) 'রাজনৈতিক দ্বীপান্তর—ভাই পরমানন্দ'।
১ম বর্ষ, শনিবার ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

খ) গৃহাগত উপেন্দ্রনাথ'—
১ম বর্ষ, বৃহস্পতিবার ২১ শে ফাল্গুন ১৩২৬।

গ) 'বিলাতে কারা-সংস্কার'—কয়েদাদের নানা সুবিধা।
৫ম বর্ষ, শুক্রবার, ১৪ই বৈশাখ ১৩৩০।

ঘ) 'খাঁচার মধ্যে কয়েদী
১ম বর্ষ বৃহস্পতিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

ঙ) 'কারাগারে রাজনৈতিক বন্দী'—
৫ম বর্ষ, বৃহস্পতিবার, ৩১ শে শ্রাবণ ১৩৩০।

(৬) বাঙ্গলার কথা

ক) 'স্বরাজের পথ কারাগার'—গান্ধী।
৭ম সংখ্যা, ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৮

খ) 'জেল ভর্ত্তি'—চিত্তরঞ্জন দাস
৮ম সংখ্যা, ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

গ 'বৃহত্তম কারাগার'—চিত্তরঞ্জন দাস
৯ম সংখ্যা, ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

ঘ) জেলের ভয়'—হেমন্ত কুমার সরকার
১১ সংখ্যা, ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮

ঙ) 'আদর্শ কয়েদী'—গান্ধী
১৪শ সংখ্যা, ১৯শে পৌষ ১৩২৮

চ)। 'মুক্তির পথ, জেল'—সুরেন্দ্রনাথ হালদার
১২শ সংখ্যা, ৮ই পৌষ ১৩২৮

ছ) 'কারার আহ্বান'—(কবিতা)—সুকুমার রঞ্জন দাশ
১৭শ সংখ্যা, ২০শে মাঘ ১৩২৮

জ) 'তোমরা কর সুখের গর্ব
আমরা করি দুখের বড়াই'—সুকুমার রঞ্জন দাশ
১১শ সংখ্যা, ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮

(৭) নারায়ণ

ক) 'জেল—ফেরৎ' (গল্প)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ; পৃ ৫৫—৬৩

(৮) সবুজপত্র

ক 'দেশের কথা'—শ্রী প্রমথ চৌধুরী
৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫ ; পৃ ৫৮—৬৪

খ 'নির্বাসিতের আত্মকথা'—শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৮ ; পৃ ১২৯—১৩৪
('পুস্তক-সমালোচনা'র অন্তর্গত)

৯) বিজলী

ক) 'আন্দামান ফেরতের চিঠি'—
১ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ১২ই চৈত্র, ১৩২৭ , পৃ : ৩

খ) 'কালাপানির কয়েদী—
১ম বর্ষ, ৩০শে বৈশাখ, ১৩২৮ ; পৃঃ ৩

গ) 'একটি সত্য ঘটনা'—সতীশচন্দ্র দে
১১ই ফাল্গুন ১৩২৯ ; পৃ ১৫—১৬

ঘ) 'কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি অনশনব্রত'—
(পাঁচমিশেলীর অন্তর্গত একটি রচনা)
৩য় বর্ষ, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৩০ ; পৃ ৪

ঙ) 'আবার হুগলী জেল' (পাঁচমিশেলীর একটি রচনা)
৩য় বর্ষ, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩০ , পৃ ৪

চ) 'মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তি'—রবীন্দ্রনাথ
(পাঁচমিশেলীর অন্তর্গত একটি রচনা)
৪র্থ বর্ষ, ২৫শে মাঘ, ১৩৩০, পৃ ২৩৭—৩৮

ছ) 'আমার জেল ইতিহাসের এক পাতা'—পূর্ণ চন্দ্র দাস
৪র্থ বর্ষ, ১৭ই ফাল্গুন ১৩৩০
২৪শে ফাল্গুন ১৩৩০
১লা চৈত্র ১৩৩০

(১০) এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ

ক) 'অসহযোগী বন্দিগণের প্রতি ব্যবহার'—
২২শে বৈশাখ, ১৩২৯, পৃ ৫৬—৫৭

খ) 'জেলে সাক্ষাৎকার'—
২২শে বৈশাখ ১৩২৯, পৃ ৫৮

গ) 'কারাগারে সতীন্দ্রনাথ'—
৫ই আশ্বিন ১৩২৯; পৃ: ৩১২ (ঘ)

(১১) প্রবাহিনী

ক) 'কয়েদীর খেলার ব্যবস্থা' (সমাচারের অন্তর্গত একটি সংবাদ)
জ্যৈষ্ঠ ২৩, ১৩৩১, পৃ ২৫৬

(১২) সৌরভ

ক) 'সাহিত্য ও জাতি'—পূর্ণিমাপ্রভা রায়
আষাঢ় ১৩৩২; পৃ ১৩৩—১৩৫

(১৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক

ক) 'আধুনিক সভ্যতা ও মহাত্মা গান্ধী'—সম্পাদকীয় নিবন্ধে উদ্ধৃত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য, ১৪ই বৈশাখ ১৩২৯।

খ) 'ঘরে-বাইরে'র অন্তর্গত—গুজরানওয়ালা, যশোহর জেলে অনশন ব্রত, ইংলণ্ডে কারাগার সংস্কার, হরতাল বিজ্ঞাপন।
৮ই বৈশাখ, ৩রা আষাঢ়, ১৪ই কার্তিক, ১৬ই ফাল্গুন ১৩২৯।

গ) 'ভারতের কারাগারে'—ডাক্তার সত্যপালের অভিজ্ঞতা
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

ঘ) 'অসহযোগী বন্দিগণের প্রতি ব্যবহার'—
২০শে বৈশাখ, ১৩২৯।

ঙ) 'দ্বাদশ গান্ধি পুজাহ'—
৩রা চৈত্র, ১৩২৯।

চ) 'মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন'—টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন ঠাকুর ও নরেন দেব
৩রা চৈত্র, ১৩২৯।

ছ) 'হুগলী জেলে প্রায়োপবেশন'—কাজী নজরুল প্রভৃতির অবস্থা গুরুতর—১১ই বৈশাখ, ১৩৩০।

জ) 'জেলের কথা'—(সম্পাদকীয় নিবন্ধ)—১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৩০।

ঝ) 'দেশের মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস'—রাজনৈতিক বন্দীদের শোচনীয় পরিণাম—১২ই পৌষ, ১৩৩০।

(১৪) কংগ্রেস সংখ্যা—আনন্দবাজার পত্রিকা

ক) 'বিপ্লব'—ভূদেব ভট্টাচার্য্য]
খ) 'স্বাধীনতার মর্য্যাদা'—সি. রাজাগোপালাচারি] ১৩৩৪

গ) 'বিশিষ্ট মনীষীদের বাণী'—১৩৩৫

ঘ) 'বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভিভাষণ'—১৩৪১

(১৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা

ক) 'বর্ত্তমান সমস্যা'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৮শে আশ্বিন, ১৩৪৩

(১৬) ধূমকেতু (নজরুল সম্পাদিত)]

ক) ধূমকেতু প্রকাশ উপলক্ষে বিভিন্ন জনের বাণী
খ) 'ধূমকেতুর গ্রহণ'
গ) 'বাঙালী'
ঘ) 'বাংলার বিপ্লব যুগের প্রথম সেনানায়ক পুরুষ সিংহ যতীন্দ্রনাথ'] ১৩২৯

(১৭) শঙ্খ

ক) 'বন্দী' (সনেট)—হেমেন্দ্রনাথ রায়—২০শে চৈত্র, ১৩২৮

খ) 'বন্দীর প্রতি'—পূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন—৪ঠা বৈশাখ
গ) 'বন্ধন'—নীহাররঞ্জন রায়—২২শে জ্যৈষ্ঠ
ঘ) 'গান'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১২ই আষাঢ়
১৩২৯

(১৮) শ্রীকৃষ্ণ

ক) 'কারাগারে মহাত্মা গান্ধী'—(কবিতা)—১ম বর্ষ—১৩২৯
(প্রথম কয়েকটি সংখ্যা ধরে প্রকাশিত)

খ) 'বেতালের চিঠি'—৪ঠা চৈত্র, ১৩২৯ ; পৃ ২ ।

(১৯) শিশির

ক) 'ধূমকেতু সারথির কারাদণ্ড'
৫ই মাঘ, ১৩২৯ ; পৃ ১৫

খ) 'প্রায়োপবেশনে কাজী নজরুল ইসলাম'
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ , পৃ ১০

গ) 'দেশের বর্ত্তমান অবস্থা'
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

ঘ 'মহাত্মাজীর প্রভাব—ফাঁসীকাঠে মহাত্মার জয়ধ্বনি'—
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ , পৃ ৫
('খবরাখবর' এর অন্তর্গত)

(২০) সোনার বাংলা

ক) 'নজরুল ইসলাম —(কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ; পৃ ১৩ ।

খ) 'বহরমপুর জেলে রাজনৈতিক কয়েদী'
২২শে আষাঢ়, ১৩৩০ ; পৃ ১২ ।

(২১) আত্মশক্তি

ক) 'হুগলী জেলে অনশন—'
৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ।

খ) 'শ্রী হট্ট জেল'—
২রা মাঘ, ১৩৩০ ।

(২২) **বাঁশরী**

ক) জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি'—
১লা বৈশাখ, ১৩৩০

খ) 'জেলে প্রায়োপবেশন'—১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ; পৃ ৫

গ) 'কংগ্রেসে গুরুবাদ'—হেমন্ত কুমার সরকার
—১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০, পৃ ১৭।

(২৩) **বঙ্গবাণী**

ক) 'কার্ল মার্কস'—শ্রী প্রফুল্ল কুমার সরকার
অগ্রহায়ণ ১৩৩১, পৃ ৪৭৩—৪৭৯

খ) 'রাজ-বন্দী' (কবিতা)—
আষাঢ় ১৩৩০, পৃ ৬০৭।

(২৪) **সম্মিলনী**

ক) 'নূতন বন্দিশালা'—' বিবিধ সংবাদের অন্তর্গত)] ১৬ই, শ্রাবণ,
খ) 'যতীন্দ্রমোহনের উদ্দেশে] ১৩৪১, পৃ ৯।

(২৫) **প্রবর্ত্তক**

ক) 'পরলোকে যতীন্দ্রনাথ'—
ভাদ্র, ১৩৩৬, পৃ ৪৮০ (ক)

খ) 'যতীন্দ্রস্মৃতি-তর্পণ'—শ্রী বঙ্কিম বিহারী দাস (যতীন্দ্রের বাবা)
আশ্বিন, ১৩৩৬, পৃ ৫৫৭।

(২৬) **ঢাকা প্রকাশ**

ক) 'বন্দী-বন্দনা'—(কবিতা) শ্রী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৭ই বৈশাখ, ১৩৩৭ ; পৃ ২৪।

(২৭) **সমাচার**

ক) 'হুগলী জেলে পুরাতন প্রসঙ্গ'…উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
জ্যোতিরত্ন, ১২ই ভাদ্র, ১৩৩৮।

(২৮) **জয়শ্রী**

ক) 'দীনেশের ফাঁসী' (আলোচনী-র অন্তর্গত)
শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃ ৩৩৮

খ) 'রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী—(আলোচনী'র অন্তর্গত)
ভাদ্র, ১৩৩৮; পৃ ৪৪২

গ) 'হিজলী হত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ'—
কার্তিক, ১৩৩৮; পৃ ৫৯২—৫৯৪।

ঘ) 'হিজলী হত্যার তদন্ত বিবরণী'—
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮, পৃ ৬৭৬—৬৭৭।

ঙ) 'জেলে হিন্দুনারীর অমর্য্যাদা'—(আলোচনী'র অন্তর্গত)
বৈশাখ, ১৩৩৯; পৃ ১০২।

(২৯) নবশক্তি—শারদীয়া সংখ্যা

ক) '৪ঠা আশ্বিন'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('বিশ্বভারতী'তে প্রকাশিত
১৭ই আশ্বিন, ১৩৩৯, পৃ ২—৪ 'মহত্মা গান্ধী' গ্রন্থে
সংকলিত)।

(৩০) অগ্রদূত

ক) 'দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি'—
২০শে আশ্বিন, ১৩৪০, পৃ ৫

খ 'বিপ্লবের বিষময় ফল'—
১১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

(৩১) ভারতবর্ষ

ক) 'যতীন্দ্র-তর্পণ'—ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়
কার্তিক, ১৩৫৪; পৃ ৪০০।

খ) 'ভারতের জাতীয় পতাকার মর্ম ও অর্থ'—
ডাঃ বামন দাস মুখোপাধ্যায়, M R.C.O.G. (London)

গ) 'বাংলার বিপ্লববাদের জন্মদাতা স্বামী নিরালম্ব'—
শ্রী জীবনতারা হালদার, এম-এস-সি।
কার্তিক, ১৩৫৫; পৃ ৪০৪—৪০৬।

ঘ) 'ক্ষুদিরাম স্মরণে,—(গান)—কথা-গোপাল ভৌমিক।
সুর ও স্বরলিপি—বুদ্ধদেব রায়।
শ্রাবণ, ১৩৫৬; পৃ ১৩০।

(৩২) গ্রন্থাগার

ক) 'ইংরেজ আমলে পাঠনিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা ও পুস্তক'—
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র—১৩৭০ , পৃ ২০০—২৭৩
ভাদ্র, পৌষ—১৩৭১ , পৃ ১৪৪, ১৭৩, ২৭১

খ) 'বৃটিশ আমলে নিষিদ্ধ পুস্তকেব তালিকা'—
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায
পৌষ, ১৩৭৩

(৩৩) মাসিক বসুমতী

ক) 'রাজদ্রোহ' ⎤ 'সাময়িক প্রসঙ্গ'-ব অন্তর্গত।
খ) 'সহযোগের অভাব' ⎦ মাঘ ১৩৩৫ পৃ ৬৮২—৮৩।

গ) 'দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী' সাময়িক প্রসঙ্গ এর অন্তর্গত।
আষাঢ় ১৩৩৮ , পৃ ৫৭৪।

ঘ) 'শক্তি মন্ত্রেব পুরোহিত বিপিন চন্দ্র'—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায ও সত্যেন্দ্রকুমাব বসু—সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য।
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ , পৃ ৩৩৮—৭০।

ঙ) 'বাঙ্গালাব জেলখানা'—সাময়িক প্রসঙ্গ-র অন্তর্গত।
ফাল্গুন ১৩৪০ , পৃ ৮৫০।

চ) 'আন্দামানে অনশন'— ” ” ”
শ্রাবণ ১৩৪৪ , পৃ ৭৩৪।

ছ) 'রাজনীতিক বন্দীর মুক্তি'— ” ”
মাঘ ১৩৪৪ , পৃ ৬৪৭।

জ) 'শরৎচন্দ্রের প্রতি ব্যবহার— ” ”
ফাল্গুন ১৩৪৮ , পৃ ৭১৬।

ঝ) 'পুলিশের গুলীতে হতাহতের হিসাব ” ”
আশ্বিন ১৩৫০ , পৃ ৫৫৫।

ঞ) 'আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত'— ” ”
কার্তিক ১৩৫২ , পৃ ১৩৬।

ট) 'কারাগারে গদী পরীক্ষার ব্যবস্থা'—বিজ্ঞান জগৎ-এর অন্তর্গত।
বৈশাখ ১৩৪৫ , পৃ ৯১।

ঠ) 'বন্দী' (কবিতা)—শ্রী অমর ভট্ট।

ফাল্গুন ১৩৪৯, পৃ, ৫৩২।

ড) 'গান্ধীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ'—

মাঘ ১৩৫৪, পৃ ৩৮০ ও ৩৮২-র মধ্যবর্তী পাতা।

ঢ) 'আমেরিকাও কেঁদেছে'—পার্ল, এস, বাক।

মাঘ ১৩৫৪, পৃ ৩৮২।

ণ) মহাত্মাজীর প্রিয় ভজন'—রবীন্দ্রনাথ।

মাঘ ১৩৫৪, পৃ ৩৮৩।

৩৪) প্রবাসী

ক) 'কারাগারে বিধবা'—'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অন্তর্গত।

ভাদ্র ১৩২৩, পৃ ৪১৯।

খ) 'ভারতীয় জেলখানা'— " " " "

অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ: ২৬৭।

গ) 'দমদমার 'বিশেষ' জেল'— " " "

ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ ৭২৩।

ঘ) 'মহাত্মা গান্ধী জেলে কি পড়েন— " "

চৈত্র ১৩৩৮, পৃ ৮৮৯।

ঙ) 'আণ্ডামানে বন্দীদের প্রায়োপবেশন'— " "

ভাদ্র ১৩৪০ পৃ ৭৩৬।

চ) 'প্রয়োপবেশক বন্দীদের আবেদন বিচার'— " "

ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ ৭৪১

ছ) আণ্ডামান বন্দীদের কথা'— " " "

আশ্বিন ১৩৪৪, পৃ ৯০

জ) 'সৌখিন কারাগার'—'পঞ্চশস্য'-এর অন্তর্গত।

শ্রী সত্যেন্দ্র সেন—পৌষ ১৩২৬।

ঝ) 'বাংলার রাজবন্দীদের পারিবারিক অবস্থা'—

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পৌষ ১৩৫০, পৃ ২৩৩—২৩৯।

ঞ) 'কারাবন্ধন'—সুহৃৎচন্দ্র মিত্র।

পৌষ, ১৩৫৩, পৃ ২৭৬—২৮০।